শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী

প্রথম খণ্ড

ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

সম্পাদিত

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী

তারুণ্যামৃত ধারা

প্রথম খণ্ড

মহানাম সম্প্রদায় সেবক

গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

প্রণীত

ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

সম্পাদিত

প্রথম সংস্করণ—১৩৫৫

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫৯

মহানাম সম্প্রদায় কর্তৃক
প্রকাশিত
৫৯, মানিকতলা মেইন রোড,
কলিকাতা।

মাধুকরী—আড়াই টাকা মাত্র।

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

চন্দ্রপাত	৵০
চন্দ্রপাত ও ত্রিকালগ্রন্থ	।০
সংকীর্ত্তন পদামৃত	১৲
সংকীর্ত্তন পদাবলী	৮০
চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু	১৲
মহামৃত্যুরঙ্গ	১৲
বন্ধুস্মরণ মঙ্গল	॥০
গৌরস্মরণ মঙ্গল	১৲
হরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল	৮০
ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতি	।৵০
প্রেমের বাণী	।৵০
মার্কিন পাদ্রী ও হিন্দুসন্ন্যাসী	।৵০
মহানাম মহাকীর্ত্তন আস্বাদন	৵০
মহাকীর্ত্তন মাধুরী	।৵০
ব্রহ্মগায়ত্রী	।৵০
বন্ধুলীলাতরঙ্গিণী ১ম খণ্ড	২॥০
,, ২য় ,,	২॥০
,, ৩য় ,,	২॥০
,, ৪র্থ ,,	২॥০
শ্রীশ্রীবন্ধুগীতি কুসুমাঞ্জলি	৮০
উপনিষদ্ ও শ্রীকৃষ্ণ	২৲
বাণী বিজয়	২৲
শ্রীমূর্ত্তি ছোট	৵০
শ্রীমূর্ত্তি রঙ্গিন বড়	।৵০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন—ফরিদপুর

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুধাম—ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ

বয়েজ লাইব্রেরী, পোঃ জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা ১১

শ্রীযুত যোগীভূষণ দাস, ৬৭ বি, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"জয় জগদ্বন্ধু"

পূজ্যপাদ কুঞ্জদাদার

প্রসাদী-চন্দন

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

শ্রীশ্রীপ্রভু কোন সময় প্রিয় ভক্ত শ্রীনবদ্বীপ দাসকে বলেছিলেন,—"অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ। এই দুই লীলার সর্ব্বসমষ্টি শক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনিই শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু।" "শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া, শুধু শাস্ত্র প্রমাণে জান্‌বি কি! তাঁর নিজের ইচ্ছা। যখন আস্‌বার প্রয়োজন হয়, তখনই আসেন। লক্ষণে চিন্‌বি। শক্তি প্রকাশ কর্‌লে ও জানালে জগৎ জান্‌তে পারে।" তিনি কৃপা ক'রে না জানা'লে কেহই জানিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেছেন,—"বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগ-মায়াম্।" যোগমায়া অবলম্বনে লীলা। শ্রীশ্রীপ্রভু স্বরচিত শ্রীহরিকথায় শ্রীমতির বিরহ দশা বর্ণনায় লিখিয়াছেন "মনোব্যথা কারে কব, কোথা প্রাণের মাধব, বৃথা সব তাঁহার বিহনে।" এই মনোব্যথার অর্থ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "মনোব্যথা—উদ্ধারণ।"

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

চন্দ্রপাত	৶০
চন্দ্রপাত ও ত্রিকালগ্রন্থ	।০
সংকীর্ত্তন পদামৃত	১৲
সংকীর্ত্তন পদাবলী	৸০
চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু	১৲
মহামৃত্যুরঙ্গ	১৲
বন্ধুস্মরণ মঙ্গল	॥০
গৌরস্মরণ মঙ্গল	১৲
হরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল	৸০
ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতি	।৶০
প্রেমের বাণী	।৶০
মার্কিন পাদ্রী ও হিন্দুসন্ন্যাসী	।৶০
মহানাম মহাকীর্ত্তন আস্বাদন	৶০
মহাকীর্ত্তন মাধুরী	।৶০
ব্রহ্মগায়ত্রী	।৶০
বন্ধুলীলাতরঙ্গিণী ১ম খণ্ড	২॥০
,, ২য় ,,	২॥০
,, ৩য় ,,	২॥০
,, ৪র্থ ,,	২॥০
শ্রীশ্রীবন্ধুগীতি কুসুমাঞ্জলি	৸০
উপনিষদ্ ও শ্রীকৃষ্ণ	২৲
বাণী বিজয়	২৲
শ্রীমূর্ত্তি ছোট	৶০
শ্রীমূর্ত্তি রঙ্গিন বড়	।৶০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন—ফরিদপুর

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুধাম—ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ

বয়েজ লাইব্রেরী, পোঃ জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা ১১

শ্রীযুত যোগীভূষণ দাস, ৬৭ বি, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"জয় জগদ্বন্ধু"

পূজ্যপাদ কুঞ্জদাদার

প্রসাদী-চন্দন

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।"

শ্রীশ্রীপ্রভু কোন সময় প্রিয় ভক্ত শ্রীনবদ্বীপ দাসকে বলেছিলেন,—"অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ। এই দুই লীলার সর্ব্বসমষ্টি শক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনিই শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু।" "শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া, শুধু শাস্ত্র প্রমাণে জান্‌বি কি! তাঁর নিজের ইচ্ছা। যখন আস্‌বার প্রয়োজন হয়, তখনই আসেন। লক্ষণে চিন্‌বি। শক্তি প্রকাশ কর্‌লে ও জানালে জগৎ জান্‌তে পারে।" তিনি কৃপা ক'রে না জানা'লে কেহই জানিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেছেন,—"বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগ-মায়াম্।" যোগমায়া অবলম্বনে লীলা। শ্রীশ্রীপ্রভু স্বরচিত শ্রীহরিকথায় শ্রীমতির বিরহ দশা বর্ণনায় লিখিয়াছেন "মনোব্যথা কারে কব, কোথা প্রাণের মাধব, বৃথা সব তাঁহার বিহনে।" এই মনোব্যথার অর্থ স্বয়ং লিখিয়াছেন, "মনোব্যথা—উদ্ধারণ।"

একদিন শ্রীমন্দিরে এ অভাজনের সাক্ষাতে শ্রীমুখে বলিলেন "জীবের জন্য এত কষ্ট !" জগতের বন্ধু হইয়াও আবার "মহাউদ্ধারণ" নাম ব্যক্ত করেছেন। আহা ! জীবের প্রতি কি অভয় বাণী ! ধন্য মহাউদ্ধারণ লীলা !

অসমোর্দ্ধ-সুমাধুর্য্য শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী পাঠ করিবার ভাগ্য পাইলাম। পরম দয়াল প্রভুর ইচ্ছায় এই শ্রীগ্রন্থ লেখা হইতেছেন। তাঁহার কৃপা বিনা কেহই অপ্রাকৃত মধুর লীলা বর্ণনা করিতে পারে না। শ্রীব্রহ্মাও কহিয়াছেন—

জানন্ত এব জানন্ত কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।

হে প্রভো ! এ জগতে কেহ যদি আপনার মহিমা জানিয়া থাকে, তাহা হইলে সে জানুক ; তাহাকে আর বিশেষ কি বলিব, কিন্তু আমার ব্যক্তব্য এই যে আপনার মহিমা সিন্ধুর একবিন্দুও আমার শরীর, মন, কিংবা বাক্যের বিষয়ীভূত নহে।—বন্ধু কৃপাহি কেবলম্। জয় জগদ্বন্ধু, জয় বন্ধুভক্তবৃন্দ, জয় বন্ধুলীলা।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধাম — কুঞ্জদাস

ডাহাপাড়া, ১৯ বৈশাখ ১৩৫৫

নিবেদন

বন্দে নন্দ-ব্রজ-স্ত্রীণাং পাদ-রেণুমভিক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরি কথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥

—শ্রীউদ্ধব

যাঁহাদের শ্রীমুখের হরিকথা গান ত্রিজগৎ পবিত্র করে, তাঁহাদের পাদপদ্মের পরাগই অঙ্গের ভূষণ করি। হরিকথা বলিবার অধিকার সকলের নাই। সত্য কথা বলিলে, কাহারও নাই! একমাত্র যাঁর কথা তিনিই বলিতে পারেন। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বলেন, যার কথা তিনিও পারেন না। কেবল মাত্র কথার কৃপাতেই কথা হয়! কথা কৃপা করিয়া যদি হৃদয়ে উদয় করেন, তবেই কথা বলা হইতে পারে। মানুষকে যেমন ভূতে পায়, সেইরূপ যদি কাহাকেও হরিকথায় "পাইয়া" বসে তবেই সে সে-কথা বলিতে পারে বা লিখিতে পারে। যাদৃশ ভজন সম্পদ থাকিলে হৃদয়ে হরিকথার উদয় হইতে পারে, তাদৃশ সম্পদ মাদৃশ অভাজনের বিন্দুমাত্রও নাই। তবে যে বন্ধুহরির কথা বলিতে প্রয়াস পাইতেছি, সে কেবল একটি মাত্র ভরসায়।

ভরসাটি দিয়াছেন শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ। গোস্বামিজী কহিয়াছেন, অগ্নির তাপে সুবর্ণের উজ্জ্বলতা বাড়ে, সে অগ্নি যে-ই প্রজ্বলিত করুক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না। শ্রীশ্রীবন্ধুহরির এই কথা-হোমানলে ভক্তের সুবর্ণ-প্রাণ উন্নতোজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিবে, সে-ই হোমানলের কাষ্ঠাহরণ যে-ই করুক। আমি সত্যসত্যই কাষ্ঠাহরণ করিয়াছি মাত্র। এই বন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী গ্রন্থের গ্রন্থকার আমি একথা বলিলে আমার ধৃষ্টতা হইবে। আমি একটা শুষ্ক কাঠামো মাত্র তৈয়ারী করিয়াছিলাম। তাহাতেও আমার নিজের কৃতিত্ব বেশী কিছু নয়।

প্রথমতঃ, দেবী রজঃরাণীর কৃপা। যাঁহার অনুগ্রহে আজ সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর শ্রীঅঙ্গনের ধূলিতে পড়িয়া থাকিবার ভাগ্য পাইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, পরমারাধ্যতমা শ্রীযুক্তেশ্বরী দিগম্বরী দেবী, নিস্তারিণী দেবী, হরিবোলা চম্পটী ঠাকুর, শ্রীশ্রীজয়নিতাই দেব, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বকুলাল বিশ্বাস, রণজিত চন্দ্র লাহিড়ী, রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কালিন্দীমোহন মুখার্জ্জী, নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সুধন্বকুমার সরকার, সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী প্রমুখ প্রভুর অতি প্রিয়জনদের কৃপা। তাঁহারা পরম স্নেহে তাঁহাদের চরণোপান্তে বসিবার ও বন্ধু কথা শুনিবার ভাগ্য দিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, গ্রন্থের কৃপা। পরমার্চ্চনীয় দাদা সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "বন্ধুকথা," পরমারাধ্য শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর "জগদগুরু," পূজনীয় যোগেন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের "প্রেমযোগ" বান্ধববর নিত্যসেবক ব্রহ্মচারিজীর "বন্ধুবার্ত্তা," শ্রদ্ধাস্পদ নবদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের Life & Teachings of Sri Sri Prabhu Jagadbandhu," প্রীতিভাজন প্রফুল্লকুমার সরকারের "Jagadbandhu," কবি পরিমল বন্ধুর "প্রভু জগদ্বন্ধু" প্রিয় মহানাম ব্রতের "স্মরণ মঙ্গল" গীতি—এই সব গ্রন্থের নিকট হইতে কৃপা ভিক্ষা লইয়াছি—বন্ধুর অঙ্গন ধূলির কৃপা, বন্ধুর প্রিয়জনদের কৃপা, বন্ধুর গ্রন্থের কৃপা—এই তিন কৃপা গ্রন্থকে রূপ দেওয়াইয়াছে। মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বলিতে পারি "সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" কঠিন তুলসীর মালাটিতে কেহ যদি সূচীদ্বারা ছিদ্র করিয়া দেয়, তবে অবহেলেই সূতা পরাইয়া মালা গাঁথিতে পারি। যাঁহারা পথ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি।

আমার কাঠামো খানি স্নেহাস্পদ শ্রীমান মহানামব্রত নবসাজে সাজাইয়া তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। বান্ধব মুকুটমণি পূজাস্পদ শ্রীপাদ কুঞ্জ দাদা গ্রন্থের প্রত্যেকটী অক্ষর নিজ চক্ষে দেখিয়া পাঠ করিয়া চক্ষু দান করতঃ প্রসাদী কৃপা-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া দিয়াছেন। মুদ্রণকালে প্রীত্যাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিহর দাদা তাঁহার অতুল গুরু-দত্ত কৃপা-শক্তি দ্বারে

স্থানে স্থানে অগুরু আতরের গন্ধ ছড়াইয়া দিয়াছেন। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় পরম যত্নের সহিত ভাষায় বহু ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধণ করিয়া ও আধুনিক রুচিসম্মতভাবে উৎকর্ষ সাধন করিয়া গ্রন্থে মাধুর্য্যাধান করিয়াছেন। আমার শুষ্ক কাঠামো আজ যতটুকু হাসিতেছে, তাহা ভক্তানুগ্রহেই। ইঁহারা সবাই এত নিজ জন যে, ধন্যবাদ্ জানাইয়া দূরে সরাইতে পারি না। প্রভুকে সাজান যাঁহাদের নিত্য ভজন, প্রভুর কথাকেও তাঁহারাই সাজাইতে জানেন। প্রভু আর তাঁর কথা একই তো। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, "বাচি বস্তুন্যপি সমান-রসস্থিতিঃ।" শ্রীহরি বস্তুতেও যে রস, তাঁহার সম্বন্ধীয় বাক্যে অর্থাৎ হরি-কথাতেও সেই রস, অভিন্নই।

লীলা-তরঙ্গিণী গ্রন্থ কত বড় হইবে আজও বলিতে পারি না। এই আকারে সাত আট খণ্ড হইবে এমত অনুমান হয়। সমগ্র গ্রন্থ আজও, উদিত হন নাই। চতুর্থ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইবার পর প্রথমখণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় চারি বৎসর পরে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইল। ভক্ত বান্ধবগণ যদি অপরিমিত কৃপা-শক্তি দান করেন, তবেই বাকী খণ্ডগুলি লেখা হইবে। আর তাঁহারাই যদি অকাতরে অর্থ-শক্তি দান করেন, তবেই সে সব মুদ্রিত হইবে। আমি ভিখারী। দুই হাত পাতিয়া সকলের দুয়ারে "জয় জগদ্বন্ধু" বলিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে দাঁড়াইয়াই আছি।

শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন,
ফরিদপুর।

গোপীবন্ধু দাস

"জয় জগদ্বন্ধু হরি"

"আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের Ambrosia (অমৃত)"—বন্ধুবাণী।

"আমি Sweeper (ঝাড়ুদার), ঝাড়ু দিয়া Purify (পবিত্র) করতে এসেছি"—বন্ধুবাণী।

অগ্রলেখ

ইটালীর রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ রোম নগরে যেখানে রোমান পোপ বাস করেন, সেই স্থানকে ভেটিকান বলে। কোনও সময়ে সেই স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটা চিত্র প্রদর্শনী (Picture gallery) দেখিতেছিলাম। অনেক খ্যাতনামা চিত্রকরের দামী দামী বহু চিত্র সেখানে দেখিলাম। অনেক চিত্রের গায়ে দেখিলাম তাহাদের মূল্য লেখা আছে। মূল্যগুলি আমার কাছে বড় বেশী বেশী লাগিতেছিল। যে চিত্রের এক হাজার পাউণ্ড দাম লেখা আছে, আমার বিবেচনায় তাহার দাম এক হাজার টাকার বেশী হয় না। দেখিতে দেখিতে একখানা চিত্রের গায় একটা অতি অস্বাভাবিক দাম লেখা চোখে পড়িল। উহা দেখিয়া আমি হাসিলাম ও মনের কথাটা মুখে বলিয়া ফেলিলাম। আমার সঙ্গে একজন আমার ইটালীয়ান বন্ধু ও প্রদর্শনীর নিযুক্ত একজন প্রদর্শক বা গাইড্ ছিলেন। গাইড আমাদিগকে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া যাইতেছিলেন ও মাঝে মাঝে ছবিগুলি বুঝাইয়া দিতেছিলেন। আমার কথা শুনিয়া উক্ত গাইড্ বলিলেন, "এই ছবির মূল্য দেখিয়া আপনি অবাক হইয়াছেন, অনেকেই হয়। আমাদের প্রদর্শনীতে যত চিত্র আছে তন্মধ্যে এইখানাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়াছে। আপনাকে আমি চিত্রখানি দেখিবার সুযোগ দিব।"

এই বলিয়া তিনি আমাকে ধরিয়া যেখানে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম সেইখান হইতে তিনি চার হাত পেছনে লইয়া গেলেন ও বলিলেন, "আধ মিনিট চক্ষু বুজিয়া থাকুন।" তাহাই করিলাম। তারপর তিনি বলিলে, চক্ষু মেলিয়া সেই ছবিখানার দিকে আবার তাকাইলাম। সত্যই দেখার মত কিছু বস্তু দেখিলাম। চিত্রখানির সৌন্দর্য্য যেন অভিনব ভাবে

চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। চিত্রে যে ক্ষুদ্র নদীটি বহিয়া যাইতেছে, তাহার তরঙ্গের উপরে শুভ্র ফেনাগুলির নৃত্য স্পষ্ট দেখিলাম। তটভূমিতে ঘাসের মাঠে উড্ডীয়মান ফড়িংগুলির ছোট ছোট চক্ষুগুলিও সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইল। মাঠে বিচরণশীল মেষগুলির গায়ের লোমরাজি যেন গণনা করা যাইতেছিল। লাঠি হাতে একটি লোক মেষ চরাইতেছিল, তাহার দৃষ্টির মধ্যে যেন একটা ইতিহাস, তাহাও পড়িতে পারিতেছিলাম। চিত্রখানি যে এত সুন্দর তাহা আগে দেখি নাই। প্রেক্ষণ-ভূমি বা Perspective জিনিষটা কি তাহা কিছু অনুভব করিলাম। আর মনে হইল, স্থিতি-স্থান ত্যাগ করতঃ দূরে সরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পূর্ব্ব সংস্কার বিস্মৃত হইয়াই দ্রষ্টা হইতে হয়।

সব কিছুই দেখার মত দেখিতে হইলে দৃষ্টি করিবার একটা বিশিষ্ট স্থান বা কোণ চাই। যে-স্থান হইতে যে-বস্তুকে দেখিতে হইবে একমাত্র সেই স্থান হইতেই সেই বস্তুকে দেখিলে প্রকৃত দেখা হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে তত্ত্বতঃ দেখা বলে। এই তত্ত্বতঃ দেখা যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে না খাটিলেও শিল্পীর শিল্পকলা সম্বন্ধে প্রযোজ্যই। আর প্রযোজ্য, সেই সকল দেবপুরুষদের জীবন সম্বন্ধে, যাঁহাদের জীবন-চিত্রের কারুকার্য্য অতি নিপুণ শিল্পের শিল্পকলাকেও হারাইয়া দেয়। যাঁহাদের জীবন-সঙ্গীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীত অপেক্ষাও মধুর, যাঁহাদের জীবন-কাব্য সকল মহাকাব্যের শীর্ষ-দেশে বিরাজমান, যে-সকল পরম-মহৎ জীবনের মধ্যে সত্য শিব ও সুন্দরের শাশ্বত মূর্ত্তি উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত, তাঁহাদিগকে দেখিতে, বুঝিতে ও অনুভব করিতে হইলে, একটা বিশিষ্ট প্রেক্ষণ ভূমি বা দৃষ্টি-কোণ অবশ্যই প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের জীবন-লীলা একখানি শাশ্বত সুন্দর আলেখ্য স্বরূপ। তিনি আপনিই তাহার শিল্পী ও আস্বাদক। তাঁহাকে দেখিবার মত, বুঝিবার মত যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী আমি-অভাজন লাভ করি নাই। একান্ত কৃপানুগত ভিন্ন অপর কেহ করিয়াছেন বলিয়াও জানি না। যতদিন ভোগ

বিলাসের প্রবাহে মানব সভ্যতা ভাসিয়া চলিবে ততদিন কেহ ঐ দৃষ্টি লাভ করিবে বলিয়া মনে করিতেও পারি না। তবে আশা ও ভরসা; সেদিন আসিবে, আসিতে বাধ্য হইবে। নিশীথিনীর গাঢ়তম অন্ধকারের পর অরুণের রক্তিম কিরণ-রেখার মত এক মাহেন্দ্রক্ষণের উদয় হইবে, যেক্ষণে সবাই তাঁহাকে দেখিবে, দেখিবার মত যোগ্য ভূমি ও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিবে। কারণ, সে যে আনন্দ-রসের ঘন-সত্বা; তাঁহাকে না দেখা পর্য্যন্ত আনন্দ-হারা জীব 'আনন্দী' হইবে কেমন করিয়া? যে-দিন 'আনন্দী' হইবে, সেই দিনই কিছু বলিতে পারিবে। তার আগে যে বলা, সে কেবল বাচালতা দোষ-প্রযুক্ত ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।

অপৌরুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার শ্রুতি-শাস্ত্র সত্য-দর্শনের পাঁচটি ভূমিকার কথা কহিয়াছেন,—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। অন্নময় ভূমি জড়ভূমি বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভোগভূমি। অধিকাংশ লোক অধিকাংশ সময় এই ভুমিতেই বাস করে এবং এখান হইতে সব কিছু দেখে এবং বিচার করে। কিন্তু এখান হইতে নিছক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ভিন্ন, অপর কিছুই দেখা বা বুঝা যায় না। দ্বিতীয় প্রেক্ষণ ভূমি—প্রাণময়, ইহা অন্নময় ভূমির উর্দ্ধে হইলেও ভোগভূমিই বটে। তবে ইহা পশূচিত ভোগ নহে মানবোচিত ভোগতৃপ্তি। কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নহে, ঔচিত্য বুদ্ধির দ্বারা কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত প্রাণের তৃপ্তি। যেরূপ তৃপ্তি স্বাস্থ্যকর, বলকারক, আয়ুবর্দ্ধক, সেইরূপ তৃপ্তি এই ভূমির কাম্য। এই ভূমি রসনার আপাত সুখকে বিসর্জ্জন করে, যদি তাহা প্রাণশক্তির বর্দ্ধক না হয়। প্রাণ-চাঞ্চল্যেই কর্ম্মের বিকাশ। এই প্রাণ-ভূমিই কর্ম্ম-ভূমি।

তৃতীয়—মনোময় ভূমি। ইহা বুদ্ধির ভূমি, বিচারের ভূমি, কর্ম্মপ্রেরণা ও সুখ দুঃখ বোধের ভূমি। এখানকার দৃষ্টি কেবল বলবর্দ্ধক বা জীবন-পোষক বস্তুর প্রতি নহে। এখানকার চাহিদা বুদ্ধির তৃপ্তি, মনে শান্তি ও জ্ঞানের পূর্ত্তি। কেবল স্বাস্থ্য ও সম্মান রক্ষা করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাই যথেষ্ট

নহে, বিদ্যার বিকাশ, শিল্পকলার প্রসার, মানসিক বৃত্তি-সমূহের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চাই। এই সকল মনোভূমি-স্থিত ব্যক্তির কথা। এই সব কথা যাঁহারা বলেন, সংসারে তাঁহাদিগকে আমরা নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট জন বলিয়া শ্রদ্ধা করি। যেখানে বর্ত্তমান সভ্যতা খুব সুষ্ঠুভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেখানে এই ভূমি পর্য্যন্তই উন্নয়ন দৃষ্ট হয়। এইটি নীতি বা Moralityর ভূমি। এই ভূমি পর্য্যন্ত ভালমন্দ, আলাপ-আলোচনা ভাব-আদর্শ যাহা কিছু তাহা আমরা কতকাংশ অনুভব ও অনুধাবন করিতে পারি। ইহার উর্দ্ধের কোনও কথা আমাদের ভাবনা আর নাগাল পায় না।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের জীবনধারা এমন এক উত্তুঙ্গ ভূমিতে বিরাজিত যে, এই তিনভূমি হইতে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলে কিছুমাত্রই দেখা যাইবে না। এই তিন ভূমিকায় তিনি অদৃশ্য বস্তু তুল্য। এই তিন ভূমিকাস্থিত জীব তাঁহাকে বুঝিতে বা তাঁহার সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করিতে অক্ষম। উক্ত তিন ভূমিকার উপরে শ্রুতি আরও দুইটি ভূমিকা স্থাপন করিয়াছেন, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। এই দুইটি প্রভুবন্ধুকে জানিবার ও আস্বাদন করিবার প্রকৃষ্ট প্রেক্ষণ ভূমি। বিজ্ঞান-ভূমি একত্বের ভূমি। বুদ্ধি-বৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি ও সংবেদন সব এক হইয়া মিলিত আছে এই ভূমিতে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-নীতি, জীবন-নীতি—সবগুলি মিলিয়া অখণ্ডত্ব পাইয়াছে যে-ক্ষেত্রে সেইটি বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞানের ক্ষেত্র। অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় ভূমিকে যদি যথাক্রমে material, biological ও psychological stand-point বলি তাহা হইলে প্রজ্ঞান ভূমিকে universal stand-point বলা যাইতে পারে। ব্যক্তি জীবনের সমস্যা, সামাজিক জীবনের সমস্যা ও জাতীয় জীবনের সমস্যা ঐ প্রজ্ঞানের একত্ব ভূমিতেই সামঞ্জস্য লাভ করে। প্রভু বন্ধুসুন্দরের শিক্ষা, উপদেশ ও আচরণ এই ভূমি হইতেই আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমে আরও উর্দ্ধে আনন্দময় ভূমিতে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে।

আনন্দময়-ভূমি ঋষির অনুভূতির শিখর দেশ। এই ভূমির কার্য্য আত্ম-সংবেদন ও স্বাস্বাদন, যেখানে স্ব আর পর মিলিয়া গিয়াছে, আত্ম আর বিশ্ব-একত্ব পাইয়াছে, সেই চেতনার ভূমি জ্ঞানের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানময় ও রসের দৃষ্টিতে আনন্দময়। একত্বের মহাসমুদ্রের উপরিভাগ প্রজ্ঞান-ঘন বিজ্ঞান-ময় ভূমি। গভীর তলদেশে আনন্দ-ঘন-সত্তা। জ্ঞানী-দ্রষ্টা সমুদ্রের উপরেই ভাসেন। রসিক-আস্বাদক অতলতলে ডুবিয়া থাকেন। অন্নময় ভূমির ভোগবাদ, প্রাণময় ভূমির কর্ম্মবাদে সার্থক হয়। প্রাণ ভূমির কর্ম্ম-চাঞ্চল্য মনোভূমির নীতির (Ethics) মধ্যে শান্ত হয়। নীতিবাদ বিজ্ঞান ভূমির প্রজ্ঞালোকে উজ্জল ও স্বাভাবিক হইয়া যথার্থতা লাভ করে। ভোগ, কর্ম্ম ও নীতিকে সার্থকতা দান করে প্রজ্ঞা। এত করিয়াও কিন্তু প্রজ্ঞা নিজে বিজ্ঞান ভূমিতে আপনার পূর্ণতাকে পায় না, অপূর্ণতার মধ্যে আপনাকে খোঁজে। তারপর রসভূমিতে আনন্দময় সত্তায় প্রজ্ঞা আপনাকে পায়। পাইয়াই আবার হারায়। এই আপনহারা ভাবের মধ্যেই আপনাকে পাওয়া যথার্থ হয়। জ্ঞান যেন তখন এক অভিনব অজ্ঞানতার রূপ ধরে। আলোর আতিশয্য যেন আঁধার সৃষ্টি করে। এই জ্ঞান-ভূমিস্থিত জ্ঞান-শূন্যতায়, আলো ভূমিস্থিত প্রেমান্ধতায় আনন্দঘন শিশুভাব খেলিয়া বেড়ায়। সকল বিরুদ্ধ ভাব আনন্দের অসীমতায় একাকার হইয়া রহে।

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী গ্রন্থের গ্রন্থকার গোপীবন্ধু দাসজী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের লীলাসরিৎ তারুণ্যামৃত, কারুণ্যামৃত ও লাবণ্যামৃত এই তিন ধারায় বিভাগ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভু বন্ধুসুন্দরের জগতে আত্মপ্রকাশ হইতে শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ কাল পর্য্যন্ত, তারুণ্যামৃত ধারা। শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ হইতে নির্জনে আত্মসংগোপন পর্য্যন্ত কারুণ্যামৃত ধারা, আত্মসংগোপন অবধি মহাদশায় নিমজ্জন পর্য্যন্ত লাবণ্যামৃত ধারা। গ্রন্থের প্রথমলহরী বা তারুণ্যামৃত ধারা এই সবে মাত্র প্রকাশিত হইতেছে। সমগ্র গ্রন্থ কতদিনে প্রকাশ হইবে গ্রন্থের আরাধ্য দেবতাই জানেন। বস্তুতঃপক্ষে

বন্ধুসুন্দরের জীবন-তরঙ্গিণী একটি অখণ্ড বস্তু। তারুণ্য-কারুণ্য-লাবণ্য-ধারা তাহাতে ওতপ্রোত বিরাজমান।

শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী লিখিয়াছেন :—

"তারুণ্য-কারুণ্য-লাবণ্য মূর্ত্ত রহে স্বরূপ রসে ভোর।
যে দে'খেছে সেই ম'জেছে তার রূপের নাইক' ওর ॥"

বিভাগ কেবল অখণ্ডকে অনুভব করার অযোগ্যতা নিবন্ধন। ওতপ্রোত ত্রিধারাময় এই লীলাতরঙ্গিণী বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই দুইটি পরিপ্রেক্ষিতেই বেদ্য ও আস্বাদনীয়। তারুণ্য-কারুণ্য-লহরী বিজ্ঞানের সৌরকরে সমুজ্জ্বল। উদ্বেল লাবণ্যসিন্ধু অখণ্ড আনন্দের চাঁদিনীতেই উচ্ছ্বসিত।

উর্দ্ধতর ভূমিকাতে নিম্নতন ভূমিগুলি গুণীভূত, কেবল গ্রহণ করিবার ভঙ্গীটি পৃথক। অন্নগত জনের মুখে শুধু ভোগের কথা। প্রাণবন্তের মুখে শক্তিলাভের দৃষ্টিতে ভোগের আলোচনা। মননশীলের পক্ষে নীতির মর্য্যাদায় বীর্য্যরক্ষা ও ভোগ। প্রজ্ঞাবানের পক্ষে বিশ্বাত্মায় আপন আত্মা মিলাইয়া দিয়া, বিশ্বনীতির মর্য্যাদায় ওজস্বী দেহে ভোগের স্থান। সর্ব্বোচ্চে আনন্দ-ঘন ক্ষেত্রে নিষ্কাম ত্যাগের ভূমিতে ভোগের কথা ও ভোগের ভূমিতে ত্যাগের কথা। ইহা এক অদ্ভুত গতিময় (dynamic) দোলন। এই দোলনেই আনন্দময় জীবন-দোলা নিত্যানন্দে নবায়মান থাকে।

শ্রীশ্রীপ্রভু বন্ধুসুন্দরের অসূর্য্যম্পশ্য অবস্থায় নির্জন কুটীরে মহাগম্ভীরায় প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ত্রিংশ বৎসর যে শিক্ষা ও উপদেশ তদীয় মহাবাণী ও মহতী জীবনধারার মধ্য দিয়া মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, তাহা একটি অভিনব অখণ্ড বস্তু। সরল কথায়, ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম এই দুইটি শব্দ দ্বারা সেই অখণ্ড বস্তুকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই কথা দুইটি ভাসা ভাসা বুঝিলে সেই অখণ্ড শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। ব্রহ্মচর্য্য বলিতে বীর্য্য-ধারণ, এই কথা ঋষি পতঞ্জলির যুগ হইতে প্রসিদ্ধ। হরিনাম কীর্ত্তনে

ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, এই কথা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কাল হইতে সর্ব্বজনবিদিত। প্রভুবন্ধুর বৈশিষ্ট্য এই তু'য়ের অবিচ্ছেদ্য মিলনে। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কঠোর। ব্রহ্মচর্য্য সাধনে জীবনরস শুষ্ক হয়। নাম কোমল, নামের সাধনে কোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলন হয়, তাহাতে মানব কমনীয় নারী-সুলভ ভাব বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা ও সমালোচনা প্রায়শঃ শ্রুত হয়। এই আলোচনাতে কিছু সত্য যে নাই এমন নহে। প্রভু বন্ধুসুন্দর ব্রহ্মচর্য্য সাধনকে সরস করিয়া, হরিনাম সাধনকে সুদৃঢ় করিয়া, স্বীয় জীবনপটে তাহাদের এক মহামিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন।

কেবলমাত্র শুষ্ক কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতাদ্বারা যোগী তপস্বীর বীর্য্যধারণ প্রভুবন্ধুর অভিপ্রেত ব্রহ্মচর্য্য নহে। কামের বিনাশ দ্বারা প্রেমের বিকাশই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য পদ বাচ্য। আত্মপ্রীতি ইচ্ছাই কাম, রসরাজের প্রীতি ইচ্ছাই প্রেম। আত্মপ্রীতির ত্যাগে ও রসময়ের প্রীতির উপভোগে ব্রহ্মচর্য্য সার্থক। পক্ষান্তরে, মৃদঙ্গাদি যোগে নাম সংকীর্ত্তনেই হরিনাম সাধন পূর্ণ নহে। ব্রজের উন্নতোজ্জ্বল রসাস্বাদনই হরিসাধনের চরম পরিণতি। হরিনাম শব্দ হরিঠাকুরের নাম মাত্র নহে। হরি বলিতে গুরু-গৌরাঙ্গ-গোপী-রাধা-শ্যাম বুঝায়। ইহাই প্রভুবন্ধুর শ্রীমুখোক্ত বাণী। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মধ্যে যে রাধা-শ্যামের মিলন মাধুরী মূর্ত্ত রহিয়াছে, গুরু কৃপায় গোপীভাবে সেই মাধুরী আস্বাদনেই হরি কীর্ত্তনের সার্থকতা। নিরুপাধি প্রেমভূমি বিকশিত হইলেই এই আস্বাদন চলে। প্রেমের বিকাশেই হৃদরোগ কামের বিনাশ হয়। মঞ্জরীরূপে রসরাজের রস তৃপ্তির উপভোগে আত্ম ভোগেচ্ছা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই দৃষ্টিতেই ব্রহ্মচর্য্য সাধন ও হরিনাম সাধন এই দুইয়ের অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠিত। ভোগের ভূমিতে থাকিয়া ত্যাগই ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগের ভূমিতে স্থিত হইয়া রসরাজের নিখিল রসের ভোগাস্বাদনই হরি-সাধন। প্রভুবন্ধুর জীবন-প্রয়াগে এই গঙ্গা যমুনার মহামিলন অভিনব বটে। এইখানে ত্যাগে

ভোগ ও ভোগে ত্যাগের অপূর্ব্ব সমন্বয়। প্রজ্ঞানঘন একত্ব ভূমিকাতেই সমন্বয়ের ভিত্তি। এই ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির সংগঠনেই পরাৎপর শান্তির পূর্ণ রাজত্ব। কারণ, ভেদের জঞ্জাল এখানেই তিরোহিত। ঐ জঞ্জাল ঘুচাতেই প্রভুবন্ধুর আগমন। তাই তো নিজ শ্রীমুখে কহিয়াছেন।

"আমি Sweeper, ঝাড়ু দিয়া Purify করতে এসেছি।"

প্রেম-পূর্ণেন্দু প্রভুবন্ধু লোক শিক্ষায় ত্রিংশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য-হরিসাধনের মূর্ত্তি-স্বরূপ বিরাজমান থাকিয়া ক্রমে মহা-গম্ভীরায় লাবণ্যামৃত-সমুদ্রে স্বমাধুর্য্য আস্বাদনে নিমজ্জমান হন। এক অদ্বিতীয় পরাচৈতন্যঘন লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দ স্বীয় আনন্দময়ী মহাভাবময়ী শক্তিকে আপনা হইতে পৃথক করিয়া নিত্যকাল তদাস্বাদনে নিরত। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে ঐ পরম-পুরুষ ও পরমা-প্রকৃতির ভেদাভেদ সম্বন্ধ নবায়মান মিলন বৈচিত্র্যে মূর্ত্তিমন্ত। অষ্টাদশবর্ষ নীলাচলে গম্ভীরায় সেই নিত্যনব আস্বাদনই প্রকটিত। সেই আস্বাদন বৈচিত্র্যেরই পরাপূর্ত্তি শ্রীশ্রীহরিপুরুষের স্বানুভাবে, "পঞ্চম বর্ষীয় শিশু উদ্ধারণে ভাসে" এই মহাভাবময় অবস্থায়। এই শিখর ভূমিতেই সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের পূর্ণতম বিকাশ।

গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল বলিতেন, Self-contemplation বা আত্ম ধ্যানেই মানবত্বের পূর্ণতা, কারণ ঐক্ষণে মানব পরম পুরুষের অনুকরণ করে। বৈষ্ণব আচার্য্যেরাও বলেন হ্লাদিনী শক্তির দর্পণে "স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ"—রসরাজের আপন রসস্বরূপতার প্রতিবিম্ব দর্শনে—উন্নতোজ্জ্বল রসভূমিকায় আত্মাস্বাদনেই রসিক শেখরের বিশ্বলীলা ও রসলীলার পূর্ণতমতা। এই আস্বাদনের প্রাণ-কেন্দ্রে আছে একটি লোভ ও অতৃপ্তি। মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র; তাহাতে আছে মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী রাগাত্মিকা প্রেমাস্বাদনের লোভ। সেই লোভের তৃপ্তি ব্রজে। ব্রজ-নায়কের আছে ভানুকুমারীর মাদনাখ্য-মধুরিমা আস্বাদনের লোভ; সেই লোভের

তৃপ্তি নদীয়া-নীলাচলে। নদীয়া নাগরের আছে অভেদে ভেদবিশিষ্ট হইয়া পঞ্চ-তত্ত্বের একক সর্ব্বসমষ্টি স্বরূপে পূর্ণভাবে স্বাস্বাদনের লোভ। সেই লোভের তৃপ্তি ফরিদপুর গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে মহাগম্ভীরায় মহামৌনী অবস্থায় শ্রীহরিপুরুষ স্বরূপে। লাবণ্যামৃত ঘনবিগ্রহ শ্রীহরিপুরুষ-স্ব-স্বরূপে নিত্যই স্থিত আছেন। শ্রীঅঙ্গনধামে বিংশতিবর্ষ তাহা প্রকটিত ছিল। এই স্বরূপেই বলিয়াছেন, "আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এমব্রোসিয়া বা অমৃত।" বস্তুতঃ ঐ ঘনানন্দই অনন্তবিশ্বের পরামৃত। আনন্দময় ভূমিতে নিত্য প্রবাহিত ঐ অমৃতই ভক্তের চির আস্বাদনের ধন। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী, স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যঋষিকে বলিয়াছেন—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কেন কুর্য্যাম্
যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রুহি ॥"

যাহা দ্বারা অমৃত হইব না, তাহা দ্বারা কি করিব? স্বামিন্, সেই অমৃতের সন্ধান নিশ্চয়রূপে যাহা জানেন, তাহাই বলুন।

গোপীদাদা লীলাতরঙ্গিণী গ্রন্থে সেই "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরামৃতই" বিলাইয়াছেন। এ ছাড়া, সন্ধানের ধন, আদরের ধন, আস্বাদনের ধন আর কী আছে! ভক্তগণ 'লৌল্য'রূপ মূল্য দিয়া অমূল্য-ধন গ্রহণ করুন। ধন্য হউন।

মহাউদ্ধারণ মঠ, কলিকাতা
৫৭, মানিকতলা মেন রোড,
শ্রীবন্ধু নবমী, হরিপুরুষাব্দ—৭৮।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

সূচীপত্র

প্রিয় বকুলাল সঙ্গে

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী

তারুণ্যাম্বৃত-ধারা

প্রথম লহরী

"বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ"

"ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"

'জগদ্বন্ধু' যাঁহার নাম, তপ্ত কাঞ্চনের মত মহোজ্জ্বল যাঁহার শ্রীঅঙ্গের বর্ণ, জীব-দুঃখ-কাতর যাঁহার বিশাল হৃদয়, বিশ্বকল্যাণ-ময় 'মহাউদ্ধারণ'-মহাব্রতে যাঁহার সকল কর্ম্ম কেন্দ্রীভূত, তিনিই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা। যিনি নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, চিরকুমার, ত্যাগ-তপশ্চর্য্যা-ব্রহ্মচর্য্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ, তিনিই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা। যাঁহার প্রাণ-স্পর্শী উপদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া পরম মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত শতসহস্র নর-নারী জীবনে কলুষময় পথ চিরত্যাগ করতঃ নির্ম্মল ব্রজের ভজনে শাশ্বত শান্তি ও পরানন্দের আস্বাদনে ধন্য হইয়াছে, যাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রীলেখনী-প্রসূত গৌর-গোবিন্দ-লীলারস-পুটিত সংকীর্ত্তনের পদ-পদাবলী মানবমাত্রের অন্তরে প্রেমের উৎস ছুটাইয়া দেয়, সেই পরম পুরুষ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা।

যিনি স্বীয় অলোকসামান্য রূপরাশির উজ্জ্বল ছটায়, প্রাণ-মাতানো, দরদ-মাখানো মধুর কথায় "পুরুষ যোষিত কিংবা স্থাবর জঙ্গম" সকলকে সব ভুলাইয়া আকর্ষণ করতঃ স্বীয় বিশ্বজনীন প্রেমের কোলে স্থান দিয়াছেন, যিনি বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে হিন্দুসমাজের চির-উপেক্ষিত নীলকুঠির অত্যাচারে জর্জ্জরিত পতিত 'বুনা'-জাতিকে মানবত্বের মহত্ত্বে মহীয়ান করিয়া 'মোহান্ত'-পদবী দানে স্বীয় উদ্ধারণ-ব্রতের প্রথম অধ্যায় প্রকট করিয়াছেন, যিনি কলিকাতা-সহরের তৎকালীন সর্ব্বাপেক্ষা পতিত স্থান রামবাগান-অঞ্চলে অবস্থান করিয়া তত্রত্য ঘৃণিত নিপীড়িত উচ্ছৃঙ্খল ডোম-জাতিকে সুদুর্লভ ভক্তিধনে ধনী ও সংকীর্ত্তন-রসে সিক্ত করতঃ আপন পতিত-পাবন-নাম সার্থক করিয়াছেন, সেই পুরুষপ্রবরই এই গ্রন্থের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

যিনি নিজ মাধুর্য্যময়ী মোহন-লীলার প্রথম ভাগে তারুণ্যামৃত ধারায় ভাসিয়া ব্রজ-নায়ক-রূপে প্রিয়ের দেওয়া "পিরীতি-মধু" আস্বাদন করিয়াছেন, মধ্যভাগে কারুণ্যামৃত ধারায় ডুবিয়া নদীয়া-নায়ক গৌরকিশোর-রূপে নামসংকীর্ত্তন-রস-সুধায় নিজেকে ও নিজজনকে সুধাময় করিয়াছেন, এবং অন্ত্যভাগে পরমাতিপরম লাবণ্যামৃত ধারার অতলতলে নিমজ্জমান রহিয়া মহাউদ্ধারণ-মহানায়ক-রূপে একটি নিভৃত পর্ণকুটীরে স্তিমিত বাক্ হইয়া অসূর্য্যম্পশ্য অবস্থায় ব্রজ-গৌড়-মিলনময় মহাগম্ভীরায় স্বানুভাবরসে ডগমগ ছিলেন; যিনি যোগীর দৃষ্টিতে যোগারূঢ়, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্থিতপ্রজ্ঞ, বেদান্তের দৃষ্টিতে ব্রহ্মভূত, যিনি

ভক্তের দৃষ্টিতে ভক্তরাজ, প্রেমিকের দৃষ্টিতে মধুর-ভাবের ঘনীভূত প্রতিমা এবং সর্ব্ব-দর্শন-মুকুটমণি রস-দর্শনের দৃষ্টিতে—উন্নতোজ্জ্বল রস-বারিধির আস্বাদন-বিতরণ ভূমিকায়—যিনি ব্রজবনে প্রবর্ত্তক, গৌড়দেশে সাধক, গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে সিদ্ধ মহাভাবে বিভোর; যাঁহার মত জীবের দরদী আর নাই, যিনি ধ্বংসোন্মুখী জীবজগৎকে রক্ষাকল্পে নিজাঙ্গে মহাপ্রলয়াঘাত ধারণ করতঃ 'মহামৃত্যু' বরণ করিয়াছেন, এবং "তোমরা হরিনাম ক'রে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশা'য়ে লও, আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কা'রো নই" বলিয়া কাঁদিয়া যিনি হরিনামে আপনা বিকাইয়াছেন, 'হরিনাম প্রভু জগদ্বন্ধু' ইহাই যাঁহার স্বহস্ত-লিখিত চরম আত্মপরিচয়, সেই সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও তন্ময়তার চিরজীবন্ত বিগ্রহ মহাবরেণ্য পরমপুরুষ 'শ্রীহরিপুরুষ'ই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মহনীয় মহানায়ক। তাঁহারই 'ভর্গঃ' ধ্যান করি। তাঁহার কথাকীর্ত্তনে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি তিনিই "প্রচোদিত" করুন!

তাঁহারই মৃতসঞ্জীবনী, কলুষহারিণী সুধাময়ী কথার পূজা করিব—এই সাধ। এ সাধ স্বতঃ, স্বাভাবিক ও অহৈতুকী। আনুষঙ্গিক লাভ আত্মশোধন, রসাস্বাদন ও তৃষ্ণার্ত্ত ভক্তের তৃষ্ণাতৃপ্তি। অযোগ্যতা আমাদের সর্ব্বতোমুখী। ভরসা মাত্র একটি—যাহারা কৃপাময়ের কৃপাসিন্ধু-অবগাহনে সর্ব্বদা সিক্ততনু তাঁহাদের কারুণ্যের একটি কণা। "যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ।"

কুলের কিনার হ'তে

"নানা মধুর রূপায় নানা মধুর বাসিনে।
নানা মধুর লীলায় নানা সংজ্ঞায়তে নমঃ॥"
—শ্রীসনাতন

শ্রবণ-মন-রসায়ণ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের কথা অপ্রাকৃত সুর-তরঙ্গিণী-ধারা। তাহা অনাদি ও অফুরন্ত। ক্ষুদ্র টিট্টিভ-পাখীর সাগর-সিঞ্চনের সাধ। ভরসা—যে-কুলের অবতংস হইয়া অবতরণ করিয়াছেন সেই চক্রবর্ত্তীরাজ শম্ভুনাথের সুপবিত্র কুল। সেই কুলের কূলে কূলেই কার্য্যারম্ভ করিব।

ঋতুর রাণী শরৎকুমারী আসিয়াছেন। শস্যভারে শ্যামলা বাংলা জগজ্জননীর আগমনী গাহিতেছে। মায়ের চরণ স্পর্শ পাইব এই লালসা লইয়া বনপথে শেফালী ঝরিতেছে। জলে স্থলে স্পর্দ্ধা করিয়া কমল ফুটিয়া মায়ের মুখের হাসির অনুকরণ করিতেছে। মহিষমর্দ্দিনীর অভ্যর্থনায় দুর্ব্বল বাঙ্গালীর 'দ্বিসপ্তকোটিভুজ' ঊর্দ্ধে প্রসারিত হইয়াছে। কোমরপুর-গ্রামের বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে। সবাই চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী জগন্মাতার শান্তোজ্জ্বল প্রতিমা দর্শন করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আজ শুক্লা পঞ্চমী। আগামী কল্য ষষ্ঠী—শুভ অধিবাস।

কোমরপুর-গ্রামখানি ফরিদপুর-জেলায়—গোয়ালন্দের পার্শ্বে। বঙ্গ-জননীর বসনাঞ্চলের এই দিকটা সর্ব্বদাই পদ্মার হাওয়ায় উড্ডীয়মান। পদ্মার কিনারের পল্লীগুলির শোভাসম্পদ

নিপুণ চিত্রকরের কল্পনাকেও হারাইয়া দেয়। কোমরপুর-গ্রামখানি অতি প্রাচীন। লোকে বলে, নদীয়া-জীবন গৌরহরি পূর্ব্ববঙ্গে পদার্পণ করিয়া এইখানে কিছুদিন রহিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরও বলিয়াছেন,—

"পদ্মাবতী দেখি প্রভু পরম হরিষে।
সেই স্থানে রহিলেন তার ভাগ্য বশে॥"

কিংবদন্তী এই যে, শচীনন্দন কোমরপুরের পদ্মায় কোমর পর্য্যন্ত জলে অবতরণ করিয়া অবগাহন করিয়াছিলেন। সেই গৌরবে সে কোমরপুর নাম ধারণ করিয়া করুণা-নিদানের কৃপার স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু, হায়, কে জানিত যে মর জগতের সঙ্গে কোমরপুর-গ্রামের সম্পর্ক অদ্য পর্য্যন্তই শেষ! কে কল্পনা করিতে পারিত যে আগামী কল্যই সে চিরনীরব হইয়া কালের গর্ভে লুক্কায়িত হইয়া পড়িবে!

"পারে না বহিতে নদী জলধার।" বারিরাশির ভারে আক্রান্তা পদ্মা গর্জ্জিয়া চলিয়াছে। কত মান্যজনের মহনীয় কীর্ত্তি যে কীর্ত্তিনাশিনী নাশ করিয়াছে চিত্রগুপ্তই তাহার একমাত্র সাক্ষ্য। তথাপি, কেহ কিন্তু পূর্ব্বদিনও কল্পনা করে নাই যে কোমরপুরের কীর্ত্তি-প্রদীপ মায়ের শুভ অধিবাসের ক্ষণেই চির-নির্ব্বাপিত হইবে।

কোমরপুর-গ্রামময় অকস্মাৎ প্রলয়-কোলাহল উত্থিত হইল। "কাল-তরঙ্গ-রঙ্গ" গর্জ্জিয়া উঠিল। জগতের নশ্বরতা, মানবের অসহায়তা ও মান-প্রতিষ্ঠার ক্ষুদ্রতাকে কে যেন বজ্র-নির্ঘোষে

জানাইয়া দিল—সব শেষ! কে কোথায় গেল কেহই জানিল না।

একখানি বড় নৌকা পদ্মায় ভাসিয়া চলিয়াছে। নৌকার বহির্ভাগে উন্মুক্ত স্থানে একখানি নয়নাকর্ষী শ্রীদুর্গা-প্রতিমা। পার্শ্বে শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলবিগ্রহ। আশেপাশে স্তূপীকৃত নানা গৃহসামগ্রী। মধ্যে গৃহবধূ ও বালক-বালিকা। একদিকে শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কনিষ্ঠ ভাই আরাধনের কণ্ঠ ধরিয়া মৌনগাম্ভীর্য্যে উপবিষ্ট। নৌকা কোথায় যাইবে আরোহীরাও জানে না, মাঝিরাও জানে না। কেবল আরাধনের আরাধ্য দেবতাই জানেন বিপন্ন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর এই ভরা নৌকা কোথায় গিয়া ঠেকিবে!

নূতন ঘাটে

"ভক্তেচ্ছা পূরণ ব্যগ্র শুদ্ধসত্ত্বঘন প্রভো।
বন্দে দেবাধিদেবং ত্বাং কৃপালো বিশ্বপালক॥"

—শ্রীসনাতন

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকাখানি ফরিদপুর-সহরের উপকণ্ঠে একখানি পল্লীতে পৌঁছিল। পল্লীর শ্রী দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া আরাধন চক্রবর্ত্তী তীরবর্ত্তী নরনারীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন গ্রামখানির নাম গোবিন্দপুর। নামটি শুনিয়াই ভক্ত আরাধন ভাবিলেন—যদি এখানে গোবিন্দের আসন প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই তো এই নাম সার্থক হয়। নৌকা ঘাটে লাগিল।

আরাধন নৌকার উপরেই শ্রীরাধাগোবিন্দের সম্মুখে বসিয়া শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন। ব্যথিত হৃদয়ের আবেগভরা সন্ধ্যারাত্রিকের আনন্দের মধ্যে স্বর্গের সুষমা ফুটিয়া উঠিল। বেদনা-ভারাক্রান্ত বুকে শম্ভুনাথ নয়ন মুদিয়া ভাবিতেছেন— কাল মায়ের অধিবাস ! আমি নিরাশ্রয়। শুধু বিশ্বজননীকে অর্চ্চনা করিবার একটু স্থানও কি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার জুটিবে না ! তপ্ত অশ্রু মায়ের চরণোপান্তে পৌঁছিল,—সংসারে একমাত্র ঐ বস্তুই সেখানে পৌঁছায় !

অকস্মাৎ পদ্মার ঘাটে শঙ্খ-ঘণ্টার রোল উঠিল। কৌতূহলী বালক-বৃদ্ধ-কুলবধূ তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। অপ্রত্যাশিত অপূর্ব্ব দৃশ্য সকলের মন-প্রাণ আকর্ষণ করিল। মা দশভুজার সুন্দর মুখখানি চন্দ্রালোকে ঝলমল করিতেছিল। সিংহাসনোপরি শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ যমুনায় নৌকাবিলাস-কেলির শোভা ছড়াইতেছেন। অনুসন্ধিৎসু-আবালবৃদ্ধ সবাই ব্যাপারটি জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িল। জানিতে বেশী দেরী হইল না। কথাটা মুখে মুখে সারা গ্রামময় ছড়াইয়া গেল—কোমরপুরের একটি ব্রাহ্মণ-পরিবার নদীর ভাঙ্গনে গৃহশূন্য হইয়া শ্রীদুর্গা-প্রতিমা-সহ নৌকায় ভাসিয়া গোবিন্দপুরের ঘাটে আসিয়াছেন।

মুক্তারাম সরকার

গোবিন্দপুর-গ্রামখানি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু—ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান বহু নরনারী-অধ্যুষিত। গ্রামের জমিদার মুক্তারাম সরকার। মুক্তারাম ধনশালী, কিন্তু ধনের প্রভাব তাঁহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই। তাই লোকে তাঁহাকে কেবল মর্য্যাদা দেখায় না, শ্রদ্ধাও করে। প্রত্যুষে তিনি প্রাতঃকর্ত্তব্যে পদ্মার ঘাটে আসিয়া দুর্গা-প্রতিমাবাহী নৌকার আরোহীদের পরিচয় জানিতে আগ্রহ দেখাইলেন। নৌকা হইতে মুখ বাহির করিয়া শম্ভুনাথ বলিলেন—"আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীশম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী। পিতার নাম স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল চক্রবর্ত্তী। কোমরপুরের বাসুদেব চক্রবর্ত্তীর নাম হয় তো শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার পুত্র রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী আমার পিতামহ। প্রপিতামহের আমল হইতে বাড়ীতে যে-চতুষ্পাঠী ছিল তাহাতেই আমি অধ্যাপনা করিতাম। আজ পদ্মার ভাঙ্গনে বাড়ীঘর বিত্তসম্পদ্ সর্ব্বস্বহারা হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছি। আজ মায়ের অধিবাস, কোথায় একটু স্থান পাইব তাহাই ভাবিতেছি।"

শম্ভুনাথের বর্ণিত কাহিনী শুনিয়া মুক্তারামবাবু বলিয়া উঠিলেন—"আপনি ভাবিবেন না, আমার বাড়ীতেই আপনাকে স্থান দিব।" হৃদয়বান্ মুক্তারামের কথা শুনিয়া আরাধন নৌকার বাহিরে আসিলেন। শম্ভুনাথ মুক্তারামের নিকট ভাইয়ের পরিচয় দিয়া কহিলেন—"ইনি আমার খুল্লতাত স্বর্গীয় কৃষ্ণধন

চক্রবর্ত্তীর পুত্র, নাম শ্রীমান্ আরাধন চক্রবর্ত্তী। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত। কিছুদিন নাটোর-রাজবাড়ীর সভাপণ্ডিত ও রাজকুমারের গৃহশিক্ষক ছিলেন। বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদে বঙ্গাধিকারী রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সভাপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ডাহাপাড়া-গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতঃ অধ্যাপনা করেন। পূজায় বাড়ী আসিয়া এই বিপদ। আজ যদি আপনার অনুগ্রহে এই বিপদে মায়ের পূজাটি নিশ্চিন্তে নির্ব্বাহ করিতে পারি, তবে প্রাণে একটা তৃপ্তি পাই।” মুক্তারামের চোখে জল আসিল। তিনি নিজের লোকজনকে আদেশ দিয়া দ্রব্যসামগ্রী-সহ দেবী-প্রতিমা আপন-বাড়ীতে তুলিলেন। পুত্রকন্যা-পরিজন-সহ শম্ভুনাথকে নিজ-বাড়ীতেই স্থান দিলেন।

আদ্যাশক্তি মহামায়ার অনুগ্রহ অসম্ভবকে সম্ভব করিল। গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল, সরকার-বাড়ী দুর্গোৎসব হইবে। হঠাৎ গ্রামবাসী সকলেই যেন পরমোৎসাহী হইয়া পড়িল। ঢাকী ঢাক বাজাইল। পুরোহিত চণ্ডী পাঠ করিলেন। পঞ্চপ্রদীপ ধূপের ধোঁয়ায় সকলের নয়ন আঁধিয়া গেল। পুষ্প, চন্দন, আম্রশাখা, বিল্বপত্র, কদলী, শশা, নারিকেল ইত্যাদি নানা উপচারে নব মণ্ডপ-গৃহ পরিপূর্ণ হইল। নাগরার বাদ্যে, শানাইর গানে, গোবিন্দপুর-গ্রামখানি কলমুখরিত হইল। শত শত নরনারীর ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া দেবী যোগমায়া কারুণ্য-নেত্র মেলিয়া চাহিলেন। গোবিন্দপুর-গ্রামে যেন কোনও এক ভাবী ভাগ্য সূচিত হইল।

গোবিন্দপুরে গোবিন্দসেবা

শম্ভুনাথ ও আরাধনের গুণে এবং বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া মুক্তারামবাবু তাঁহাদিগকে আর কোথায়ও যাইতে দিলেন না। গোবিন্দপুরেই নিজ-জমিদারীর মধ্যে জমা-জায়গীর করিয়া দিলেন। নিজ ব্যয়ে বাড়ীঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পরিবারের আশীর্ব্বাদ-লাভে মুক্তারামও জীবন্মুক্তের অবস্থা লাভ করিলেন। পরিণামে শান্তিময় ধামে আরাম পাইবার প্রকৃষ্ট পথও তাঁহার নির্ম্মিত হইয়া রহিল। মনীষিরাও বলিয়াছেন—শান্তির মন্দিরে প্রবেশ করিবার প্রধান তোরণই সজ্জন-সেবা।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা প্রতিষ্ঠিত হইল। গোবিন্দপুরেই শম্ভুনাথ অনুজ আরাধন-সহ গোবিন্দ-আরাধনায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। শম্ভুনাথের দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভৈরবচন্দ্র, কনিষ্ঠ দীননাথ। দুইটি কন্যা হরসুন্দরী ও কাশীশ্বরী। ইহা ছাড়া মাঝে শম্ভুনাথের আরও দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল, তাঁহারা শৈশবেই পরলোক গমন করিয়াছে। আরাধন বিপত্নীক ও অপুত্রক। সংসারে আরাধনের কোনও বন্ধন নাই। গোবিন্দ-ভজনের প্রবল টানে তিনি মাঝে মাঝে সংসার হইতে নিরুদ্দেশ হন। শম্ভুনাথ অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল। ভাই নিরুদ্দিষ্ট হইলে অস্থিরতা বোধ করেন। তাই নানা উপায়ে ভাইকে সংসারের মধ্যে জড়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। এইরূপ স্নেহ-চালিত হইয়াই শম্ভুনাথ কনিষ্ঠ পুত্র দীননাথকে আরাধনের

হস্তে সমর্পণ করেন। শাস্ত্রবিহিত ভাবে দত্তক না হইলেও, দীননাথ আরাধনের নিকটই একাধারে পিতৃস্নেহ ও কৃষ্ণনিষ্ঠা লাভ করেন। দীননাথের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আরাধনই গ্রহণ করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ-জেলায় ডাহাপাড়া-গ্রামে আরাধনের যে চতুষ্পাঠী ছিল দীননাথ সেই স্থানেই অধ্যয়ন করেন। তিনি একজন পরম বুদ্ধিমান্ ও অসাধারণ মেধাবী ছাত্র। অতি অল্পকাল মধ্যেই নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনি 'ন্যায়রত্ন'-উপাধিতে ভূষিত হইলেন। দীননাথের রূপে, গুণে, চরিত্রে ও বিদ্যাবত্তায় আরাধনও আকৃষ্ট। তিনি তাঁহাকে পরম স্নেহে 'দীনবন্ধু' বলিয়া ডাকেন। আপন-জীবনের যত-কিছু শ্রেষ্ঠ অনুভব ও সাধন-সম্পদ্ সকলই দীনবন্ধুকে উপঢৌকন দিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

শম্ভুনাথ জ্যেষ্ঠপুত্র ভৈরবচন্দ্রকে যথাযোগ্য বয়সে বহু ঘটা করিয়া বিবাহসূত্রে বন্ধন করেন। বধূ রাসমণি দেবী যথাকালে ঘর-আলো-করা দুইটি কন্যা ও দুইটি পুত্ররত্ন প্রসব করেন। কন্যা-দুইটির নাম দিগম্বরী ও গোলোকমণি। জ্যেষ্ঠপুত্র গোপালচন্দ্র, কনিষ্ঠ তারিণীচরণ। যথাযোগ্য বয়সে দীননাথকেও বিবাহ দিবার জন্য শম্ভুনাথ অভিলাষ করিতে লাগিলেন। দীননাথ রূপে গুণে অতুলনীয়। তাঁহার যোগ্য কন্যা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। প্রজাপতিই যথানির্দ্দিষ্ট নির্ব্বন্ধের ঘটক হইলেন।

দীননাথের শুভ পরিণয়

ফরিদপুর-জেলায় গোবিন্দপুর হইতে কয়েক ক্রোশ ব্যবধানে কাফুরা-গ্রামখানি অবস্থিত। তথায় শ্রীযুত শীতল চন্দ্র চৌধুরী ও তৎসহধর্ম্মিণী দেবী রাজলক্ষ্মীর বাস। তাঁহাদের ঘর-উজ্জ্বলকরা একটি অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা। কন্যাটিকে যে দেখে সে-ই অপলকে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকে। তাঁহার ঢলঢল চাহনী, লাবণ্যময়ী অঙ্গচ্ছটা ও স্নেহমধুর ব্যবহার—এই সকলই অপার্থিব বস্তু বলিয়া সকলের মনে হয়। পিতা শীতলচন্দ্র কন্যা বামাসুন্দরীর যোগ্য বর অনুসন্ধান করিয়া হতাশ হইয়া আছেন। দৈবযোগে তিনি দীননাথের রূপগুণের কথা শুনিয়া শম্ভুনাথ-গৃহে উপস্থিত। সব-কিছু দেখিয়া, সব-কিছু শুনিয়া তিনি এবং অন্য সকলে নিশ্চিন্তভাবেই বুঝিতে পারেন যে, বিধাতা-পুরুষেরই সুপরিকল্পনায় এই বর ও কন্যার সৃষ্টি!

শুভক্ষণে দীননাথের সহিত বামাসুন্দরীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়া গেল। নিত্য-যুক্তদের যোগ হইল। রোহিণীর সহিত চন্দ্রের মিলন ঘটিল। মিলনের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরের নরনারী সহস্র মুখে ধন্য ধন্য করিল। গুরু, পুরোহিত ও পূজ্যবর্গ প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কুল-বধূগণের উলুরবে গ্রামাঞ্চল মুখরিত হইল। উদয়াচলের সঙ্গে পূর্ব্বদিগ্বধূর মিলন-মঙ্গল নূতন রবির উদয় সূচনা করিল। যে-সবিতৃ-ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া আমাদের গ্রন্থের মহানায়কের

স্বতঃ-প্রকাশ আমরাও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রণত হই। "অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম।" নবদম্পতি দীননাথ-বামাদেবীর জয় হউক!

শোকের অবদান

পরিণত বয়সে আরাধন ও শম্ভুনাথ উভয়েই পরাৎপর-ধামে গমন করেন। পরিবারের দায়িত্ব ভৈরবচন্দ্রই শিরে ধারণ করিলেন। কিন্তু ডাহাপাড়ার চতুষ্পাঠীর গুরুভার শিরে লইবেন কে? সে যোগ্যতা একমাত্র দীননাথেরই। স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ তিনি নিজেকে সে কার্য্যে অক্ষম মনে করিতে লাগিলেন। পিতৃদেব ও গুরু খুল্লতাতের জীবনাবসান দীননাথের অন্তরে এক মহা-রেখাপাত করিয়াছে। তিনি অগ্রজ ভৈরবচন্দ্রকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করেন এবং গভীর নিষ্ঠার সহিত তাঁহার আদেশ পালন করেন। নন্দ উপানন্দের মত দুই ভাই যেন হরিহর-আত্মা।

গৃহে রাসমণি দেবী ও বামাসুন্দরী দেবী যাতৃদ্বয়ের সম্প্রীতিও নিরুপম। রাসমণির রূপগুণ, বামাদেবীর যশো-লাবণ্য, রাসমণির ঔদার্য্য, বামাদেবীর সেবামাধুর্য্য, রাসমণির গাম্ভীর্য্য, বামাদেবীর নমনীয়তার মিলনে ভৈরবগৃহে মণি-কাঞ্চনের সম্মিলিত সুষমা। গৃহ-দেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের করুণার স্নিগ্ধ ছায়ায় ভৈরব-দীননাথ-ভবন গোবিন্দপুরে একটি-অপার্থিব শান্তির নীড়।

আনন্দময় সেই গৃহখানিকে উৎফুল্লতর করিয়া বামাদেবীর একটি পুত্ররত্ন ভূমিষ্ঠ হইল। নামকরণ হইল গুরুচরণ। গুরুচরণ পরিবারের সকলের নয়নমণি। কিন্তু কে জানে,— লীলাময়ের কোন্ দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ মাত্র আট মাস কাল শিশু সকলের কোলে কোলে নাচিল; তারপর অজানা রাজ্যে বিদায় লইল। সংসারে এই প্রথম শোকের ছায়া পড়িল।

স্নেহমণি পুত্রের বিয়োগ-বেদনা পিতামাতাকে আঘাত করিল। স্নেহের দুলালের বিচ্ছেদ চিরদিনই বেদনাদায়ক কিন্তু চেতনার উদ্বোধনে তাহার দান উপেক্ষণীয় নহে। সপ্তপুত্র-শোকে সন্তাপিত-হৃদয় দেবকীমাতার অষ্টম পুত্র লাভ গভীর অর্থব্যঞ্জক বটে।

পুত্র সংসারে একটি সুখের আধার। পতি-পত্নীর প্রণয় পুত্রেই মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তাই পুত্র সংসারের কেন্দ্রস্বরূপ; কিন্তু পুত্র হইতে বেদনাও কম নহে। পুত্র অবাধ্য, অশিষ্ট, রুগ্ন বা অজ্ঞ হইলে পিতামাতার দুঃখের সীমা থাকে না। সর্ব্বোপরি পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের অকাল-মৃত্যুর মত বেদনাবহ আর কিছুই নাই। অতএব পুত্র পাইয়াই বা ফল কি? যদি এমন পুত্র লাভ হয় যাহা হইতে কোনও দিন কোনও প্রকারের শোক হইতে পারে না, তবেই না পুত্রলাভ সার্থক! পুত্র-বিয়োগ-বেদনা দীননাথ-বামাদেবীর হৃদয়ের অন্তস্তলে এই ভাবনা জাগাইল। ভাবনার মূলে যে-চেতনা তাহা সেই সর্ব্বশোভন শাশ্বতধনকে পাইয়া সার্থক হইতে চাহিল।

শোকাতুর দম্পতির সান্ত্বনায় প্রথম আসিল একটি নিরুপমা দুহিতা। ভৈরবচন্দ্র সাদরে নাম রাখিলেন কৈলাসকামিনী। কৈলাসকামিনী হৃদয়ের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া বসিল, কিন্তু পুত্রলাভ-লালসা বাড়িল বই কমিল না। মানব-হৃদয়ের প্রেম মরণশীলকে কখনও চায় না। সুতরাং দীননাথ-বামাদেবী অমৃতময়ের ধ্যানে অন্তরের অপার্থিব বাৎসল্যরসের তর্পণ করিতে লাগিলেন। সে তর্পণ অমৃতলোকে স্পন্দন তুলিল।

ডাহাপাড়ায় নব পরিবার

অনুমান বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর সপ্তদশকে দীননাথ ন্যায়রত্ন পুনরায় মুর্শিদাবাদে পদার্পণ করেন। উদ্দেশ্য, খুল্লতাত আরাধনের ডাহাপাড়াস্থিত চতুষ্পাঠীর পুনর্গঠন। শ্রুত আছি, ছাত্রগণের প্রবল আকর্ষণেই পণ্ডিত মহাশয় আসিতে বাধ্য হন। আচার্য্য আরাধনের সুস্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়ায় দীননাথের ছাত্রজীবন মুর্শিদাবাদেই কাটিয়াছে। কিন্তু আজ যেন দীননাথ নূতন দেশে নূতন ভাবে আসিতেছেন। সেই স্নেহ-তরুটি আজ অন্তর্হিত। সে সুখময় পাঠ্যজীবনও আজ পরিসমাপ্ত। কর্ম্মময় জীবন-স্রোতে দীননাথ একা।

গোবিন্দপুর হইতে রওনা হইবার কালেই পতিপ্রাণা বামাদেবী পতিদেবতার অসহায় অবস্থা অনুভব করিতে পারিয়াছেন। পুত্রবিয়োগ উভয়ের ভালবাসা গাঢ়তর করিয়াছে। কন্যা কৈলাসকামিনী সমবেত স্নেহের অংশীদার হইয়া দাম্পত্য-প্রেমে

বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। তাই দীননাথের একাকী বাড়ী ছাড়া সম্ভব হইল না। কৈলাসকামিনীকে কোলে লইয়া পতিব্রতা ধীর পদবিক্ষেপে পতির অনুগমন করিলেন। সঙ্গে পরিচারিকা ঊর্ম্মিলা চলিল। পল্লীর গৃহবধূ পতির সহিত কর্ম্মস্থল মুর্শিদাবাদ-নগরে চলিয়াছেন। তাই ঊর্ম্মিলা রহিলেন পাশে ছায়াবরণের মত। পরম স্নেহশীলা বুদ্ধিমতী রাসমণি দেবীর ব্যবস্থামতই এই সব সমাধান হইল। বামাদেবীকে বিদায় দিয়া রাসমণি নয়ন-জল মুছিতে লাগিলেন।

ডাহাপাড়ায় নব পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইল। ডাহাপাড়ার ভট্টাচার্য্য-বাড়ীতে পুণ্যশ্লোক আরাধনের টোল ছিল। আরাধনের তিরোভাবে ভট্টাচার্য্য-বাড়ী, তথা ডাহাপাড়া-গ্রাম, অন্ধকার হইয়া আছে। আজ সূর্য্যাস্তে পূর্ণচন্দ্রের মত দীননাথ উদিত হইলেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন ভক্তপণ্ডিত আরাধনও এইভাবে নাটোর হইতে ডাহাপাড়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর তৎকালীন কর্ত্তৃস্থানীয়েরা পণ্ডিতের গুণে, বিদ্যায় ও চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। আজ শারদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও একদিকে পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ, অন্যদিকে আচার্য্য আরাধনের গুরু-গৌরব এবং অপর দিকে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিদ্যা ও চরিত্র-সৌরভ অনুভব করিয়া নব পরিবারকে নিজ-বাটীতেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

কেবল যে ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর লোকদের বা ডাহাপাড়াবাসীর আনন্দ হইল তাহা নহে, বঙ্গাধিকারী রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংবাদ পাইয়া সাগ্রহে লোক পাঠাইয়া

তাঁহাকে নিজ সভায় আনয়ন করিলেন এবং সভাপণ্ডিতের আসন অলঙ্কৃত করিতে সশ্রদ্ধ অনুরোধ করিলেন। গুণের আধার হইয়াও দৈন্য-বিনয়ের খনি দীননাথ পরমার্চ্চনীয় খুল্লতাতের আসনে নিজেকে অযোগ্য মনে করিতে লাগিলেন। শেষে, সকলের ঐকান্তিক অনুরোধে; নিজ যোগ্য আসন গ্রহণ করতঃ মুর্শিদাবাদবাসীকে যেন জীবন্ত ও উল্লাসময় করিলেন। ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ-গৃহে আরাধনের চতুষ্পাঠীর নব উদ্বোধন হইল। দূর-দূরান্তর হইতে বিদ্যার্থীরা আসিয়া ন্যায়রত্নের গৃহপ্রাঙ্গণ মুখর করিয়া তুলিল।

ছাত্রগণ সূর্য্যবংশীয় রাজা দিলীপের রূপের বর্ণনায় মহাকবি কালিদাসের ভাষা পড়িত—"আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ।" তাঁহারা তাহাদের অধ্যাপক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া পরস্পর বলিত—"আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং বিপ্রধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ", অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম যেন নিজ কর্ম্ম-সাধনের সর্ব্বতোভাবে উপযোগী একটি শরীর প্রকৃতিদেবীর কর্ম্মশালা হইতে আদেশ দিয়া তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুদীর্ঘ বপু, উন্নত নাসা, প্রশস্ত ললাট, সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি, বিশাল বক্ষোপরি পূত শুভ্র যজ্ঞোপবীত, কটিতে গরদের ধুতি, চরণে নাগরাই পদত্রাণ—দর্শনেই যেন সর্ব্ব-শুভোদয় হইত; মনে হইত, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম জীবন্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে।

"আকার-সদৃশঃ প্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ", যেমন আকৃতি তেমনই অনুভূতি, যেমন অনুভূতি তেমনই শাস্ত্রোপলব্ধি। সত্যসত্যই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব দুইই

সমতুল্য। লোকের সম্পদে-বিপদে আমোদে-উৎসবে পরম বন্ধুর ন্যায় যোগদান করিতেন। উচ্চ-নীচ-ভেদ-জ্ঞানের ঊর্দ্ধে থাকিয়া মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করতঃ আপন করিয়া লইতে জানিতেন। পরম স্নেহ-কারুণ্যময় ভাষায় তাঁহার মুখ হইতে যে সুচিন্তিত সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশাবলী নির্গত হইত, তাহার মধ্যে জীবন-সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজিতে সকলেই আসিত। তাঁহার শাস্ত্রীয় তর্কে বিচার-পটুতা, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় নিপুণ যৌক্তিকতা যেমনই প্রশংসনীয় তেমনই অখণ্ডনীয় ছিল। সকলেই নির্ব্বাক হইয়া যাইত। পল্লীবাসী সরল নরনারী কথায় কথায় বলিত—'ন্যায়রত্ন জাত নিতেও পারেন দিতেও পারেন।" বিদ্যাদান ও ধর্ম্মদানে সকলের কল্যাণ-বিধান ইহাই ছিল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবনের মহান্ ব্রত।

দীননাথ সমাজে ব্যবস্থাপক, সভায় পণ্ডিত, টোলে অধ্যাপক, গৃহে প্রেমময় স্বামী, মন্দিরে শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজারী। অবসরে কখনও স্নেহাস্পদ ছাত্রগণসহ কখনও প্রণয়াস্পদ সহধর্ম্মিণীসহ ভগবৎ-কথা-রসে নিমজ্জিত রসিক ভক্ত।

দেবী বামাসুন্দরী সৌন্দর্য্যের আধার-স্বরূপা ছিলেন। তাঁহার অঙ্গ-সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, এমন লোকের একান্ত অভাব আজও হয় নাই। শ্রীযুত বকুলাল বিশ্বাস বলেন ন্যায়রত্ন-ঘরণী 'ডাকনামের' সুন্দরী ছিলেন। ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য ভট্টবাটী-গ্রামের নবীন মণ্ডল সারল্য-মাখা গ্রাম্য ঢংয়ে বলেন—'ভগবতী বলেন আমাকে ভাখ্, মা ঠাকুরণ বলেন

আমাকে ত্যাখ্, কা'কে দেখ্‌বো, তুই-ই সমান।' বস্তুতঃ, বামাদেবীর সৌন্দর্য্য কেবল বহিরঙ্গের নহে; অন্তরঙ্গ মনের রূপ-সুষমাই তাঁহার বাহিরে ফুটিয়া প্রকট হইয়াছে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে এমন সমতাপন্ন পতি-পত্নীর মিলন এক আছে দেব-লোকে আর আছে কবির কল্পনা-লোকে। বাস্তবে কেহ কখনও দেখে নাই একথা সকলেই বলে। এমন আচার্য্য-আচার্য্যাণীর স্নেহাশীষ-ভাজন হইয়া বিদ্যার্থিগণও আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করে।

শারদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিমাতা ক্ষমাময়ীদেবী ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর সকলের 'ন'মা'। গ্রামবাসীরও 'ন'মা'। পণ্ডিত ন্যায়রত্ন, বামাদেবী, ছাত্রবৃন্দ সকলেরই তিনি 'ন'মা'। নব পরিবারে শ্বাশুড়ীর স্থান তাঁহারই। ন'মার আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান নাই। মানুষকে ভালবাসা ছাড়া ন'মা আর কিছুই জানেন না। শিবপূজায় বসিয়া ন'মা জনে জনের কল্যাণে কতশত বিল্বপত্র আশুতোষের মস্তকে অর্পণ করেন। ন'মা কল্যাণ-বুদ্ধির মূর্ত্তি।

হীরার পুতুলি কৈলাসকামিনী সকলের কোলে কোলে বেড়ায়। তাহার নামে ও রূপে সাদৃশ্য আছে। কি জানি-বা মেনকাত্মহিতা উমাই ছলনা করিতে আসিয়াছেন। সকলের চেয়ে অধিক যত্নে উর্ম্মিলাই কৈলাসকামিনীকে কোলে বুকে করিয়া লালন পালন করে। সেও উর্ম্মিলাকে ডাকে 'উর্মি', আর সোনার হারের মত তার কণ্ঠে দোলে। উর্ম্মিলা কর্ত্তা-গিন্নীর সেবা-যত্ন করে। টোলের সংবাদ পাকশালে, পাকশালের

সংবাদ টোলে উর্ম্মিলার মাধ্যমেই আদান-প্রদান হয়। ঠাকুর-মন্দিরের পূজা-অর্চ্চনার জোগাড়ও করে উর্ম্মিলা। বড় অনুরাগ ও ভক্তিমাখা তাহার কাজকর্ম্মগুলি। যে-বিল্ববৃক্ষমূলে প্রাচীন পঞ্চমুণ্ডীর আসন, যাহার পাশে বসিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় সন্ধ্যাবন্দনা করেন, 'উর্মি' সেই স্থানটিকে নিপুণভাবে পরিষ্কার করিয়া লেপন করে, তেমনই নিখুঁত নির্ম্মলভাবে, যেমন নিখুঁত নির্দ্দোষ তার ছোট হৃদয়খানি।

পট-ভূমিকা

বিদেশী শাসনের প্রতি ভারতের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের প্রথম প্রকাশ হইয়া গিয়াছে প্রবল সিপাহী-বিদ্রোহের মধ্য দিয়া। তারপর উপস্থিত হইয়াছে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মহা-সনদ-রূপী ঐতিহাসিক ঘোষণা। কোম্পানীর নিকট হইতে রাজ্যভার লইয়া মহারাণী ভারত-সাম্রাজ্ঞী হইয়াছেন। ক্যানিং, এলগিন্, লরেন্স্, মেয়ো প্রমুখ রাজপ্রতিনিধিগণ একজনের পর আর একজন আসিতেছেন। নানাবিধ শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতেছে। দণ্ডবিধি-আইন, ফৌজদারী-আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে। কলিকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হইতেছে। স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইতেছে। মহারাণীর পুত্রেরা ভারতে বেড়াইতে আসিতেছেন। মহাধূমধামে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা হইতেছে। সকলের মুখে ইংরাজের জয়! সকল ছাত্রের পাঠ্যপুস্তকে 'রুল্ ব্রিটেনিয়া!' পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় কৃষ্টিকে দ্রুতগতি গ্রাস করিতেছে।

মহারাষ্ট্রে বিপ্লবের অগ্নিবীণা বাজিতেছে। তাহার মূর্চ্ছনা আসিয়া বাঙ্গালীর কানে ঠেকিতেছে।

গ্রাম ভাঙ্গিয়া সহর বসিতেছে। রেলগাড়ী চলিতেছে। কলকারখানা নীলকুঠি চা-বাগান সৃষ্টি হইতেছে। বয়নাদি কুটির-শিল্প দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। চাকুরীর মোহ বংশ-মর্য্যাদা ভিটামাটি সব ভুলাইয়া বাঁধন ছিঁড়িতেছে। পুরাণো জাতিভেদের প্রাচীর শিথিল হইতেছে, নূতন জাতি 'বাবু' আর 'কুলি'র জন্ম হইতেছে। খৃষ্টান মিশনারী, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, পাশ্চাত্য শিক্ষা, সবাই মিলিয়া ভাঙ্গাগড়ার হট্টগোল বাধাইয়াছে।

রাজর্ষি রামমোহন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে সংগঠনের ধ্বজা উড়াইয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিরা নূতন চিন্তার আসর জমাইতেছেন। ব্রহ্মর্ষি দয়ানন্দের সাধনায় বৈদিক তত্ত্বের বলিষ্ঠ ভূমিকায় আর্য্যঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। জটিয়া বাবা বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের শিখরে ভক্তি-গঙ্গোত্তরী খুঁজিতেছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব নববিধানে নামব্রহ্মের আস্বাদন লোলুপ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ-মার্গে শ্রীত্রৈলঙ্গ, ভাস্কর যোগারূঢ়। পরমহংসদেবের গভীর অনুভূতিমূলক মধুর উপদেশে মানুষ জটিলতার মধ্যে সরল পথের সন্ধান পাইতেছে। শাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠার তর্ক-চূড়ামণি, জ্ঞানকর্ম্ম-সমন্বয়ে বিবেকানন্দ স্বামী, ভক্তি-ভাগীরথী-প্রবাহে পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ নেপথ্যে প্রস্তুত হইয়াছেন। নবযুগের নবীন পটভূমিকায় অগণিত সাধু মহাপুরুষ স্বস্তি-বাচন উচ্চারণ করিতেছেন। নববঙ্গে নবযুগের

জন্মমঙ্গল গীতি উঠিয়াছে। ইহারই কেন্দ্র-বিন্দুতে ভাগবতীয় ধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ, অখিল প্রেম-রসঘন দেবতার আগমনী-শঙ্খ নিনাদিত হইল।

যেন রাজধানীর কারাকক্ষে

সুদীর্ঘ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ ক্ষীণ আলোকরশ্মি বিদেশী কূটনীতি ও ভেদনীতির ঘূর্ণীবাত্যায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে যে-স্থানে, সে-স্থান ভারতের প্রত্যেক নর-নারীর স্মরণীয় তীর্থক্ষেত্র। বাংলার সেই শেষ স্বাধীন রাজধানী মুর্শিদাবাদ। সেদিনও যে-স্থানের কথা লর্ড ক্লাইভ চিঠিতে লিখিয়াছেন—ধনে, জনে, রত্ন ঐতিহ্যে বা ঐশ্বর্য্যে মুর্শিদাবাদ সর্ব্বাংশে ইংলণ্ড অপেক্ষা বরণীয় *।' সেই মুর্শিদাবাদ বাংলার তথা ভারতের, পুণ্যভূমি। অদূরে অই যে পলাশীর শ্মশান-ক্ষেত্র দাঁড়াইয়া নিপীড়িত জাতির প্রাণে নব উন্মাদনার উপকরণ যোগাইতেছে। পূত পীঠভূমি কিরীটেশ্বরীর পটে সুদূর অতীতের শিবহীন যজ্ঞে পতিব্রতা দক্ষ-নন্দিনীর প্রাণত্যাগের পুণ্যকাহিনী আজও অঙ্কিত রহিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের ভাগ্য-বিধায়িনী মন্দাকিনী গঙ্গা আজও মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়া ভস্মীভূত সন্তানগণকে সঞ্জীবিত করতঃ ছুটিয়া চলিতেছে।

* "Murshidabad is more populous and as opulent, if not more, as London".

—New India, Sir Henry Cotton.

সুরধুনীর পূর্ব্বতীরে নবাবের প্রাসাদ, পশ্চিমতীরে রাজধানীর বিশিষ্ট নরনারীর বাসভূমি ব্রাহ্মণচক্‌পাড়া।

বাংলার রাজধানী যখন জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) হইতে স্থানান্তরিত হইয়া মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হয়, তখন রাজকীয় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঢাকার সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গ মুর্শিদাবাদে আসিয়া ব্রাহ্মণচকপাড়ায় বাস করেন। তখন হইতে এই স্থানের নাম হয়—ঢাকাপল্লী বা ঢাকাপাড়া। কথ্য ভাষায় ঢাকাপাড়া ক্রমে 'ডাহাপাড়া'-নাম প্রাপ্ত হয়। রাজ্যের প্রধান নাগরিকগণ রাজধানীতে থাকেন। রাজধানীর শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ ডাহাপাড়াতে বসবাস করেন। যাঁহারা ভারতভূমিকে ভালবাসেন, ডাহাপাড়া তাহাদের ভুলিবার স্থান নহে।

এই প্রকার শত শত বিশিষ্ট নরনারীর বাসভূমি ডাহাপাড়া, ভোগপ্রিয় নবাবদের শত শত উদ্যান ও আমোদ-প্রমোদস্থলী ডাহাপাড়া, নানাবিধ প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্যের আকরস্থলী ডাহাপাড়া,—সে ডাহাপাড়ার প্রাচীন গৌরবের আজ আর কিছুই নাই। কংসের রাজত্বে মথুরানগরীর যে অবস্থা আজ শ্বেতাঙ্গ বণিকের রাজত্বে মুর্শিদাবাদ-ডাহাপাড়ারও সেই অবস্থা। ভ্রষ্টশ্রী মথুরায় থাকার মধ্যে ছিল একটি দম্পতি—কংসেরই পাষাণ চাপা দুর্ভেদ্য কারাকক্ষে। আজ ঐতিহ্য-হারা নষ্টগৌরব ভারতের বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদের কারাগারের প্রতীক-স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে লুপ্তৈশ্বর্য্য ডাহাপাড়া-গ্রাম। তাহাতেও আছে একটি আদর্শ দম্পতি। বসুদেব-দেবকীরই ন্যায় তাঁহারাও সেই বিজন পল্লীর নির্জ্জন কক্ষে ভাগবতীয় কথা আস্বাদনে তন্ময়।

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত ও গৌরগ্রন্থাবলী ইহাই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জীবাতু। পণ্ডিতপ্রবর যদুনাথ সার্ব্বভৌম আসেন, শিবতুল্য গঙ্গাধর কবিরাজ আসেন, তাঁহাদের সহিত কত শাস্ত্র আলোচনা হয়; কিন্তু সকল আলোচনাই ভাগবতীয় আলোচনায় পর্য্যবসিত হয়। গৃহকোণে অবসর সময়ে দিবারাত্রি নিয়মিতভাবে সহধর্ম্মিণীর সহিত ঐ সব গ্রন্থের কথাই আস্বাদন হয়।

আধান

"আবিবেশ অংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ"

—শ্রীশুক

"আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়॥"

—শ্রীকৃষ্ণদাস

পুত্র গুরুচরণের বিয়োগ-বেদনায় দুইটি হৃদয় কর্ষিত হইয়াছে। দুহিতা কৈলাসকামিনীর প্রেমধারা তাহাতে বর্ষিত হইয়াছে। তাহাতে বীজাধান হইবে ভাগবতীয় কথা। দীননাথ পরিবেশক, বামাসুন্দরী আস্বাদক। যখন ভাগবত-কথা আস্বাদিত হয়, তখন দাতা-ভোক্তা, পাঠক-শ্রোতা উভয়েই তন্ময় হইয়া যান। অদিতি-কশ্যপের কথা, পৃশ্নি-সুতপার কথা, ধরা-দ্রোণের কথা, কৌশল্যা-দশরথের কথা, বসুদেব-দেবকীর কথা, নন্দ-যশোদার

কথা, শচী-জগন্নাথের কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশ হয়। ভাবাবেশে তাঁহারা সেই সেই জায়াপতির সহিত একাত্মতা অনুভব করেন। ভাবে, ভঙ্গীতে, বিভাবে, অনুভাবে তাঁহাদের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়েন। 'ব্রহ্মানন্দ-সহোদর' কি যেন কি এক চিত্ত-চমৎকারী ভাবাঢ্যে উভয়ে উভয়ের নয়ন চাহিয়া অপ্রাকৃত মিলনানন্দ-পয়োধিতে ডুব দিয়া রহেন।

তাঁহাদের অন্তরের সাধ তাঁহাদের অন্তরই জানে। আর জানেন সেই সর্ব্ব-অন্তরচারী বাৎসল্য-রস-লোলুপ 'ঘোষপল্লীর চৌর-চূড়ামণি।' "মদ্ভক্তাঃ! যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"—এই প্রতিজ্ঞা তাঁহার শ্রীনারদের নিকট,—আমার ভক্ত যেখানে গায় সেখানেই আমি থাকি। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই প্রতিজ্ঞা তাঁর শ্রীঅর্জ্জুনের অগ্রে,—"হে অর্জ্জুন, যে যেমন ভাবে চায়, তেমন ভাবেই তাহাকে ভজনা করি।" দুই অঙ্গীকারের কথা যুগপৎ স্মরণ করতঃ অবিতথবাক্ আজ নিজবাক্য পালন করিলেন। উদয়ক্ষেত্রে অরুণের রেখা সম্পাত হইল।

সহজ-সুন্দরী বামাদেবীর রূপের তরঙ্গ যেন উছলিয়া উঠিল। রূপের দিব্যচ্ছটা দেখিয়া পাড়াপড়শীরা কত কথা বলাবলি করিতে লাগিল। কেহ বলিল—স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে; কেহ বলিল,—ভক্তদেহে ভগবজ্জ্যোতিঃ ফুটিয়াছে; কেহ বলিল—চাঁদপানা ছেলে হইবে তাই অত রূপের ছটা! কেহই জানিল না যে পূর্ণচন্দ্রের উদয়াভাসে ইহা বাৎসল্য-রস-সিন্ধুর সহজ

উচ্ছলন মাত্র! রসের সঙ্গে অচ্ছেত্তভাবে জড়িত যে-রূপ তাহা অঙ্গে স্থান সংকুলন করিতে না পারিয়াই দশদিকে বিচ্ছুরিত!

বামাদেবীর সখীস্থানীয়া ভাগ্যবতী কুলবতীগণ সে রূপের স্নিগ্ধতায় লুব্ধ নয়নের সার্থকতা অনুভব করিল। ন'মা দেবী ক্ষমাময়ীর প্রাণে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। দিনে দুইবার করিয়া বামাকে দেখা ও আদর করা চাই; নতুবা নয়ন-মন দুই-ই অতৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ে।

শুভ আবির্ভাব

"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"

—শ্রীগীতা

শুভ বৈশাখ মাস। প্রভাতী টহল কীর্ত্তনের রোলে রাঢ়-দেশ মুখরিত। দোয়েল, কোয়েল, বাবুই, শ্যামার সুমধুর কাকলী-গীতিতে আকাশ-বাতাস ঝঙ্কারিত। তাহাদের অত্যুল্লাস নববর্ষ ছাপাইয়া যেন নবযুগের আগমনী ঘোষণা করিতেছে। পবন বাহক কি যেন কি শুভ বার্ত্তা লইয়া ভাগীরথীর বুক চুম্বন করিতেছে। পাদোদ্ভবা জহ্নুদুহিতাও আনন্দ-তরঙ্গের আঘাতে ডাহাপাড়ার তটভূমি নিনাদিত করতঃ কি যেন এক অপূর্ব্ব সংবাদ লইয়া বিশাল সমুদ্র-উদ্দেশে নাচিয়া চলিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে বৈশাখী শুক্লানবমী সমাগত। বঙ্গাধিকারীর বাড়ীতে এক বিরাট উৎসব। সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত আছেন। সেবিকা উর্ম্মিলা

কৈলাসকামিনীকে লইয়া বাড়ীতে রহিয়াছে। তাহাকে কোলে লইয়া আঙ্গিনায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুম পাড়াইতেছে। কিন্তু সে কি ঘুমাইবার মেয়ে! আজ তার কত কাজ!

বঙ্গাধিকারীর বাড়ী বিপুল আনন্দ-উৎসব হইতেছে। শঙ্খ-বাদ্য, উলুধ্বনি গ্রাম ছড়াইয়া প্রান্তর নগর অম্বর ছাইয়া ফেলিল। বালক-বালিকার উল্লাসপূর্ণ কোলাহলে রাজবাটী মুখরিত। আমোদে-আহ্লাদে, রঙ্গরসে, ভোজনে, পরিবেশনে সকলেই পরিতৃপ্ত। চতুর্দ্দিকে দীয়তাং ভুজ্যতাং রব। মহোৎসবের মহোল্লাসে বামাদেবীর হৃদয়ে কেবল পুত্র-বাৎসল্য-তৃষ্ণাই উদ্দীপিত। বন্ধু-স্থানীয়া সকলের সঙ্গে সকল কাজে সকল রঙ্গরসে যোগদান করিয়াও, বামাদেবীর অন্তরের অন্তর চাহিতেছে আপন-গৃহে কোন এক অজানা মহোৎসবের আনন্দ। স্মরণাভাসে অঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠে! ভাবনায় কাহাকে যেন বুকে চাপিয়া ধরিয়া পুলক-কদম্বে দেহ ভরিয়া যায়!

ক্রমে নামিল সন্ধ্যা। কাল-বৈশাখীর ঝড়ে আকাশের কালো মেঘ উড়িয়া গেল। সামান্য বর্ষণে ধরণী শীতল হইল। নবমীর কিশোর-চন্দ্র সহাস্য বদনে উদয় হইয়া সর্ব্বদিক প্রসন্ন করিল। মহাপুরস্কার লাভের পূর্ব্বক্ষণে পুলকিতা ধরাদেবী শোভন সাজে সাজিয়া দাঁড়াইল।

কর্ম্মবহুল উৎসব-দিবসের নানাবিধ পরিশ্রমের পর ক্লান্ত নরনারী সব শ্রান্ত দেহে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রান্তি-সুখ ভোগ করিতেছে। রজনী নিস্তব্ধ। দীননাথ বামাদেবী একটি

কক্ষে নিদ্রাবিষ্ট। নিদ্রায় উভয়ে বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ-সমাধি ছাড়াইয়া প্রেমঘন পঞ্চম অবস্থায় অবস্থিত। বামাদেবী স্বপ্ন দেখিতেছেন—

প্রাণপতির কণ্ঠলগ্ন হইয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন। স্নান করিয়া দুইজনে পূর্ব্বাস্যে বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন। আকাশে নবমীর চাঁদ নিঃশেষে সুধা ঢালিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। অশোকবৃক্ষের কুঁড়ির অগ্রে পুষ্প বিকশিত হইয়াছে। অত্যাচারের মর্ম্মবেদনায় গোমাতা হাম্বা হাম্বা রবে অশ্রুমোচন করিতেছে। গাভীর অশ্রুসিক্ত ধরণীর বক্ষ ধৌত করতঃ গঙ্গানীর তরঙ্গ তুলিয়াছে। শুভ্র ফেনিল তরঙ্গ রাশি দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিয়াছে। তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া একটি প্রফুল্ল শতদল ধ্যানস্থ তাঁহাদের সম্মুখে আসিল। তাহার মধ্যে নবনীত-কোমল স্বর্ণ-বর্ণ এক শিশু উত্তান ভাবে শায়িত। ন্যায়রত্ন শিশুটিকে দুই হাতে তুলিয়া বামাদেবীর অঙ্কে দিলেন। দেবী অপার্থিব ধন পাইয়া বুকে সাপটিয়া ধরিলেন। সে কোমল স্পর্শে সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল—নিদ্রাও টুটিয়া গেল।

দীননাথের নিদ্রাও ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ব্রাহ্মমূহূর্ত্ত প্রায়-উপস্থিত। বামাদেবী পতির কণ্ঠ ধরিয়া স্বপ্ন-কথা সমস্তই তাঁহাকে বলিলেন। শুনিতে শুনিতে দীননাথ আবিষ্ট হইলেন। পতিপ্রাণা সতীকে লইয়া আবিষ্ট দীননাথ সকলের অলক্ষ্যে গৃহে চলিলেন। যন্ত্র-চালিতের মত দুইজনে গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। স্বপ্নের আবেশে বামাদেবী হাত দুইখানি শিশুকে জড়াইয়া ধরার মত বুকে লাগানো অবস্থাতেই আছে। গৃহে

আসিয়া দুইজনেই ভাবেন—ইহা কি বাস্তব না স্বপ্ন! বামাদেবী বুকের হাত তুলিয়া দেখেন—কিছুই নাই! স্বপ্নই বটে।

জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত তুরীয় ভূমিকার ঐ অপরোক্ষ অনুভূতির গাঢ় তন্ময়তায় হঠাৎ বামাদেবীর সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। দেবী প্রাপঞ্চিক সংজ্ঞা হারাইয়া আত্মস্থা হইলেন।

দীননাথের অবস্থাও একই প্রকার। উভয়েই স্খলিত চরণে গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্রই দেখিলেন ঘরের ভিতর অপূর্ব্ব সদ্যোজাত শিশু বিদ্যমান। জ্যোতির্ম্ময় গৃহ, আলোকে উদ্ভাসিত। উভয়ে স্তম্ভিত। ভাব-বিহ্বল-অবস্থায় নিজ-আত্মজ-বোধে দেবী পরমানন্দে সেই পরমশিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। গর্ভাভাস-লক্ষণ তিরোহিত হইয়া গেল। শিশু সুন্দরের অপার্থিব স্পর্শে বামাদেবীর হৃদয়ে শুদ্ধ বাৎসল্যের সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। স্তন্য হইতে ক্ষীরধারা ক্ষরণ হইতে লাগিল। এই মাতৃত্ব ও পুত্রত্ব সম্বন্ধ নিত্যকালের। এই জননী কুত্রাপি গর্ভধারণ করেন নাই। এই পুত্রও কুত্রাপি গর্ভজাত নহেন। তথাপি অনন্তকাল ধরিয়া শুধু অভিমান—এই আমার আত্মজ, এই আমার গর্ভধারিণী মা। কথা অদ্ভুত বটে! কিন্তু অদ্ভুত হইলেও ইহাই পরম সত্য। ঐ অভিমানের পক্ষে বাৎসল্য-স্নেহই একমাত্র হেতু। বাৎসল্য-রসই প্রকৃত গর্ভ। সেখানেই সেই পুরাণ-পুরুষের নিত্যস্থিতি। আর সকলই আভাস মাত্র।

দীননাথ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নির্নিমেষ নয়নে

চাহিয়া রহিলেন। গ্রামপথে অদূরে প্রভাতী কীর্ত্তনের তান উঠিয়াছে। দীননাথ সুপ্তোত্থিতের মত শুনিতেছেন—

"বদন চন্দ অধর রঙ্গ, নয়নে গলত প্রেম তরঙ্গ,
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি মুখচন্দ্র উজিয়ারী"—

দূর বীণাধ্বনির মত গানের সুর আকাশে বিলীন হইয়া গেল। পাঞ্চজন্য ঘোষণা করিল—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

আনন্দোৎসব

"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ"

—শ্রীশুক

নূতন দিন দেখা দিল। দিগ্‌বধূর ভালে আলোর টীপ পরাইয়া দিয়া প্রভাত-রবি বৃক্ষলতার অন্তরাল হইতে ন্যায়রত্নের আঙ্গিনায় রঙ্গীন কিরণমালা ঢালিয়া দিল। আজ গৌরাব্দ তিন শত পঁচাশি। তিন শত পঞ্চাধিক অশীতি বৎসর পূর্ব্বে নদীয়ার গঙ্গাকুলে গগনের পূর্ণ শশধর গ্রহণ-ছলে আপনা ঢাকা দিয়া হরিনাম-ধ্বনির মধ্যে সেই বদনবিধু দর্শন করিয়াছিল। আজ প্রভাতী কীর্ত্তন-মুখর ডাহাপাড়া-গ্রামে নবোদিত রক্ত-রবি সেই ফাল্‌গুনী চন্দ্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া জগতে নবযুগের শুভারম্ভ ঘোষণা করিতে লাগিল। আজ অসম্ভবের সম্ভব। অজ যিনি

তাঁর জন্ম। ষোলই বৈশাখ শুক্রবার। জনকদুহিতা দেবী সীতার জন্মে বিশ্ববিশ্রুতা নবমী তিথিতে। বাংলা বারশত আটাত্তর সন। শকাব্দ সতর শত তিরানব্বই। খৃষ্টীয় আঠারশত একাত্তর অব্দ, উনত্রিশে এপ্রিল ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে—সূর্য্যোদয়ের একঘণ্টা পূর্ব্বে। "জন্ম মাহেন্দ্রক্ষণ।"

দীননাথের দীন কুটিরে ঘোষপল্লীর নন্দোৎসব। সে কপট নরশিশু ওঙা ওঙা ক্রন্দন ছলে ওঁকার নিনাদ করিতেছে। ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীর মেয়েরা ছুটিয়া আসিতেছে। পল্লীর কুল-বধূরা মিলিয়া কলকণ্ঠে উলুধ্বনি দিতেছে। ন'মা বামাদেবীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। আর-আর সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া কেহ গায়ে হাত বুলাইতেছে, কেহ সেঁক দিতেছে, কেহ-বা যোগ্য বসনাদির বিধান করিতেছে। ঘর-আলো-করা শিশুর রূপের ছটায় সকলে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া আছে।

পাড়াপড়শী নারী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ সকলের আগমনে ন্যায়রত্নের বাড়ী কল-কোলাহলময় হইতেছে। কেহ বলিতেছে—'মা-ঠাকুরাণীর যে ছেলে হইবে তাহা তো জানিতাম না।' কেহ বলিতেছে—'কেন জানিব না—বউ-ঠাকুরাণীর অত রূপের ছটা দেখিয়াই আমরা বুঝিয়াছি, গর্ভে সাগর-সেঁচা মাণিক আছে।' জানা-না-জানার অন্তরালে যাঁহার সত্ত্বা তাঁহাকে লইয়া অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ সকলেই মন্তব্য করিতেছে। উর্ম্মিলার কোলে কৈলাস-কামিনী জাগিয়া ঘুমাইতেছে। উঠিয়া দুই হাতে চক্ষু মুছিয়া সে আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ছুটিয়া আসিতেছে। ভ্রাতৃমুখ-দর্শন

করিয়া সে আহ্লাদে আটখানা হইতেছে। ছাত্রেরা বিপুল আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরিতেছে না। ইচ্ছা জাগিতেছে প্রাণ খুলিয়া সকলের কাছে বলেন। কিন্তু সে আনন্দ এত নিবিড় যে কোনও ভাষায় তাহা রূপায়িত হইতেছে না। আবার ইচ্ছা হইতেছে ভাণ্ডার খুলিয়া ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও দীন ভিখারীদিগকে অকাতরে দান করেন। কিন্তু ভাণ্ডারই-বা কোথায়, দেওয়ার মত দ্রব্যসামগ্রী বস্তুসম্ভারই বা কি আছে! বঙ্গাধিকারীর বাড়ীতে সংবাদ পৌঁছিল ন্যায়রত্নের পুত্র হইয়াছে। বঙ্গাধিকারীর আদেশে বাদ্যকারগণ ন্যায়রত্নের বাড়ী আসিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। নবজাত শিশুর রূপ দেখিয়া তাহারা আনন্দে জয় গাহিতেছে। বঙ্গাধিকারী ন্যায়রত্নের পুত্রের কল্যাণে নিজভাণ্ডারের দ্রব্যাদি ন্যায়রত্নের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া অকাতরে বিতরণ করিতে আদেশ দিলেন। ন্যায়রত্নের বাড়ীতে দানভাণ্ডার খুলিয়া গেল। প্রত্যাশিত অপ্রত্যাশিত দান গ্রহণকরতঃ সকলে ন্যায়রত্ন-নন্দনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ডাহাপাড়ার রত্নস্বরূপ। সকলেরই তিনি গভীর শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার আনন্দে আনন্দিত না হয় এমন লোক দেশে নাই। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আজ সকলেই তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে ছুটিয়া আসিতেছে। দূর-দূরান্তরের পরিচিত অপরিচিত কত ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতীরা আসিয়া সে অপার্থিব রূপ-সুধায় নয়নের ক্ষুধা মিটাইতেছে। অমরলোকের দেবদেবীরাও

যেন সেই আনন্দ লুটিবার লোভে মানব-মানবীর বেশে মর্ত্ত্যে আসিয়া জনস্রোতের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে! নব শিশুর ভাবভঙ্গী দেখিয়া কেহ বলিতেছে 'ব্রজত্নলাল' কেহ বলিতেছে 'গৌরগোপাল।' কি লাবণ্যময় রূপ! চক্ষু জুড়ায়!

হুধে-আল্‌তা বর্ণ, হস্ত-পদতল-অধরোষ্ঠ টুক্‌টুকে রাঙা—যেন একটি গোলাপের তোড়া! কাজল-কালো জোড়া ভুরুর তলে হুইটি পটল-চেরা পদ্ম-আঁখি। অঙ্গুলিগুলি কুন্দের কলি, চাঁদের জ্যোছনা ছড়ায়। সৌন্দর্য্যের সমুদ্র-সেঁচা এই অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের মাণিক। এমন রূপ কস্মিন্ কালে কেহ দেখে নাই। যেখানে যাহার নয়ন যাইতেছে, সেইখানেই ফাঁদে পড়িয়া রহিতেছে, আর ফিরানো সম্ভব হইতেছে না। সবার মুখে ঐ এক কথা—'মরি কি রূপ!'

দীননাথের ক্ষুদ্র আলয়খানি মূর্ত্তিমন্ত দেবালয় হইয়া উঠিয়াছে। জগতের সকল আনন্দ, সকল কল্যাণ, সকল মঙ্গল যেন প্রাণবন্ত হইয়া আজ ডাহাপাড়ায় উদয় হইয়াছে। ভাগবত-বক্তা শ্রীগ্রন্থ-আস্বাদন করিতেছেন—

"নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরি॥"

বৈষ্ণব সাধক গান গাহিতেছেন—

জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন-বন্দন,
কলিযুগ-কাল-ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে।

শিশুসুন্দর

"ডাহাপাড়া-গগন-দ্বিজরাজ বন্ধু"

—বন্ধুস্মরণ-মঙ্গল

কাঁচা সোনার পুত্তলী শিশুসুন্দর শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতেছে। পূর্ণচন্দ্রের মত সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট হইয়া আনন্দ-রসের ঘন নির্য্যাস ডাহাপাড়ার গগনতল উজ্জ্বল করিয়া বিরাজিত। দীঘল দীঘল কচি কচি হাত পা ছুঁড়িয়া কত না খেলার উল্লাস! হাসির ছটায় আঁধার ঘর আলো করিয়া কত না দোলনায় ঝুলন! কান্নার রোলে তোলপাড় করিয়া কত না কোলে আরোহণ। 'উমি হো' 'উমি হো' বলিয়া কত না আধ-আধ ডাক! উর্ম্মিলা হাততালি দিয়া হরিবোল বলে, শিশুর কান্না থামে। কৈলাসকামিনী 'ষাট্ ষাট্' বলিয়া তুলসীতলার মাটি গায়ে মাখে, শিশু মৃদু মৃদু হাসে।

শিশু হাসিয়া কাঁদিয়া হরি বলায়। বাৎসল্যরসের কত না আস্বাদন চলে। পুরজন পরিজন পিতামাতা সকলের সঙ্গেই খেলা। সকলের হৃদয়ের সবটুকু বাৎসল্যই সে আকর্ষণ করিয়া আনন্দে দোলে। বিশুদ্ধ বাৎসল্যময়ী বামাদেবী স্নেহের দুলালকে অঙ্কে ধারণ করিয়া স্তন্যদান করেন। শিশুসুন্দর এক হাতে মায়ের আঁচল, অন্য হাতে স্তন্য ধরিয়া চুক্ চুক্ করিয়া দুগ্ধ পান করে। মা রাঙা চরণ চুম্বন করিয়া কণ্টকিত হন। 'আয় চাঁদ' 'আয় চাঁদ' বলিয়া চাঁদ-কপালে চাঁদের টীপ পরাইয়া দেন। দুইটি গণ্ড বাহিয়া দুধ গড়াইয়া পড়ে। মা

আঁচলে মুছাইতে চাঁদ বদনে লক্ষ চুম্বন বৃষ্টি করেন। স্নেহ-ধনের মুখের লালায় মায়ের গাল ভিজিয়া যায়। বিশুদ্ধ বাৎসল্যরস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তখন দ্বিজকুল-চূড়ামণি দীননাথ-অঙ্গনে বিরাজ করে।

দীননাথ দীনহীনের মত। ব্রাহ্মণপণ্ডিত চিরদিনই দীন ভিখারী। কোনও সম্পদের প্রতি কখনও তাঁহার লোভ নাই। লোভ কাঁদিয়া তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ এ কি হইল! পুত্ররত্নের উপর তাঁহার কি প্রবল আসক্তিই দেখা দিল! স্নেহমণিটি বক্ষে চাপিয়া দীননাথ সুখের সমুদ্রে ডুবিয়া যান। পুত্রের শুভাশুভ বিচার করিবার জন্য জন্মলগ্ন-ঠিকুজি লিখিয়া রাখেন। নিয়ন্তাকে কে নিয়ন্ত্রিত করিবে! দীননাথ তাহা বুঝেন না। তিনি যে পিতৃ-শান্তরসের মূর্ত্তমানুষ, তাই প্রেমান্ধ। প্রেমের আঁধার দেশে অন্ধে অন্ধেই প্রেমের খেলা। জ্ঞানের আলো পড়িলেই প্রেম গেল। শুদ্ধ জ্ঞানের ঊর্দ্ধশিখরে এই জ্ঞানাভাব। আলোর আতিশয্যে এই অন্ধকার। বোঝা বিষম ভারী। ব্রহ্মসূত্রে এই তত্ত্ব-রহস্যেরই ইঙ্গিত,—

“লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্।”

সন্ন্যাসীর অন্তর্দৃষ্টি

"গর্গ বাক্ চাতুরী হৃষ্ট নন্দনীত রহঃ স্থলম্ ।
প্রশস্ত নামকরণং গর্গ সূচিত বৈভবম্ ॥
সাধুরক্ষাকরং দুষ্টমারকং ভক্তবৎসলম্ ।
মহা নারায়ণং বন্দে নন্দানন্দ বিবর্দ্ধনম্ ॥"

—শ্রীসনাতন

ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের নিকট একটি সংবাদ পাইলেন। মুর্শিদাবাদে রাণী স্বর্ণময়ীর বাড়ীতে একজন নেপালী সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী এবং অনেক লোককে ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতেছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় নিজ-পুত্রের ভবিষ্যৎ জানিবার উদ্দেশ্যে স্বকৃত ঠিকুজিখানি লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ঠিকুজিখানা দেখিয়া সন্ন্যাসীপ্রবর অস্বাভাবিক ভাবে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন—'পণ্ডিতজী, আপনি ঠিকুজিখানা রাখিয়া যান, ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে। আর একদিন আসিবেন।'

ন্যায়রত্ন মহাশয় দ্বিতীয় দিন সন্ন্যাসীর নিকট উপনীত হইতেই তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—'আপনার ছেলে বাঁচিয়া আছে তো?' ন্যায়রত্নের মুখ কালি হইয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন—'আজ্ঞে, অমন কথা বলিতেছেন! খোকার কি কোনও অমঙ্গল দেখিতে পাইলেন?' সন্ন্যাসীপ্রবর সুর ফিরাইয়া বলিলেন—'না, খোকা কি করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।' ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন—'খোকা খেলা করিতেছে।'

সন্ন্যাসীজী কহিলেন, 'তাহাকে একবার এখানে আনিতে পারেন ? আমি দেখিব।' ন্যায়রত্ন মহাশয়, 'যে আজ্ঞে' বলিয়া চলিয়া গেলেন। তৃতীয় দিবস পুত্রবৎসল পিতা সেই অমূল্যরত্ন কণ্ঠে দোলাইয়া গঙ্গা পার হইয়া সন্ন্যাসী-মহারাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

শিশুসুন্দরকে দর্শন করিবামাত্র সন্ন্যাসী ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ক্রোড় হইতে তাঁহাকে নিজ বাহুপাশে লইলেন। তারপর বুকের উপর রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ইহাতে ন্যায়রত্ন সভয়ে বলিলেন—'আপনি খোকার অকল্যাণ করিতেছেন কেন ?' সন্ন্যাসী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া নিজ-শিরোপরি পণ্ডিত দীননাথ-নন্দনের কচি পা ছুইখানি রাখিলেন। দৃশ্য দেখিয়া দীননাথ অবাক্! তিনি ভীত ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন—'আপনি এ কি করেন! ইহাতে যে খোকার অকল্যাণ হইবে! আপনি খোকার মাথায় পায়ের ধূলা দিন্।'

সন্ন্যাসীপ্রবর তখন বাহ্যজ্ঞানহারা-অবস্থায় ঢুলিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের কথা তাঁহার কানে প্রবেশ করিতেছিল না। কিছু সময় পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া শিশুসুন্দরকে ন্যায়রত্নের কোলে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন—'আমার বাংলাদেশে আসা সার্থক হইল। এইরূপ ভাগ্য প্রতিবারেই একজনের ঘটিয়া থাকে। এইবার আমার সেই ভাগ্য উপস্থিত। ন্যায়রত্ন, তোমাকে আর কি বলিব! যে-পাঁচটি গ্রহের সংযোগে অবতারের জন্ম— যেমন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সেই পাঁচটি গ্রহই ইহার জন্মলগ্নে সংযুক্ত।

ইনি দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ হইবেন। ইঁহার দ্বারা জীব কৃতার্থ হইবে।' ইহার পর সেই জ্যোতিষী সন্ন্যাসীকে আর কেহ মুর্শিদাবাদ-সহরে দেখে নাই।

দেবী কিরীটেশ্বরীর মন্দির হইতে অপর একজন সন্ন্যাসী একদিন ডাহাপাড়ায় আসিয়াছেন। যদৃচ্ছক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি দীননাথ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। বামা-দুলাল অঙ্গনে হামাগুড়ি দিয়া খেলিতেছে। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সন্ন্যাসী শিশুটির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—'এই ছেলেটি কাহার? এ যে রাজা হইবে!' ন্যায়রত্ন মহাশয় ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন—'সাধুজী, গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান, রাজা হইবে কি প্রকারে?' সন্ন্যাসী অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে তৎক্ষণাৎ কহিলেন—'ভোগের রাজা নহে, যোগের রাজা। ঐ যে চরণে ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-রেখা দেখা যাইতেছে।' এই বলিয়া সন্ন্যাসী ক্রীড়াপরায়ণ শিশুসুন্দরের রক্তোৎপল-সদৃশ শ্রীচরণের দিকে নিজ-তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিলেন।

সন্ন্যাসীঠাকুরদের এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী দীননাথ বামা-দেবীকেও জানাইয়া দিলেন। তিনি শুনিয়া স্বামীকে বলিলেন—'দেখ, ওসব কথায় কান দিও না। ছেলে বাঁচে কিনা তাহাই দেখ। দুঃখিনীর দুঃখের ধন।' দুইজনেরই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। উভয়ে পুত্রের মুখ চাহিয়া বিপদবারণ নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাপর কোনও কথাই আর তাঁহাদের মনে স্থান করিতে পারিল না।

"নাম—জগদ্বন্ধু"

"মহা কারুণ্য মহিমা পুরাণো নিত্যনুতনঃ"

—শ্রীসনাতন

শরতের প্রভাত। প্রকৃতিদেবী শেফালী-শয্যা রচনা করিয়া আজ যেন কাহার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিতা! জলে স্থলে শোভার ডালি আজ যেন কাহার চরণের অর্ঘ্য হইবার জন্য উর্দ্ধমুখ! ধানের ক্ষেতের সোনার থালায় আজ যেন কাহার বরণ-ডালা! দীননাথের পর্ণ-কুটীরে আজ সকাল হইতে শানাইয়ের গানে বিশ্ব-দরবারে কাহার যেন নাম ঘোষণা হইতেছে। আজ নামের দেবতার নামকরণের দিন।

জগজ্জননী বামাদেবীর বুকভরা আনন্দ। আজ নয়নমণির অন্নপ্রাশন—নামকরণ-মহোৎসব। একদিকে ঢোল বাজিতেছে, আর-একদিকে ভক্তেরা কীর্ত্তন করিতেছেন। টোলের ছাত্রেরা পাঠ বন্ধ করিয়া উৎসবায়োজনে ছুটাছুটি করিতেছে। কুমারীরা চঞ্চল পদে কাজকর্ম্ম করিতেছে। কুলবতীগণ লুব্ধ নয়নে অবগুণ্ঠন টানিয়া হুলুধ্বনি দিতেছেন। প্রৌঢ়ারা রামলীলা গাহিতেছে। বৃদ্ধারা রসের গল্পে নীরস মন সরস করিতেছেন। চাঁদ-কপালে চন্দনের ফোঁটা ও নলিন-নয়নে কাজলের রেখা দিয়া, ন'মা ক্ষমাময়ী দেবী স্নেহ-দুলালকে কোলে লইয়া আঙ্গিনার মধ্যে বসিয়াছেন্। সীমন্তে সিন্দূর পরিয়া নানা রঙের শাড়ী দোলাইয়া কত পুরনারী দ্রব্যসামগ্রী বস্ত্রালঙ্কার উপহার হস্তে ন্যায়রত্ন-পুত্রের বদন-চন্দ্র দর্শন করিতেছে।

শ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া, পিতৃপুরুষের পিণ্ড দান করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় পুত্রের নামকরণ করিলেন। ধনরত্ন সব ফেলিয়া শিশুমণি শ্রীচৈতন্যভাগবত দুই হাতে ধরিয়া বসিলেন। বৈষ্ণবগণ জয়ধ্বনি করিলেন। পুত্রমুখে মহাপ্রসাদান্ন অর্পিত হইল। নাম রাখা হইল—জগদ্বন্ধু।

শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম ভ্রমণ হইল। গ্রামবাসীগণ প্রাণ খুলিয়া বস্ত্র, অর্থ, অলঙ্কার উপঢৌকন দিয়া পাল্কী ভরিয়া দিল। শত শত নরনারী তৃপ্তির সহিত আহার করিল। সে রূপ দেখিয়া, সে নাম শুনিয়া সকলের জীবন জুড়াইল। শারদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্নপ্রাশনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবার সুযোগ পাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। সমুচিত দান-দক্ষিণা পাইয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ উল্লাস করিতে লাগিলেন। সকলের পদধূলি কুড়াইয়া শিশুর মস্তকে অর্পণ করতঃ দীননাথ পুত্রের মঙ্গল কামনা করিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মুখ চাহিয়া শ্রীশুকের ভাষায়,—

"অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনঃ॥"

বলিতে বলিতে সানন্দে স্ব-স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শৈশব-মাধুরী

মহানন্দপ্রসূতাত্ত লীলা মানুষ বালক।
নরাকৃতি পরব্রহ্মন্ প্রকৃষ্টাকার সুন্দর॥"

—শ্রীসনাতন

বামা-দুলালের নাম হইল জগদ্বন্ধু। মা ডাকেন—'বন্ধু-সোনা'। ন'মা ডাকেন—'বন্ধুগোপাল' কৈলাসকামিনী বলে—'জগৎসোনা'। বাবা ডাকেন শুধুই—'জগৎ' প্রিয়জনেরা ডাকে 'প্রাণবন্ধু'। আমরা বলি—'বন্ধুসুন্দর।' বন্ধুসুন্দরকে যে একবার দেখে সে-ই ভালবাসিয়া ফেলে। সে ভালবাসা স্বাভাবিক ও অহৈতুকী। শাশ্বত ধনের জন্য জীবের ভালবাসা যে স্বতঃই প্রবাহিত!

জগৎসুন্দর ক্রমে হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছে। চলিতে চলিতে ঘরের দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইতে শিখিতেছে। মা হাতে ধরিয়া 'হাঁটি হাঁটি পা পা' শিখাইতেছেন। জগৎসুন্দর হাঁটিতে হাঁটিতে ক্রমে দৌড়াইতেছে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাঁপাইয়া পড়িতেছে। হাঁপাইয়া মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। তারপর কোলে বসিয়া চুপি চুপি দুই হাতে ধরিয়া স্তন্য পান করিতেছে। কখনও ছুটিয়া গিয়া বাবার গলা জড়াইয়া তাঁহার প্রশস্ত বুকে ঝুলিতে থাকে। গ্রামের নরনারী বালক বৃদ্ধ গৃহবধূ সকলেই আসিয়া জগৎসুন্দরকে কোলে বুকে করিয়া আদর করে। স্নেহরসে-গড়া-তনু জগৎসুন্দর সকলের কোলেই হেলিয়া দুলিয়া বাৎসল্যরস আস্বাদন করে।

মা গৃহকর্ম্মে লিপ্ত আছেন। জগৎসোনা আঁচল ধরিয়া

টানিয়া পিঠের উপর ঝুঁকিয়া কত না কৌশলে মায়ের আদর আদায় করিতেছে। মা বিরক্ত হইয়া—'আঃ ছাড়্' বলিতেছেন। সোনার চাঁদ মুখখানি গম্ভীর করিয়া অভিমান-ভরে ধূলায় গড়াইতেছে। উর্মিলা—'ষাট্ ষাট্' বলিয়া কোলে তুলিয়া ধূলা ঝাড়িতেছে। কান্না থামিতেছে না। অবস্থা বুঝিয়া মা আপনার মৃণাল-বাহুদুইটি বাড়াইয়া দিতেছেন। কচি কচি নবনীত-কোমল হাতদুইটি বাড়াইয়া দিয়া ধূলিমাখা পূর্ণচন্দ্র মায়ের অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। মা বুক সাপটিয়া ধরিয়া স্তন্যসুধা পান করাইতেছেন। দুইজনের স্পর্শে দুইজনের অঙ্গ জড়বৎ হইয়া যাইতেছে। সেই গোলোকের দৃশ্য আশপাশে দাঁড়াইয়া কত জন দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছেন। আজও স্মরণ-নেত্রে ভাগ্যবান্ ভক্ত তাহা দেখিয়া দেখিয়া রস-পাথারে ডুবিয়া যাইতেছেন। এ খেলার বিরতি নাই, আরম্ভও নাই আছে, শুধু চক্ষুষ্মান ভাগ্যবানের অভাব।

বাড়ীর দাওয়ায় নবীন মণ্ডল আসিয়া বসে। বন্ধুগোপাল ছুটিয়া আসিয়া তাহার কোলে উঠে। নবীনের অন্তর বাহির শীতল হইয়া যায়। পরমাদরে দৃঢ় বন্ধনে সে ধন বুকের সঙ্গে বাঁধিয়া নবীন নব আবেশে দোলে। মা ডাকেন। জগৎ যাইতে চায়। নবীন ছাড়ে না, ছাড়িতে পারে না। উর্ম্মিলা আসে, বলে—'মণ্ডল-দাদা, জগৎকে ছাড়িয়া দাও, ও এখন খাইবে।' গদগদ কণ্ঠে মণ্ডল বলে—'মা, ছাড়িতে তো পারি না'! উর্ম্মিলা হাত বাড়ায়। জগৎ—'উমি হো' বলিয়া তার কোলে যায়। নবীনের বুকটা খাঁ খাঁ করে। তার প্রাণ সেই স্পর্শ-সুখের ক্ষুধায় অধীর

হইয়া উঠে। সেই প্রাণ-জুড়ানো স্পর্শানন্দের স্মৃতিটুকু সম্বল করিয়া নবীন নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত পরম উল্লাসে রস-পিপাসু ভক্তের নিকট বন্ধুবার্ত্তা পরিবেশনে তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন।

মাতৃ-বিরহ

"যশোদা হৃদয়াশঙ্কা-চিন্তা-জ্বর শতপ্রদ।
শোকাব্ধি পতিতাশেষ ব্রজযোষিদ্‌গণাঽব মাং॥"

—শ্রীসনাতন

মায়ের ভালবাসার তুলনা নাই। মায়ের আনন্দের সীমা নাই। মায়ের কান্নারও পার নাই। কৌশল্যা কাঁদিয়াছেন। দেবকী কাঁদিয়াছেন। যশোমতী কাঁদিয়াছেন। শচীদেবী কাঁদিয়াছেন। সে কি কান্না! কান্নায় পাষাণ গলে, বনের পশুপক্ষী ঝুরে, গাছের পাতা খসিয়া পড়ে। কাঁদাইলে কাঁদিতে হয়, এই বিধান আজ বুঝি বিধির বিধাতাকেও ছাড়িবে না!

জগৎসুন্দরের বয়স চৌদ্দমাস। মা আজ সোনার চাঁদের চাঁদ-অধরে চুম্বন করিয়া প্রাণপতির কোলে শির রাখিয়া নিত্য-লোকে গমন করিলেন। মা ভালই করিলেন, নতুবা অনেক কাঁদিতে হইত। এবার কান্না আসিয়া আশ্রয় লইল, যিনি বার-বার কাঁদাইবার কারণ তাঁহারই কণ্ঠে। শিশু অবোধ হইলে কি হইবে! ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া হেচ্‌ক তুলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। আজ জগৎসুন্দরের চোখের জল শোকাকুলা কৈলাস-

কামিনীর ধারায় মিশিয়া বহিয়া চলিল। সেই জলে বেদনাহতা উর্ম্মিলার বসন ভিজিল। জগতের অশ্রুধারে পত্নীহারা ব্যাকুল দীননাথের কাঁধ ভিজিল। সে কান্নায় ন'মা ক্ষমাময়ী দেবীর শয্যা ভিজিল। কাঁদ, খুব কাঁদ! অনেক কাঁদাইয়াছ!

বামাদেবী-বিহনে সমস্ত পরিবারটি আকুল হইয়া পড়িল। তথাপি জগৎসুন্দরের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহারই মুখ চাহিয়া সকলে আত্মসংবরণ করিতে যত্নবান হইল। ন'মা সাধ্যমত সকল কর্ত্তব্য সমাধান করিতে লাগিলেন। জগৎসুন্দর ন'মার বক্ষের বাৎসল্য-স্নেহ প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন আরম্ভ করিলেন।

বিদায়

ভৈরব চক্রবর্ত্তী মহাশয় দীননাথের পত্রে বধূমাতার তিরো-ভাব সংবাদ পাইয়া গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিলেন। বাড়ীর প্রত্যেকে, পাড়াপ্রতিবেশী সকলে ঐ দুঃসংবাদে ব্যথিত ও শোকসন্তপ্ত হইল। ভৈরবচন্দ্র ডাহাপাড়ায় রওনা হইলেন। রাসমণি দেবী পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিলেন—'কৈলাসকামিনী ও জগৎসুন্দরকে লইয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবেন। ডাহাপাড়া পৌঁছিয়াই ভৈরবচন্দ্র জগৎসুন্দরকে লইয়া গোবিন্দপুর রওনা হইবার জোগাড় করিতে লাগিলেন।

এদিকে, স্নেহময়ী ন'মা বুকের ধনকে কিছুতেই বুকছাড়া করিতে চাহেন না। চাহিলেও পারেন না। যে একবারও ঐ রত্নকে কণ্ঠভূষণ করিয়াছে, তার আর ছাড়িবার শক্তি কোথায়?

মা ক্ষমাময়া—'আজ নয় কাল, এ মাসে যাইতে নাই, আজ দিন ভাল নয়, কাল মঘা' ইত্যাদি কত শত ওজর-আপত্তি তুলিয়া দিন পিছাইতে লাগিলেন।

ওদিকে গোবিন্দপুর হইতে ভৈরব-গৃহিণী রাসমণি দেবী জগতের জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। দুইদিকে দুইটি বাৎসল্যে সমান টান, মধ্যস্থলে জগৎসুন্দর তিন মাস নিশ্চল রহিলেন।

বয়স তখন সতেরো মাস। উর্ম্মিলার বাম ক্রোড়ে বন্ধুরত্ন। আঁচল ধরিয়া পশ্চাতে কৈলাসকামিনী। অগ্রভাগে বৃদ্ধ ভৈরব-চন্দ্র। গঙ্গার কূল আঁধার করিয়া পদ্মার কূলে উদয় হইতে চলিয়াছেন। ডাহাপাড়াবাসী বালক-বৃদ্ধ অঝোরে ঝুরিল। যত দূর নৌকার ক্ষীণ রেখাটি পর্য্যন্ত দেখা গেল, শত শত নরনারী গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে অশ্রু-বর্ষণ করিল। চোখের জল মুছিতে মুছিতে দীননাথের কাঁধের গামছা ভিজিয়া গেল। চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। পত্নীর বিয়োগ-বেদনাও আজ নূতন হইয়া ফুলিয়া উঠিল। তবু, সমুদ্র-গম্ভীর পণ্ডিত দীননাথ ছাত্রদের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা ভাবিয়া, গঙ্গাতীর হইতে ডাহাপাড়ার অন্ধকার ভবনে ফিরিয়া আসিলেন। ভগ্ন হৃদয়ে চারিদিক শূন্য দেখিয়া বিল্ববৃক্ষটির মূলে বসিয়া পড়িলেন। জগৎসুন্দরের খেলার খেল্‌না-সামগ্রীর ঐ যে একটা ওখানেই পড়িয়া আছে। দীননাথ পাগলপ্রায় হইয়া নিজ সন্তপ্ত বুকে নিজে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অপ্রাকৃত বাৎসল্য! তোমায় পাইলে সুখও যেমন, দুঃখও তেমনই! 'বিষামৃতে একত্র মিলন!'

গোবিন্দপুরে বন্ধুগোবিন্দ

গোবিন্দপুরে আসিয়া বন্ধুগোবিন্দ জেঠাইমা ভরৈব ঘরণী রাসমণি দেবীর ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছে। কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই, তাঁহাকে 'মা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে। শুদ্ধ বাৎসল্যের এই মিলনে এক অপার্থিব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাসমণি দেবীর কোল জুড়িয়া জগৎসুন্দর বসিয়া, দুইটি পা দোলাইয়া দোলাইয়া আধ আধ স্বরে কত না কথা বলিতেছে! দেবী-মা সমগ্র বিশ্বের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-রসিত সেই চাঁদ-অধরে চুম্বন করিয়া সুধার সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছেন। খেলিতে খেলিতে জগৎ কখনও একটু বাড়ীর বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। দেবী পলকে নয়ন-তারা হারা হইয়া দুর্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে ইতি উতি অনুসন্ধান করিতেছেন। কতক্ষণ পরে দেখা পাইয়া অন্তরে আনন্দ, বাহিরে কৃত্রিম রোষ প্রকাশে মৃদু শাসন করিতেছেন। চতুর-চূড়ামণি জগৎসুন্দর স্বজন-প্রীতি-বিবর্দ্ধন স্বভাবে, ইচ্ছা করিয়া ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিয়া, দেবী-মাকে কাঁদাইয়া ফেলিতেছে। এইমত রাসমণির অঙ্কে রসের ঠাকুর বাৎসল্যরসের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক অভিনয় করিতেছে।

গোবিন্দপুরে আসিবার আট মাস পরে মায়া-রূপিণী খেলার সঙ্গিনী কৈলাসকামিনী আড়ালে লুকাইল। সমস্ত সংসারের উপর আর একটা ঘন বিষাদের ছায়া পড়িল। কেবল জগতের মুখ চাহিয়া সকলেই দুঃখ সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জগৎসুন্দরের শ্রীমুখখানি কয়েকদিন ধরিয়া গম্ভীর

ভাব ধারণ করিল। এই আসা-যাওয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা দুরূহ। নন্দালয়ে কৃষ্ণানুজা জন্মিয়াই পরদিন কংস-হস্ত হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। তখন বেদনায় কাতর হইবার সুযোগ ছিল না। এবার কিন্তু অগ্রজার জন্য নয়ন-কমল হইতে মুক্তা-বিন্দু ঝরিতে লাগিল।

জগৎসুন্দর গোবিন্দপুরের সকলের নয়ন-তারা। এমনই একটা বস্তু তাহার মধ্যে আছে, যে একবার দেখে তাহাঁরই নয়ন চুরি যায়, মন চুরি যায়। চক্রবর্ত্তী-বাড়ী ভদ্রলোকের আসিবার উপায় নাই। যে আসিয়া একটিবার সে শিশুর রূপে নয়ন দেয়, সে-ই চুরি হইয়া যায়! সে নিজে আর নিজের থাকে না। কে যেন তাহাকে লইয়া যায়। দিগম্বরী, গোলোকমণি, গোপালচন্দ্র, তারিণীচরণ, বাড়ীর সকলেরই জগৎ হইল প্রাণকোটি-নির্মঞ্ছন। রাসমণি ও ভৈরবচন্দ্র নিজ-সন্তানগণ অপেক্ষা জগৎকে অধিকতর স্নেহ করেন। ব্রজের আদরের দুলাল আজ গোবিন্দপুরবাসী কত ভাগ্যবতী নরনারীর কোলে কোলে আদরে আব্দারে নাচিয়া বেড়ায়।

গোবিন্দপুরের বাড়ী পদ্মানদীর কিনারে। বর্ষাকালে পদ্মা একেবারে ঘরের দুয়ারে আসে। কত যেন অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া পদ্মা আসিয়া ভৈরব চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর দরজায় লুটোপুটি খায়। সুরধুনী গঙ্গার প্রধান শাখা হইয়াও ভগীরথ-শাপে অভিশপ্তা পদ্মা, চিরদিন গোবিন্দ-লীলারসে বঞ্চিতা। অপরাধ পদ্মাসুরের, পদ্মা কেন অভিশপ্তা হইবে? তাই কি সে অভিমানে তরঙ্গ-রঙ্গে তীর ভাঙ্গিয়া যুগযুগ ধরিয়া কত শত জনের

অভিমানে-গড়া অমূল্য কীর্ত্তি নাশ করিতেছে! যুগসঞ্চিত ব্যথা জানাইতেই কি পদ্মা আজ গোবিন্দপুরে বহিতেছে! আজ বুঝি-বা তাহারই অভিশপ্ত জীবনকে সান্ত্বনা দিতে জগজ্জীবন তাহার তীরে তীরে লীলা-বিস্তার করিতেছেন। ব্রজরস-পুষ্টা যমুনা ও নদীয়ার মাধুরী ধারা-বাহিনী গঙ্গা—এই দুইয়ের জোয়ার-ভাটার কল্লোল-রোলেই আজ পদ্মার বক্ষ তরঙ্গিত। গোরাচাঁদের গচ্ছিত প্রেমের উচ্ছ্বাসে, তীরবর্ত্তী খেতুরের কীর্ত্তন-কল্লোলের উল্লাসে, পদ্মার ফেনিল তরঙ্গমালা নিত্যই নৃত্যপরায়ণ। আজ তাহারই তীরে জগৎসুন্দর নূতন লীলায় বিভোর।

ক্রমে পদ্মানদী বেগবতী হইয়া বন্ধুর পদস্পর্শিত পূত রজঃকে গ্রাস করিতেই যেন চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী ভাঙ্গিয়া লইয়া গেল। ভৈরব চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন অনেকটা দূরে পশ্চিম দিকে সরিয়া গিয়া জ্ঞানদীয়া গ্রামের কাছাকাছি নব গোবিন্দ-পুরে নূতন বাড়ী করিলেন। নূতন বাড়ীর আশে পাশে জগৎ-সুন্দরের নূতন নূতন খেলার সাথী জুটিল। পদ্মাবতীও খেলিতে খেলিতে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তিন চারিটি পুত্রকন্যা-সহ আনন্দ ও প্রতাপ ভৌমিকের মাতা তাহাদের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে গোবিন্দপুরের বাড়ী হইতে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলে 'আনন্দের মা' বলিত। বালক প্রতাপ জগদ্বন্ধুসুন্দরের সমবয়স্ক, বাল্যখেলার সাথী। ভৈরবচন্দ্রের পিসতাত ভাই পণ্ডিত কালীশঙ্কর তর্কালঙ্কারের দুইটি কন্যা—বরদা ও নিস্তারিণী। তাঁহারা পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে বাস করিতেছেন। দেবী

নিস্তারিণী বন্ধুসুন্দরের সমবয়স্কা ও খেলার সঙ্গিনী। ভৈরব-চন্দ্রের অপর এক দূরসম্পর্কীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীও অনেক সময় চক্রবর্ত্তী-বাড়ী আসিয়া থাকে ও জগৎসুন্দরের স্নেহ-মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করে।

চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পার্শ্বেই উমানাথ বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী। উমানাথ ভৈরবচন্দ্রের পরম সুহৃদ্। উমানাথের পুত্র ত্রৈলোক্য-নাথ ও বকুলাল সব সময়ই চক্রবর্ত্তী-বাড়ী আসা-যাওয়া করে ও থাকে। বকুলাল বন্ধুসুন্দরের খেলার সঙ্গী ও সহপাঠী। জগৎসুন্দরের বাল্যখেলার সাথীগণের মধ্যে একমাত্র বকুলালই অদ্যাপি সেই লীলার সাক্ষ্যস্বরূপ আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান আছেন। তবে, তাঁহার কাছে কোনও সংবাদ পাইবার উপায় নাই। কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করিলে—'ওঃ, সেই শয়তানটার কথা'—এইমাত্র বলিয়াই বকুলালের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া যায়, কণ্ঠ বাষ্পে রুদ্ধ হইয়া আসে। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সেই পরম দৃশ্য দর্শন-পর্য্যন্তই মহান্ লাভ।

ভৈরব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা দিগম্বরী দেবী বাল-বিধবা। ক্ষীরোদাসুন্দরী-নাম্নী একটিমাত্র কন্যাসন্তান কোলে লইয়া পিত্রালয়ে বাস করেন। দ্বিতীয়া কন্যা গোলোকমণির বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পাবনা-জেলার তাঁতিবন্দ-গ্রামের জমিদার লাহিড়ী-পরিবারে; তাঁহার স্বামীর নাম শ্রীপ্রসন্নকুমার। প্রসন্নকুমার খ্যাতনামা উকীল। পাবনা-সহরে ওকালতীর পেশার। গোলোক-মণি পাবনাতেই থাকেন। মাঝে মাঝে পিত্রালয়ে আসেন। জগৎসুন্দর বন্ধুচাঁদ যেন দিদিদের বুকের ধন, সাগরসেচা মাণিক!

রাসমণির নয়নমণি

"রাসমণি-ক্রোড়দেশ-ভূষণ বন্ধু।
চক্রবর্ত্তী ভৈরব-তোষণ বন্ধু॥"

—বন্ধুস্মরণ-মঙ্গল

বেলা অবসান। ময়ূখমালী গোবিন্দপুরের পশ্চিম চক্রবালের অন্তরালে লুকাইতেছেন। রাসমণি দেবী সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া ধূপধূনা ধরাইয়া মা লক্ষীর আসনের আগে সকলের মঙ্গল কামনা করতঃ প্রণাম করিতেছেন। ঘরের মধ্যে দপ্ করিয়া শব্দ। কি পড়িল, কে পড়িল ?—দেবী ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুতপদে চলেন। কি সর্ব্বনাশ ! এ যে জগৎ !

জগৎ পড়িয়া গিয়াছে ! দ্বিতল প্রকোষ্ঠের কাঠের পাটাতন হইতে। মেজের উপর ফুলের দেহ লুটাইতেছে। দেবী-মা চীৎকার করিয়া উঠেন। ধরিয়া দেখেন দেহ শক্ত। চক্ষু স্থির, শিবনেত্র হইয়া গিয়াছে, বুকে স্পন্দন নাই। আনন্দের মা 'ষাট্ ষাট্' বলিতে বলিতে চোখে-মুখে জল দেয়, পিঠে হাত বুলায়। বাড়ীর সবাই ছুটিয়া আসে। কান্নার রোল উঠে। খবর পাইয়া গৌর বিশ্বাস মহাশয় দৌড়াইয়া আসিলেন। সুবিজ্ঞ বিশ্বাস মহাশয় নাড়ী ধরিয়া আশ্বস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'ওরে আছে রে আছে।' সকলে কান্না বন্ধ করে। গোলমাল থামে। চিকিৎসকের ব্যবস্থামত কিছু সময় শুশ্রূষা চলে। কতক্ষণ পর জগৎ প্রকৃতিস্থ হয়। সেই দিন হইতে মা রাসমণি দেবী জগৎকে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের আড়াল হইতে দেন না।

দেবী-মা জগৎকে প্রায় কোলে-কোলেই রাখেন। বুকে করিয়া ঘুম পাড়ান। পিঠে করিয়া বেড়াইয়া বেড়ান। কোলে করিয়া খাওয়ান। কাঁধে লইয়া গৃহকর্ম্ম করেন। অত করিয়াও কিন্তু জগৎকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না। পারিবেন কিরূপে? একটু ফাঁক পাইলেই জগৎ নাই। কোথায় গেল? ও পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেল্ছে। জগৎ কখনও পদ্মার পারে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কখনও আস্তাকুঁড়ের উপর গিয়া বসিয়া থাকে। দেবী-মা ভর্ৎসনা করিতে করিতে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তুলসী-তলার মাটী গায়ে মাখেন। যাঁহার নামে সর্ব্ব-বিপদ পলাইয়া যায়, অপবিত্র বিশ্ব পবিত্র হয়, তাঁহার বিপদের ভয়ে, অপবিত্র হইবার আশঙ্কায় দেবী রাসমণি সতত শঙ্কাকুলা!

জগৎ একাকী জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যায়। কোনও পরিত্যক্ত বাড়ীর শূন্য ভিটার উপর গিয়া বসিয়া থাকে। সর্পের গর্ত্তের মধ্যে পা ঢুকাইয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া থাকে। রাসমণি ভয়ে কাঁপেন। কত বুঝান, দুর্দ্দান্ত বালক কোনও কথা শোনে না। সর্প যাঁহার শয্যা, সর্পের গর্ত্তে পা রাখিতে তাঁহার ভয়ের কারণ কি! বিশুদ্ধ-বাৎসল্যময়ী তাহা বুঝেন না।

জগৎসুন্দর গোবিন্দপুর-পল্লীর সকলের বাড়ী যায়, সকলের কোলে উঠে। চিনি, গুড়, নাড়ু, মোয়া কত কি খায়। চিড়া, মুড়ি, ছানা, মাখন কত কি ছড়ায়। ক্ষীর, সর, দুধ, দধি কত কি ঢালে। যে যাহা আদর করিয়া হাতে দেয় তাহাই লয়। জগতের জন্য সকলে ভাল দ্রব্য তুলিয়া রাখে। খাবার হাতে পাইলে তাহার মুখ-চোখের যে নিরুপম শোভাটি হয় তাহা দেখিয়া সকলে

খুসি হয়। জগতের হাসি মুখ সকলের প্রাণে আনন্দধারা ঢালে।

রাসমণি স্নেহধনকে ঘরে না দেখিয়া কত খোঁজেন। পাড়ায় আসিয়া দেখেন, কাহারও ঘরে বসিয়া খাইতেছে। মা লজ্জায় মরিয়া যান! মনে ভাবেন, লোকে মনে ভাবিবে মা-মরা ছেলে জেঠাই-মা পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না। তাই পাড়ায় পাড়ায় খাইয়া বেড়ায়। নয়নমণিকে কোলে লইয়া বাড়ী আসিতে আসিতে মা বলেন—'সোনাধন, ব্রাহ্মণের ছেলের যাহার তাহার বাড়ীতে খাইতে নাই। ঘরে তো কিছুর অভাব নাই!' জগৎ হাসে। চুরি করিয়া খাইতে যাহার কোন কালেও লজ্জা হয় নাই, আদরে-দেওয়া দ্রব্য নিতে তাহার সঙ্কোচ হবে কেন? প্রিয়ত্ব ছাড়া জগৎ আর কোনও ব্রহ্মত্ব শূদ্রত্ব বোঝে না। কোনও দিনও বুঝিবে না। মা ভাবেন—'বাপ্ রে, কি ছেলেই হইয়াছে!'

তিন বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বন্ধুগোপাল দেবী রাসমণি ও আনন্দের মা'র বাৎসল্য-আস্বাদনে মাতোয়ারা। তারপর তাঁহারাও নিত্যলোকে বিদায় লইলেন। রাসমণি দেবীর শেষ-বিদায় দৃশ্যটি বড় প্রাণস্পর্শী। জ্বরে দেহ পুড়িয়া যাইতেছে। জগৎচাঁদ তখনও দুইটি কোমল করে তাঁহার গলা জড়াইয়া বুকের উপর ঝুলিতেছে। দেবী-মা বলিতেছেন—'জ্বরের এত তাপ, বাবা, তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। নামিয়া যাও।' তবুও কিন্তু জগৎ সরিতেছে না। সে স্নেহ এত স্নিগ্ধ যে, তাহাতে জ্বরের তাপ কেন, দাবদাহনও অনুভূত হয় না।

যতখানি আকর্ষণ, ততখানি বেদনা। জগৎচাঁদ আবার

মাতৃশোকে কাঁদিল। এবার মাতৃহারা শিশুর অশ্রু মুছাইয়া বুকে তুলিয়া লইলেন দিদি দিগম্বরী দেবী। কোলের একদিকে কন্যা ক্ষীরোদাসুন্দরী, অপরদিকে ভাইটি জগৎসুন্দর। বাল-বিধবা দিগম্বরী সংসারে মাতার স্থানে বসিলেন।

দিগম্বরী-ধন

"দিদি দিগম্বরী দেবী কণ্ঠহারা বন্ধু।
জ্যোতির্ম্ময় স্বর্ণকান্তি শুক-ভারা বন্ধু॥"

—বন্ধুস্মরণ-মঙ্গল

বালক জগতের বুদ্ধি দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করে। কিন্তু বড়দিদি দিগম্বরীর কাছে সে নিতান্ত অবোধ। অবোধ বালকের লালনপালনের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব তাঁহারই। তাই তিনি নিরন্তর ভাবেন। জগৎ যখন আধ আধ স্বরে 'হয়ি' 'হয়ি' বলিয়া করতালি দিয়া নৃত্য করে, বড়দিদি তখন আড়ালে দাঁড়াইয়া পলকহীন নেত্রে দেখেন। দেখেন আর ভাবেন—'এ আলোর শিশু কোন্ চাঁদের দেশ থেকে আসিল !'

জগতের কীর্ত্তন করিবার আগ্রহ দেখিয়া দিদি বেতের ঢোল ও পিতলের করতাল কিনিয়া দিলেন।

"সুরসাল করতাল রঙ্গে হরি শ্রীহরি-গুণ গাওত।
হয়ি হয়ি হয়ি, আধা আধা আধা, আধ আধ বোল বোলত॥"

জগৎসুন্দর খেলিতে খেলিতে করতাল বাজাইয়া 'আধা' 'আধা' বলিয়া নাচিতে আরম্ভ করে। প্রতাপ দৌড়াইয়া ঢোল লইয়া

আসে। নিস্তারিণী ক্ষীণ কটি দোলাইয়া আসে। ক্ষীরোদা হাত-তুইখানি তুলিয়া আসে। গান আরম্ভ হইয়া যায়—

"দগা মাধা পাপী ছিয়,
হয়ি নামে তয়ে গেয়—"

এ গান কোথা হইতে আসিল, কে জানে ? এতো সব চাইতে বড় কথা। হরিনামের শক্তিতে সংসারে যত বড় বড় কাজ হইয়াছে সব চাইতে বড় ঘটনা জগাই-মাধাইর উদ্ধার। বাল্যের ক্রীড়া-মাধুরীর মধ্যে সেই কথাই জগতের শ্রীমুখে ফুটে।

কীর্ত্তন করিতে করিতে ঢোল-বাদক প্রতাপের ইচ্ছা জাগে সে করতাল বাজাইবে। করতাল-বাদক জগৎ, তাহার করতাল কিছুতেই ছাড়িবে না। প্রতাপ জোর করিয়া করতাল টানিয়া লয়। পরাজিত জগৎ চীৎকার করিয়া তাহার দিদিদের কাছে নালিশ করে—'ছোড়্দি বড়্দি পেরতাপ কত্তাল।' আজ প্রতাপ জানে না, কাহার হাতের করতাল কাড়িতেছে। জগৎ-সুন্দরও জানে না, ভক্তদের হাতে তাহার চিরকাল হারিবারই পালা।

জগৎ পদ্মার ঘাটে খেলে। কখনও জলে নামিয়া অনেক দূরে চলিয়া যায়। দিদি কুমীরের ভয়ে ভীতা। প্রাণ উঘারিয়া ডাকেন। জগৎ উঠে না। দিদি ধরিতে যান। জগৎ দিদির গায়ে জল-কাদা ছিটাইয়া দেয়। দিদি জোর করিয়া হাতে ধরেন। আস্তে আস্তে কোমল গালটি টিপিয়া দেন। সঙ্গীদের সম্মুখে এই অপমানে জগতের মুখ ভার হয়। অপরাধীর মত

জগৎ ছল্ ছল্ নয়নে এদিক ওদিক তাকায়। দিদির প্রাণ গলিয়া যায়। দুই হাতে বক্ষে জড়াইয়া দিদি বিম্বাধরে লক্ষ চুম্বন করেন। বাৎসল্যরস বিগ্রহবন্ত হইয়া গোলোকের মাধুরী প্রকট করে!

দিদি ছোট বোন নিস্তারিণীকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। কোন্ দিক হইতে জগৎ আসিল। আসিয়া তের্ছা নয়নে একটিবার দেখিল। 'হুঁ,—নিচুই তোমার সব কিছু, আমি তোমার কিচ্ছুই না'—এই কথা বলিতে বলিতে মুখ ভার করিয়া জগৎ অভিমানবশে ঘরের চালে উঠিয়া বসিল। দিদি শিরে করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—

"প'ড়ে যাবি, দস্যু ছেলে, নেমে আয়।"—ডাকিতে ডাকিতে দিদির গলা ভাঙ্গে। ঘরের চালে জগৎ হাসে। নিরুপায় হইয়া দিদি তারিণীকে ডাকেন। গোপাল তারিণী দুই ভাই ছুটিয়া আসিয়া চালে মই লাগায়। গোপাল মই ধরে, তারিণী চালে উঠে। উঠিয়া জগৎকে লইয়া নামে। দিদি আদরে কোলে লন। মিষ্টিমাখা রাগের কথা বলেন। জগৎ দিদির কাঁধে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া শোনে।

জগৎ পদ্মার ঘাটে খেলে। ঘাটে জেলেদের কত নৌকা বাঁধা। জগৎ এক নৌকায় উঠে। নৌকার বাঁধ নিজেই খুলিয়া দেয়। জগৎকে লইয়া নৌকা উজানে ভাসে। সকলে অবাক্ হইয়া তাকায়। কেহ-রা ভয়ে চেঁচামেচি করে। সংবাদ পাইয়া দিগম্বরী দিদি ঘাটে দৌড়াইয়া আসেন। তাঁহার আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া কেহ কেহ জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

নৌকা টানিয়া তীরে আনে। দিদি হাত বাড়াইয়া দেন। পদ্মার কোল হইতে জগৎসোনা দিদির কোলে ঝাঁপাইয়া উঠে।

মাঠে গরু বাঁধা আছে। জগৎ দড়ির বাঁধন খুলিয়া দেয়। তাহারা ছুটিয়া যায়। পাড়ায় কাহারও বাড়ীর লাউ-কুমড়ার গাছ আর থাকে না। চাষীর মাঠের ধান-পাট খাইয়া গাভীরা পেট ভরে। চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। সঙ্গী বালকেরা নালিশ করিয়া দেয়—জগৎ গরু ছাড়িয়াছে। দিদি ভর্ৎসনা করেন। জগৎ হাসিতে থাকে। যেন কত মজা!

জগৎ দুগ্ধবতী গাভীর বাঁধা বাছুরের গলার দড়ি খুলিয়া দেয়। তাহারা ছুটিয়া গিয়া গাভীর দুধ খাইয়া ফেলে। গাভীর মালিকেরা দিগম্বরী দেবীর কাছে অভিযোগ আনে। জগতের দৌরাত্ম্যের কথা ভাবিয়া দিদি ক্রুদ্ধা হইয়া শাসন করেন। সামান্য কারণেই জগতের মুখ ভার হয়। অভিমানে গর্ গর্ করিয়া সে রাস্তা ধরিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে। অনেক দূরে চলিয়া যায়। দিদি ডাকাডাকি করেন। জগৎ শুনিয়াও শোনে না। কেহ কেহ গিয়া দৌড়াইয়া ধরিয়া আনে। দিদি জিজ্ঞাসা করেন—'জগৎ একা একা' কোথায় যেতিস্।' জগৎ একটুও না ভাবিয়া উত্তর করে—'যাতাম ইছান দাছের বাড়ী, না হয় মকিম জুন্‌দারের বাড়ী।' ঈশানবাবু গোপালপুরের জমিদার। দানে ধ্যানে পুণ্যকর্ম্মে স্বনামধন্য। বুঝি-বা তাঁহার প্রতি করুণেক্ষণ করিতেই বন্ধুগোপাল ঘন ঘন গোপালপুরের দিকে চলেন। ভাজনডাঙ্গা-গ্রামের মহিম মজুমদার ফরিদপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা শিক্ষক। তাঁহার দিকেও কৃপাদৃষ্টি।

নিবারণ চৌধুরীর বাড়ীর বাগানে দিদি দিগম্বরী ফুল তুলিতে যান। জগতের যাওয়াই চাই দিদির সঙ্গে। কখনও কোলে, কখনও কাঁধে, কখনও-বা দিদির হাত ধরিয়া হাঁটিয়া। 'দিদি, এটা কি ফুল, ওটা কি ফুল, এটা বড় কেন, ওটা ছোট কেন, এটা রাঙা কেন, ওটা সাদা কেন'—জগতের শত শত প্রশ্ন। দিদি সব কথার উত্তর জানেন না। বলেন—'কি জানি, ভাই, কেন এই সব এমন হইয়াছে!" জগৎ ছাড়ে না। উত্তরের জন্য 'উ' 'উ' করিয়া আখোট করে। দিদি বলেন—'নারায়ণের পূজা হইবে কিনা, তাই ইহারা সব এমন ধারায় সাজিয়াছে!' উত্তরে জগৎ খুসি হইয়া ফুলের ডালা মাথায় লয়।

চৌধুরী-বাড়ীতে অনেক হাঁস আছে। জগৎ হাঁসের পিছনে দৌড়াইয়া যায়। চৌধুরীদের বড় ঘোড়াটার দিকে জগৎ তাকাইয়া থাকে। ঘোড়া কেশর নাড়িয়া ঘাস খায়। জগতের আনন্দ লাগে। চৌধুরী-বাড়ীর মেয়েরা হাঁসের ডিম দেখাইয়া বলে 'জগৎ, এই দেখ, ঘোড়ার ডিম।' জগৎ বিশ্বাস করে। ফিরিয়া চায়। মুখে কিছু বলে না। বাড়ী আসিয়া বড় দিদির আঁচল ধরিয়া আব্দার ধরে—'দিদি, একটা ঘোণার ডিম দেখিয়াছি।' সকলে হো হো করিয়া হাসে। জগৎ চাহিয়া থাকে, বোঝে না সকলে হাসে কেন!

সকালবেলা ঘরের চালের উপর কাক ডাকে। অনুকরণ করিয়া জগৎ বলিয়া উঠে কা-কা। চিল ডাকে ক্যাঁ ক্যাঁ। জগৎ উপর দিকে তাকাইয়া অনুরূপ শব্দ করে। বনের কোণে ঘুঘু ডাকে। ঘুঘু কি বলে, জগৎ জানিতে চায়। দিদি বলেন—'ঘুঘু ডাকে—ঠাকুর গোপাল উঠ উঠ উঠ।' জগৎ প্রত্যেকটি

ডাকের অনুকরণ করিয়া মধুর স্বরে সুর টানিয়া টানিয়া বলিতে থাকে—'ঠাকুর—গোপাল—উঠ—উঠ—উঠ।' জগৎ ব্যাঙের সঙ্গে লাফায়, বাছুরের সঙ্গে দৌড়ায়, বিড়ালের সঙ্গে খেলে, কুকুরের সঙ্গে নাচে।

চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কাছে অছিমদ্দি বাস করে। মধ্যবিত্ত মুসলমান গৃহস্থ। বন্ধুগোপালকে দেখিলেই আদর করে। আদর করিয়া 'জামাই' 'জামাই' বলিয়া থাকে। অছিমদ্দির আখের ক্ষেত আছে। সেই ক্ষেতে গিয়া জগৎসুন্দর কচি কচি হাতে আখ ভাঙ্গে। পদ্মমুখে চুষিয়া আখ খায়। দুইটি গণ্ড বহিয়া পদ্মমধুর মত আখের রস ঝরে। অছিমদ্দি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই শোভা দেখে। দেখিতে দেখিতে তাহারও চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠে।

একদিন অনেক খেলার সাথী লইয়া বন্ধুসুন্দর অছিমদ্দির আখের খেতে গেল। অনেক আখ ভাঙ্গিয়া সকলে মিলিয়া খাইল। অছিমদ্দি আসিয়া ক্ষেতের অবস্থা দেখিয়া রাগ করিল; বলিল—'আবার আখের ক্ষেতে আসিলে মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।' সেইদিন হইতে ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ। বড়দিদি জিজ্ঞাসা করেন, 'জগৎ, আর যে আখ খাইতে যাও না?' জগৎ বলে—'দিদি, শ্বশুর ব'লেছে, আখের ক্ষেতে গেলে মাথা বারা'য়া ভাঙ্‌বে।' সকলে হাসে। অছিমদ্দির মন কাঁদে। সেই আখের রস-মাখা রাঙা মুখখানি দেখিতে না পাইয়া অছিমদ্দির মনে হয় দিনগুলি ব্যর্থ যাইতেছে। সে আবার আসে চক্রবর্ত্তী-বাড়ী। ডাকিয়া বলে—"জামাই, সোনা, যা ব'লেছি মনে রে'খ না। আবার যেও, যত

ইচ্ছা আখ খে'ও। কাল যেন ও চাঁদবদন দেখ্‌তে পাই।' অভিমানী জগৎ আড়-নয়নে তাকায়।

মানুষে মানুষে যখন কোনও কথাবার্ত্তা হয়, জগৎ মনোযোগ দিয়া শোনে। শেষে, যাহার যেমন কণ্ঠস্বর, কথার ভঙ্গী, মুদ্রা-দোষ, সেইরকম অনুকরণ করে। জগৎ খেলার সঙ্গী-বালকদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া রঙ্গ দেখে। আবার নিজেই মিটাইয়া দিতে মধ্যস্থ সাজে। জগতের রাঙা-টুক্‌টুকে মুখ। সঙ্গীরা কেহ কেহ তাহাকে 'রাঙা মূলা' বলিয়া ডাকে। গাছে ডাব-নারিকেল দেখিয়া জগৎ বলে—'বকু, ডাব খাব রে!' বকুলাল বলে—'রাঙা-মূলা, আমি তো গাছে উঠ্‌তে জানি না রে।' জগৎ বলে,—'না, তুই জানিস্।' জগতের আগ্রহে বকুলাল নারিকেল-গাছে উঠে। নারিকেল পাড়ে। নামিয়া আসিয়া বকু জগৎকে দেখায়—গাছের ঘষায় তার বুকের ছাল উঠিয়া গিয়া লাল হইয়া গিয়াছে। দেখিবামাত্র জগৎ 'আহা-হা' বলিয়া আদরে বকুর বুকে হাত বুলায়। তাহার চক্ষু ছল্ ছল্ করে। ও ব্যথাটা যেন তাহার নিজের বুকেই। জগতের হাতের স্পর্শ পাইয়া বকু সকল ব্যথা ভুলিয়া যায়। রাঙা মূলার রাঙা মুখের নিরুপম শ্রী দেখিয়া বকু ব্যাকুল হয়। হাত বাড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরে। জ্ঞানদীয়া-গাঁয়ের বন-পথে ভাণ্ডীর-বনের দৃশ্য মূর্ত্তিমান হয়।

জগৎ সঙ্গিগণের সঙ্গে গোবিন্দপুরের শ্মশানে যায়। মরার খাটীয়ার উপর শুইয়া পড়ে। "ও খাট মরার, ওতে শুতে নেই'—বলিয়া সঙ্গীরা চেঁচাইয়া উঠে। জগৎ বলে—'ভাই এর চেয়ে পবিত্র আর কিছু নাই রে। শ্মশানও যা ফুলবনও তা'

সঙ্গীরা জগতের কথা বোঝে না। বাড়ী আসিয়া তাহারা বুড়া-বুড়ীদের সব কথা বলিয়া দেয়। বড়দি বলেন—জগৎ, তুই স্নান করিয়া ঘরে আয়, অশুচি ছুঁইয়াছিস্। 'জগৎ বলে—'দিদি, শুচি-অশুচি মনের বিকার। আমি যা ছুঁই, তাহাই শুচি হইয়া যায়।' দিদি জগতের পাকা পাকা কথা শোনেন, আর হাঁ করিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন। শেষে, জোর করিয়া গায়ে এক কলসী জল ঢালিয়া দিয়া ভাইটিকে ঘরে নেন।

প্রতাপ, নিস্তারিণী, ক্ষীরোদা, বরদা, বকু জগৎসুন্দরের সঙ্গে লুকোচুরি-খেলা খেলে। অন্য সকলে যখন লুকায়, জগৎ তখন হয়রান হইয়াও খুঁজিয়া পায় না। জগৎ যখন লুকায়, সকলেই তাহাকে অনায়াসে বাহির করিয়া ফেলে। জগৎ কিছুতেই বোঝে না—কেন এখন হয়! বুঝিবে কিরূপে? তাহার নিজের অঙ্গে যে কি মধুর গন্ধ, তাহা ত সে নিজে জানে না। সেই মন-মাতানো গন্ধে মাতোয়াল হইয়া সঙ্গীরা তাহার সঙ্গে খেলে। লুকাইলে, সহজেই খুঁজিয়া পায়। এই খেলা তাহারা ছাড়িতে চায় না। তাহাদের কথা ভাবিলে, শ্রীশুকের উচ্ছ্বাসটিই হৃদয়ে জাগে—

"মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।"

বিদ্যারম্ভ

"প্রভবৌ সর্ব্ব বিদ্যানাং সর্ব্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ।
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গূহমানৌ নরেহিতৈঃ॥"

—শ্রীশুকদেব

মাঘ মাস। বাসন্তী সপ্তমী-তিথি। সূর্য্যপূজার দিন। দুই দিন আগে মা সরস্বতী আসিয়াছেন। মায়ের চরণের প্রসাদী পলাশ এখনও শুকায় নাই। ছেলে-মেয়েদের পুঁথি-পুস্তক এখনও মায়ের চরণ-পার্শ্বেই আছে। কালিশূন্য দোয়াতের গায়ে রক্ত-চন্দনের ফোঁটাগুলি এখনও উজ্জ্বল আছে। হংসবাহিনীর শুভ্র শোভা এখনও বাংলার বালক-বালিকার অন্তর-বাহির আলো করিয়া আছে।

আজ জগদ্বন্ধুসুন্দরের হাতে-খড়ি। পরাৎপর-বিদ্যার যিনি আশ্রয়, আজ তাহার বিদ্যারম্ভ। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহল। ডাহাপাড়া হইতে পণ্ডিত দীননাথ আসিয়াছেন। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে। জগৎসুন্দরের সুন্দর অঙ্গে হলুদ মাখানো হইতেছে। কুলু কুলু উলুধ্বনি দিগন্ত ছাইতেছে। স্নানান্তে নব নব বস্ত্র-আভরণে জগৎসুন্দর সাজিতেছে। কটিতে পট্টবস্ত্র, নয়নে কাজল, কপালে চন্দন-বিন্দু। গণ্ডে চন্দনে-অঙ্কিত লতাপত্র। বক্ষোপরি একগাছি স্বর্ণ-হার। শোভা যেন গলিয়া পড়িতেছে! অঙ্গের ছটায় বসন ভূষণেরই শোভা বাড়িয়াছে। জগৎসুন্দরের সৌন্দর্য্যে নরনারী মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া আছে।

পণ্ডিত তুর্গাচরণ বন্ধুধনকে কোলের কাছে লইয়া বসিলেন। সে অঙ্গের স্পর্শে তুর্গাচরণের গাত্র প্রথমে শিহরিয়া উঠিল। তারপর একটা স্নিগ্ধ মধুর প্রবাহ তাঁহার সারা দেহকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। শ্রীতুর্গা স্মরণ করিয়া তুর্গাচরণ জগজ্জীবনের শ্রীহস্ত ধরিয়া খড়ি লইয়া অ আ ক খ অক্ষর পাত করিলেন। পিতা দীননাথ রাধাগোবিন্দের মন্দিরে মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইলেন। নব বিদ্যার্থীর নব মাধুর্য্য নগরবাসী নরনারীর নয়নমন মোহিত করিল।

ন্যায়রত্ন কিছুদিন যাবত বাড়ীতেই আছেন। গোবিন্দপুর ছাড়িয়া যাইতে মন নাই। নয়নমণির মন-ভুলানো আদর-স্নেহে আপনা-হারা হইয়া আছেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের অনুনয়ে ডাহাপাড়া হইতে শারদা ভট্টাচার্য্য মহাশয় ন্যায়রত্ন মহাশয়কে শীঘ্র আসিতে অনুরোধ করিয়া পত্র দিলেন। অগ্রজের আদেশে কর্ত্তব্যের অনুরোধে ন্যায়রত্ন অগত্যা যাত্রার দিন দেখিলেন।

নয়নমণি কণ্ঠহার পুত্ররত্নকে কতবার বুকে ধরিলেন। কতবার সে মুখের মধু আস্বাদন করিলেন। কতবার মাথায় গায়ে হাত বুলাইলেন। নয়নে কতবার চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বুকভরা তৃপ্তিহীন তৃষ্ণা লইয়া দীননাথ যাত্রা করিলেন। নৌকাখানি যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, পদ্মার তটে বন্ধুমণি ততক্ষণ তাকাইয়া থাকে। আড়াল হইতে লীলাশক্তি যেন বলিয়া দেয়—'দেখ, প্রাণ ভরিয়া দেখ, বাবাকে আর দেখিবে না।'

পিতৃ-বিয়োগ

"ন্যায়রত্ন দীননাথ স্নেহখনি বন্ধু"

—বন্ধুস্মরণ-মঙ্গল

আজ সকালবেলা বন্ধুসুন্দর নিদ্রা হইতে উঠে নাই। বড় দিদির সঙ্গে আজ আর ফুল তুলিতে যায় নাই। দিদি প্রাতঃ-কার্য্য সারিয়া জগৎকে ডাকিয়াছেন, জগৎ উঠে নাই। দিদি হাত ধরিয়া তুলিতে গেলেন। দিয়া দেখেন—জগৎ জাগিয়া আছে, কেবল কাঁদিতেছে। নয়নের জলে বালিসটি ভিজিয়া গিয়াছে। মুখখানি যেন ফুলিয়া গিয়াছে।

'কি রে জগৎ, কাঁদছিস্ কেন, কি হয়েছে রে?'—ব্যাকুল ভাবে দিদি সহস্রবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাহাতে জগতের কান্নাই বাড়িয়া যাইতেছে, উত্তর আসিতেছে না। বাড়ীশুদ্ধ লোক সবাই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভৈরবচন্দ্র জগৎকে কোলের কাছে লইয়া কত আদরে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলই নিষ্ফল। জগতের আজ আহার নাই, নিদ্রা নাই, খেলা নাই, পাঠশালায় যাওয়া নাই। জগতের এত চাঞ্চল্য, এত ক্রীড়া-কৌতুক আজ সব চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। চিকিৎসক আসিয়া দেখিল, কোনও ব্যাধি নাই। কি দুর্জ্ঞেয় কারণে এত কান্না, কেহ বুঝিতে পারে না। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন একই অবস্থায় কাটিল।

তৃতীয় দিনে ডাহাপাড়া হইতে সংবাদ আসিল—অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন (১২৭৫ বৈশাখ) দিনমণির অস্তগমনের সঙ্গে

পণ্ডিত দীননাথ ডাহাপাড়া আঁধার করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন। গোবিন্দপুরে যেন বজ্রপাত হইল। 'দীনবন্ধু' 'দীনবন্ধু' বলিয়া ভৈরবচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেবী দিগম্বরী 'কাকা' 'কাকা' বলিয়া হাহাকার করিতে করিতে বৃদ্ধ পিতাকে জড়াইয়া ধরিলেন। কথঞ্চিৎ সম্বিত পাইয়া ভৈরব আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। 'ওরে আমার লক্ষ্মণ ভাই রে, দাদার বিনা-আদেশে কোথায় গেলি'—বলিয়া আবার সংজ্ঞাহারা হইলেন।

দীননাথ পণ্ডিতের শোকে না কাঁদিয়াছে এমন লোক গোবিন্দপুর, জ্ঞানদীয়া বা কাফুরা-গ্রামে কেহই ছিল না। ঘরে গোপাল কাঁদিল, তারিণী কাঁদিল, প্রতাপ কাঁদিল, উর্ম্মিলা কাঁদিল। পাবনায় গোলোকমণি-প্রসন্নকুমার কাঁদিল। কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে! কাঁদিতে কাঁদিতে জগৎসুন্দরের হিক্কা উঠিয়া গেল। জগতের অবস্থা দেখিয়া ক্রমে সকলে শোক সংবরণ করিতে লাগিল। পুত্র-শোকে দশরথ কাঁদিয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। পুত্র-বিরহে নন্দরাজা কাঁদিয়া অন্ধ হইয়াছিলেন। বুঝি-বা আজ তাহারই বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া চলিতেছে।

> "মিশ্রের বিয়োগে প্রভু কাঁদিলা বিস্তর।
> দশরথ বিহনে যে হেন রঘুবর॥
> দুঃখ হয় এ সকল বিস্তারি কহিতে।
> বেদনা কাহিনী তাই কহিল সঙ্কেতে॥"
>
> —শ্রীবৃন্দাবন দাস

নূতন বস্ত্র আসিল। নূতন কাচা কটিতে। নূতন উত্তরীয়

শ্রীযুক্তেশ্বরী দিগম্বরী দেবী

শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ চক্রবর্ত্তী
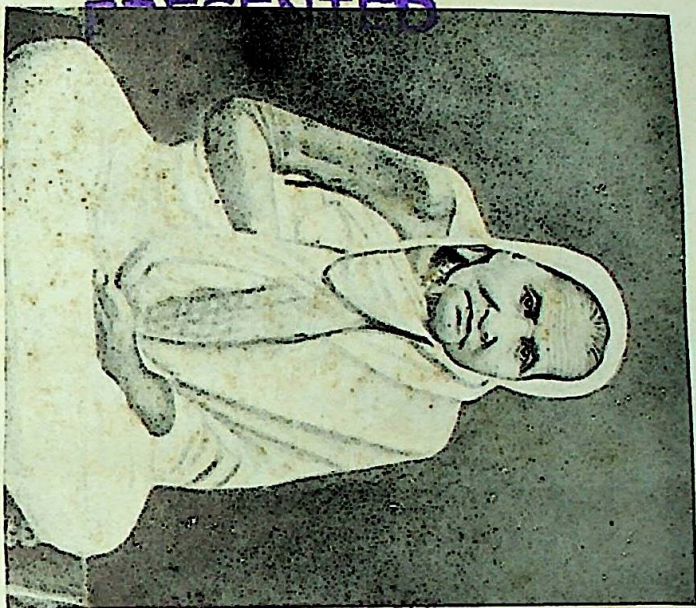
গলদেশে। বন্ধুসুন্দরের গুরুদশার বেশ হইল। যথাশাস্ত্র হবিষ্যান্ন-আহার ও ত্রিস্নানাদি চলিতে লাগিল। বালকের অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইলেন। শ্রাদ্ধের দিন বৈদিক অনুষ্ঠানাদি যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইল। পুরোহিতের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ মুণ্ডিত-মস্তক বালক-বন্ধু সমাধান করিল। কৃতবিদ্যের মত বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ভাবে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিল। পুরোজন, পরিজন, পুরোহিত, গুরু, আচার্য্য সকলে স্তম্ভিত হইয়া বালকের অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিলেন।

কেবল দিদি দিগম্বরী কিছুই অলৌকিক দেখিলেন না। দিদি শুধু ভাবিলেন—জগৎ তাহার বাবাকে কত গভীর ভাবেই না ভালবাসিত! তাহার পিতৃ-বিয়োগ-বেদনা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দীর্ঘ আট ঘণ্টাকাল একাসনে ধীর ভাবে বসিয়া রহিল। কি ঢল ঢল ব্যথা-ভরা চোখ দুইটি! ভাবিতে ভাবিতে দিদির মুখ-বুক চোখের জলে ভিজিয়া গেল। পিতৃ-মাতৃহারা বালকের মুখ চাহিয়া দিদি নিজ-অশ্রু নিজেই মুছিলেন।

ব্রাহ্মণকান্দা

বিপত্তি একা আসে না, দল বাঁধিয়া আসে। বৈশাখে ভৈরবচন্দ্র ভ্রাতৃরত্ন হারা হইয়াছেন। আষাঢ়ে পদ্মানদী ফুলিয়া উঠিয়া গোবিন্দপুরের দ্বিতীয় বাড়ীখানি গ্রাস করিতে আসি-তেছে। যায়-যায় অবস্থা। তাড়াতাড়ি দিশাহারা হইয়া ভৈরব সপরিবারে জ্ঞানদীয়া-গ্রামে পরমাত্মীয় রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। রামচন্দ্র নিজ-চণ্ডীমণ্ডপে ভৈরব-পরিবারকে স্থান দিলেন। শ্রাবণমাস হইতে ফাল্গুনমাস পর্য্যন্ত জগৎসুন্দর সকলের সঙ্গে এই স্থানেই বাস করেন।

কীর্ত্তিনাশিনী ভৈরবচন্দ্রের দ্বিতীয় বাড়ীও নিজ-গর্ভে আত্মসাৎ করিল। নূতন বাড়ীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। ফরিদপুর-সহরতলীর পশ্চিম-উপকণ্ঠে ব্রাহ্মণকান্দা-নামে গ্রাম। সেখানে নূতন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ক্রমে ঘর-দুয়ার তৈয়ারী হইল। বড় বসত-ঘর, মণ্ডপ, কাছারী, আট-চালা নির্ম্মিত হইল।

ফাল্গুনমাস। বাংলা সন বারশত পঁচাশি। আজ নন্দ-পরিবার যেন গোকুল ছাড়িয়া নন্দগ্রাম চলিয়াছেন! গোবিন্দ-পুরের এই ব্রাহ্মণ-পরিবার ব্রহ্মণ্যদেব জগদ্বন্ধুসুন্দরকে লইয়া যেন ব্রাহ্মণকান্দার নাম সার্থক করিতে চলিয়াছেন। গোবিন্দ-পুর ও জ্ঞানদীয়া-গ্রামের বহু পরিবার চক্রবর্ত্তীদের সঙ্গে বাড়ী ছাড়িয়া ব্রাহ্মণকান্দা চলিয়াছেন। কেহ কেহ-বা ব্রাহ্মণকান্দার নিকটবর্ত্তী বদরপুর-নামক গ্রামে বাড়ী করিলেন। গোবিন্দ-

পুর-গ্রাম যেন নিজ-গৌরবের যাহা-কিছু সবই ব্রাহ্মণকান্দা-গ্রামের হাতে দিয়া পদ্মাগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিল !

অনুজ দীননাথের অসহনীয় শোকেই ভৈরবচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তারপর বাড়ী-ভাঙ্গার আঘাতও কম নহে, ব্রাহ্মণকান্দার নূতন বাড়ীতে আসিয়া তিনি মাত্র সাত মাসকাল বাস করিলেন। আশ্বিনমাসের শুক্লা দ্বাদশী-তিথিতে সাক্ষাৎ সদাশিব-তুল্য ভৈরবের মহাপ্রয়াণ হইল। ব্রাহ্মণকান্দা শোকময় হইল। জ্যেষ্ঠ তাত জগৎ-ছাড়া জানিতেন না। জেঠা মহাশয়ের বিচ্ছেদ-বেদনায় জগৎসুন্দর গম্ভীর হইয়া গেল।

ভালবাসার কেন্দ্র

পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাঞ্চিত ভূষণ।
সদা কৃপা-স্নিগ্ধ দৃষ্টে জয় ভুষণ ভুষণ ॥"

—শ্রীসনাতন

পিতৃ-বিয়োগের পর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালচন্দ্র কনিষ্ঠ তারিণী চরণের সঙ্গে সংসারের দায়িত্ব মাথায় লইলেন। জগৎ দাদাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। কেবল দাদাদের নহে, বাড়ীর সকলেরই স্নেহ-ভালবাসার কেন্দ্রস্থল বন্ধুমণি। কেবল বাড়ীর নহে, গ্রামের সকলেরও। পুরুষ-নারী বালক-বৃদ্ধ সকলেরই নয়ন-তারা জগৎ। কেবল মানুষের নহে, কুকুর, বিড়াল, গাভী প্রভৃতি প্রাণীদেরও জগৎচাঁদ স্নেহ-আদরের কেন্দ্র। তাহার সুসৌন্দর্য্যের আকর্ষণে সকলেই মুগ্ধ।

বাড়ীতে দুইটি কুকুর। বন্ধুর কুকুরের নাম ওচ্‌মান'। নিস্তারিণীর কুকুরের নাম 'ধলী'। কুকুর-দুইটি বন্ধুর উচ্ছিষ্ট-ছাড়া খাইবে না; না খাইয়া থাকিলেও, খাইবে না; জগৎসুন্দরের ভুক্তাবশেষ তাহাদের চাই-ই। তাহারা বাড়ী হইতে কোথায়ও যাইবে না। গেলে, জগতের সঙ্গেই যাইবে। আর সকল সময় তাহারই আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইবে। সে কি দৃশ্য! খাইতে খাইতে বন্ধুমণি থালা হইতে খাদ্যবস্তু ছুঁড়িয়া দিতেছে, দুইজনেই লেজ নাড়িয়া তাহা পরমানন্দে খাইতেছে; আর-কেহ দিলে খাইবে না। কাহারও সঙ্গে মারামারি নাই, অন্য কোনও অপরিচিত কুকুরের সঙ্গেও নহে। বন্ধু আর নিস্তারিণীর ভালবাসার মধ্যেও ঐ কুকুর-দুইটির একটা বিশেষ স্থান আছে।

নিস্তারিণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে—নলিয়া-জামালপুরের নিকটবর্ত্তী আলোকদিয়া-গ্রামে ভট্টাচার্য্য-বাড়ীতে। নিস্তারিণী এখন স্বামীর ঘর করেন। তাঁহার অভাবে জগৎসুন্দরের প্রাণটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তাই পত্র লেখা হইল। পত্রের খবর একটি মাত্র—'নিচু, আমার ওচ্‌মান তোর ধলীর তা' কে'ড়ে খায়। তোর ধলী ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চে'য়ে থাকে। যেন নিচুর প্রিয় কুকুর ধলীর পরাজয়ের কথা জানাইয়া নিচুকে ব্রাহ্মণকান্দার প্রতি আকৃষ্ট করা যাইবে—এই হইল পত্রের ব্যঞ্জনা। নিস্তারিণীও বন্ধুধনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। মাসের মধ্যে বিশটা বাজে প্রয়োজন দেখাইয়া শ্বশুর-বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে আসেন। বন্ধুর প্রতি প্রীতির এই প্রবলতা তাঁহার জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিল। বন্ধুর অঙ্গন-মাঝে

তাঁহার জীবন-লীলার সর্ব্বশেষ অঙ্কটি যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা আজও তাহার সাক্ষ্য দেন।

ধলীর দুঃখের খবর পাইয়া নিস্তারিণী আসিয়াছেন। বন্ধুসুন্দরের একপার্শ্বে নিস্তারিণী বসিয়াছেন। দুইজনে দুইজনের কুকুরের গায়ে হাত বুলাইতেছেন। আবার বদলাইয়া লইতেছেন। গুচ্‌মান আর ধলী লেজ নাড়িয়া পদলেহন করিতেছে; আবার গলা উঁচু করিয়া মুখারবিন্দ দেখিতেছে; আর কত অর্থপূর্ণ ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রাণের অস্ফুট আর্ত্তিকে ভাষা দিতেছে।

বাড়ীর ভৃত্যদের নাম 'পেনা' আর 'সোনা'। জগৎ তাহাই ডাকে। একজন পরিচারিকাকে জগৎ ডাকে-'কেচুর পিসী।' জগৎ ইহাদের পরম স্নেহের ধন। বাড়ীতে অনেকগুলি গাভী আছে। জগৎসুন্দরের মনোমতই তাহাদের নামকরণ। কাহারও নাম 'গঙ্গা', কাহারও নাম 'যমুনা', কাহারও নাম 'গোদাবরী'। গোমাতাদের বন্ধুর প্রতি যে আকর্ষণ তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। বন্ধুসুন্দর নিকটে গেলেই গাভীরা সব পুলকিত হইয়া সে-বরাঙ্গ লেহন করিতে আরম্ভ করে। বন্ধুসুন্দর যখন গঙ্গা-নাম্নী গো-মাতার গায়ে হাত বুলায়, তখন তাহার স্তন্য হইতে বিন্দু বিন্দু দুগ্ধ ক্ষরণ হয়। দোহন করিবার জন্য বন্ধু তাহাদের স্তন্যে শ্রীহস্ত স্পর্শ করিলে, তাহারা আনন্দে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। দেখিয়া মহাজনের কথা মনে পড়ে

"দোহন মোহন, না যায় কথন,
আনন্দে আকুল গাই।"

বন্ধুসুন্দর দূর হইতে নাম ধরিয়া ডাক দিলে, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি তাহারা উৎকর্ণ হইয়া ছুটিয়া আসে। পলকহীন চোখে তাহারা তাকাইয়া থাকে। ঘন ঘন হাম্বা-হাম্বা-রবে কি যেন কথা কয়। কেবল চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পালিতা গাভীরাই নহে, যে কোনও বাড়ীর যে কোনও গাভী বন্ধুসুন্দরকে দেখিলেই আনন্দে অধীর হইয়া যায়, অঙ্গ চাটিতে আরম্ভ করে। বন্ধু 'আয় আয়' বলিয়া ডাকে; কখনও 'গোবিন্দ,' 'গোবিন্দ' বলিয়া ডাকে। সে-ডাক শুনিলে কোনও গাভীই নিকটে না আসিয়া পারে না; বন্ধুসুন্দরেরও গাভী দেখিলেই কেমন যেন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হয়। বন্ধুগোপালের এই গোধন-মোহন-ভাব-স্বরূপ অনেক ভাগ্যবানই দর্শন করিয়াছেন।

ক্ষীরোদার বর

ব্রাহ্মণকান্দা চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে আজ সকালবেলা হইতে শানাই বাজিতেছে। দিগম্বরী দেবীর একমাত্র কন্যা ক্ষীরোদার শুভ বিবাহ। কলিকাতার বর, বি. এ.-পাশ-করা। কত বরযাত্রী আসিয়াছেন। কত আত্মীয়-স্বজন আসিয়া বাড়ী ভরিয়াছে। ইহাছাড়া রবাহুত কত নরনারী আসিয়াছে। জামাই দেখিতেই সকলের বেশী আগ্রহ। জামাই-এর রূপ-গুণ দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতেছে। জামাতা বি. এ.-পাশ বলিলেই সব বলা হয় না,—ইংরেজী, সংস্কৃত, অঙ্ক তিনটি বিষয়েই সম্মানের সহিত

(অনার্সে) উত্তীর্ণ; খ্যাতনামা অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ গৌরীশঙ্করবাবুর প্রিয়তম ছাত্র।

জামাইকে দেখিতে যেমন কৌতুহলী বহু নরনারী জড়ো হইতেছে, জামাইও তেমনি বিশেষ কৌতুহলের সহিত লোকজন-দিগকে দেখিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের গণ্ডগ্রামের লোকজনের চলা-ফিরা কথাবার্ত্তা সবই জামাইবাবুর নিকট অদ্ভুত ঠেকিতেছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা জামাই-এর সঙ্গে নানাপ্রকার রহস্যালাপ ও ঠাট্টা-তামাসা করিতেছে।

ছোট মামা-শ্বশুরটির সঙ্গে জামাইবাবুর পরিচয় হইল। জামাইবাবুর তাম্রকূট-সেবনের অভ্যাস আছে। জামাই বলিলেন—'শ্বশুর, এক ছিলুম তামাক সাজিয়া আনো।' কথাটা শুনিয়াই জগৎসুন্দর মুখখানা গম্ভীর করিয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই ছুটিয়া আসিয়া জামাইবাবুর কানের কাছে কি যেন একটা কথা টুক্ করিয়া বলিল। বলিয়াই চলিয়া গেল। জামাইবাবু হতভম্বের মত চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার জীবনের এমন একটা গোপন তথ্য জগৎসুন্দর তাঁহার কানে কহিয়াছে, যাহা তিনি নিজে ছাড়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কাহারও জানিবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। জামাইবাবু ভাবিলেন—'এ কি! এই বালক কি অন্তর্য্যামী!'

ক্রমে, জগৎসুন্দরের রূপের লাবণ্য, স্বভাবের সারল্য, ব্যবহারের মাধুর্য্য সকলই জামাইবাবুর কাছে অভিনব মনে হইতে লাগিল। কি যেন এক অজানা আকর্ষণে জগৎসুন্দরের প্রতি তাঁহার মন-প্রাণ আকৃষ্ট হইল। শুভ বিবাহের যাবতীয়

কার্য্য সমাপন হইল। বধূ ক্ষীরোদাসুন্দরীকে লইয়া বর কলিকাতা মদনমিত্রের লেনে নিজ-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। গিয়াও, শয়নে-স্বপনে তাঁহার মনটা থাকিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল সেই ছোট মামা-শ্বশুরটির কথা। কি দেখিলাম! এ যে সে-ই, যাঁহার "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর!" জামাইবাবু জানেন না যে, আজ যাঁহার রূপ নয়নে লাগিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারই কৃপা-আজ্ঞা তাঁহার শিরের ভূষণ হইবে, আর তাহাই তাঁহাকে জন্মের মত পথের ফকির করিবে।

ক্ষীরোদাসুন্দরীর বরটির নাম শ্রীঅতুলচন্দ্র চম্পটী। তাঁহার জ্ঞানগঙ্গা-ছলছল হৃদয়টি ভক্তি-যমুনার সঙ্গে কবে মিলিবে, শুধু যেন তাহার অপেক্ষাতেই আছে। মিলিলেই, আমরা সে প্রয়াগ-সঙ্গমে তীর্থ করিতে যাইব—অবধূত চম্পটীকে রাজপথে দেখিব। দেখিব, বেহাল বেশে পথে পথে নাচিয়া কাঁদিয়া হাসিয়া লুটাইয়া সে অবধূত 'হরি-হরি বোল' বলিয়া বেড়াইতেছে।

বিদ্যার্থী বন্ধু

"ফরিদপুর-বিদ্যালয়-সুকুমার বন্ধু।
জেলাস্কুলে বালারুণ-তেজাধার বন্ধু ॥"

—বন্ধুস্মরণ-মঙ্গল

গোবিন্দপুরে দুর্গাচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে হাতে-খড়ি—বিদ্যারম্ভ। পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালায় পড়া শেষ হইতে না হইতেই বাড়ী ভাঙা ও ব্রাহ্মণকান্দায় আসা। ব্রাহ্মণকান্দায় আসিয়াই পাঠ আরম্ভ হইয়াছে ঈশ্বর মাষ্টারের পাঠশালায়। পাঠশালার পড়া শেষ হইলে, দাদা গোপালচন্দ্র ভাবিলেন—ফরিদপুরের ইংরেজী-স্কুল ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ী হইতে অনেকটা দূর; এতটা পথ পায়ে হাঁটিয়া স্কুলে যাওয়া জগতের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইবে। তাই তিনি ভাইকে অন্য কোথায়ও রাখিয়া পড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নদীয়া-জেলার আলমপুর-গ্রামের লাহিড়ীরা চক্রবর্ত্তীদের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়। গোপাল তাঁহাদের সঙ্গে পত্রের আদান-প্রদান করিয়া জগৎকে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। আলমপুর-স্কুলে বন্ধুসুন্দরের পড়া আরম্ভ হইল। এদিকে স্নেহধন জগতের অভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবী-দিগম্বরীর নয়ন অন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। জগদ্বন্ধু ধ্যান, জগদ্বন্ধু জ্ঞান, দিবারাত্র জগতের কথা দিগম্বরীর জপমালা। আহার গেল, নিদ্রা গেল, কাজকর্ম্ম সকলই বন্ধ হইল। খোলা রহিল কেবল দুর্ভাবনায় ব্যাকুল দুইটি চক্ষুর অশ্রুসিক্ত দুয়ার।

তারিণীচরণ অগ্রজ গোপালচন্দ্রকে কহিলেন—'দাদা, বড়-দিদির যে-অবস্থা তাহাতে জগৎকে দূরে রাখা যাইবে না! আর দিদিকে কি বলিব, জগৎ-ছাড়া এ গ্রাম অন্ধকার, সকলেই বলে। জগৎ গিয়াছে অবধি এ বাড়ীটা আমার কাছে খাঁ খাঁ করিতেছে।' তারিণীচরণ দাদাকে আরও বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

'আপনি ভাবিতেছেন, জগৎ একা একা ব্রাহ্মণকান্দা হইতে ফরিদপুর—স্কুলে কি করিয়া যাইবে? আপনি একটু খোঁজ লইলেই জানিতে পারিবেন—দত্ত-বাড়ীর গদাধর, মিত্র-বাড়ীর নিবারণ, দাসদের বাড়ীর বিহারী—তাহারাও এখান হইতেই স্কুলে যায়। জগৎ তাহাদের সঙ্গে যাইবে। তাহারা জগৎকে খুব ভালবাসে। ইহা ছাড়া জ্ঞানদীয়ার বিশ্বাস-বাড়ীও পদ্মায় ভাঙ্গিয়াছে, তাহা বোধ হয় জানেন। বিশ্বাস মহাশয়েরা বদরপুরে বাড়ী করিয়াছেন। বিশ্বাসদের বকুলাল জগতকে ছেলেবেলা হইতে ভালবাসে। ইহাদের সাথে একসঙ্গে স্কুলে যাইতে জগতের আনন্দই হইবে।'

গোপালচন্দ্র ছোট ভাইয়ের কথার যুক্তিযুক্ততা বুঝিলেন। বিশেষভাবে বড়দিদির অবস্থা চিন্তা করিয়া তিনি জগতসুন্দরকে পুনরায় ব্রাহ্মণকান্দায় ফিরাইয়া আনিলেন এবং ফরিদপুর-মধ্যইংরেজী-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এই স্কুলকে লোকে বাংলা-স্কুল বলিত। বার-শত-সাতাশি সন হইতে তিন বৎসর ক্লাস থ্রি, ফোর্ ও ফাইভ্ এই বিদ্যালয়েই বন্ধুসুন্দরের পড়া হয়।

বন্ধুসুন্দরের চলিয়া আসার দরুণ আলমপুরের লাহিড়ী

বাড়ীর সকলে ও স্কুলের শিক্ষকেরা ব্যথিত হইলেন। অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁহারা তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। যাঁহার সঙ্গে জীবের ভালবাসা স্বতঃ ও স্বাভাবিক, তাঁহাকে ভালবাসিতে সময় লাগিবে কেন ?

স্কুলের পথ সুদীর্ঘ তিন মাইল, ব্রাহ্মণকান্দা হইতে ফরিদপুর সহরের প্রান্তে। সঙ্গী গদাধর, নিবারণ, বকুলাল। ক্রমে আরও দুই-একটি প্রিয় সঙ্গী জুটিল—রমেশ চক্রবর্ত্তী ও জলধর ঘোষ। রমেশচন্দ্রের পিতার নাম ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী। বাড়ী পাবনা-জেলায় ভারাঙ্গা-গ্রামে। ঈশ্বরচন্দ্র কার্য্যানুরোধে ফরিদপুরেই থাকিতেন। ভৈরবচন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। ভৈরব অনেক সময়ে বন্ধুগোপালকে কোলে লইয়া ঈশ্বরচন্দ্রের বাসায় যাইতেন। রমেশচন্দ্রের মাতা মোক্ষদা দেবী বন্ধুসুন্দরকে কোলে লইয়া কত আদর করিতেন, চাঁদ-কপালে টীপ পরাইতেন, কখনও-বা দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইতেন। অতএব রমেশচন্দ্রকে বন্ধুসুন্দরের শৈশবের সঙ্গী বলা যায়। আজ আবার সেই শৈশবের সঙ্গীর সঙ্গে স্কুলে দেখা-সাক্ষাৎ। দুইজনে এক শ্রেণীরই ছাত্র। বন্ধুর রূপে, গুণে ও স্নেহে রমেশ মুগ্ধ। রমেশকে আজ কে বলিয়া দিবে যে, একদিন এই সঙ্গীটির মর্ম্মস্পর্শী আকর্ষণে তাহার অনাঘ্রাত জীবন-কুসুমটি তাঁহারই চরণে অঞ্জলি দিতে হইবে !

জলধর ঘোষের বাড়ী পাবনা-জেলায়। তাহার বাবার একটি দোকান ছিল ফরিদপুরের বাজারে। দোকানে দধি-দুগ্ধ-ঘৃত বিক্রয় হইত। জলধর বাবার দোকানে থাকিয়াই

স্কুলে যাইত। ছেলেটি বড় ভাল। দেখিতে সুশ্রী, বর্ণটি গৌর, সুগঠিত দেহ, বিশুদ্ধ চরিত্র। সহাধ্যায়ী জগদ্বন্ধুর আদরের পাত্র। জগত বলিতে সে অজ্ঞান। জলধরকে বন্ধুসুন্দর আদর করিয়া ডাকে 'জলা' তাহার গায়ের রঙ্ ফর্সা, তাই কখনও-বা ডাকে 'ধলা।' তাহার গলায় আছে তুলসীর মালা, তাই কখনও কৌতুক-প্রিয়ের আদর-মাখা ডাক শোনা যায়—'ধলা বৈরিগী।' বন্ধুসুন্দরের ভঙ্গীময় প্রত্যেকটি ডাকে ও কথায় জলধরের প্রাণ আনন্দে ডগমগ করে। নিবারণ, গদাধর, বকুলাল, রমেশচন্দ্র, জলধর প্রমুখ সঙ্গিগণের কথা ভাবিলে শ্রীশুকের ভাষা মুখে আসে—

"ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যংগতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥"

স্কুলের ছুটির পর জলধরের বাবার দোকান বন্ধুসুন্দরের প্রিয় সঙ্গীদের কলরবে মুখরিত। জলধরের বাবা বন্ধুসুন্দরকে ভালবাসেন। অন্যান্য সঙ্গীদিগকেও জলধরের সমদৃষ্টিতে দেখেন। সবাইকে আদর করিয়া ক্ষীর-সর-মাখন-সন্দেশ খাইতে দেন। নানা ক্রীড়া-কৌতুক-তৎপর হইয়া সবাই বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে জলধরের বাবার আদরে-দেওয়া জলখাবার খায়। সে ক্রীড়া-কৌতুক, সে ভোজনানন্দের তুলনা বৃন্দাবনে যমুনার পুলিন-ছাড়া আর কোথায় মিলিবে!

স্কুলের পথে

"পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ ॥"

—শ্রীশুকদেব

যশোহর রোড্ দিয়া পূর্ব্বমুখে চলিয়াছে একটি বিদ্যার্থী বালক। তাহার গায়ে সাদা কাপড়, বগলে বই খাতা, কাছাটি মাটি দিয়া ছেচ্‌রাইয়া চলিতেছে। পিছন হইতে কেহ ডাকিল—'ওহে লম্বকচ্ছ!' উত্তর নাই, কেবল চাঁদমুখে একটু হাসি। আবার কেহ ডাকিল—'ওহে লম্বকর্ণ!' উত্তর নাই, শুধু একটু আড়-চোখে চাওয়া। বিদ্যার্থী রাজপথের মাঝখান দিয়া চলিতেছে না, একটা ধার ঘেঁসিয়া যাইতেছে। পথে সে একবার যাহার চক্ষে পড়ে, সে-ই থমকিয়া দাঁড়ায়; আবার চলিতে চাহে, কিন্তু ফিরিয়া ফিরিয়া দেখে। পূর্ব্বে কতবার দেখিয়াছে, তবু যেন ছেলেটিকে দেখিয়া সাধ মিটে না। কি রূপ রে!

কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে শ্রীমুখখানির দিকে, সে দেখিতেছে নবোদিত শারদীয় শশী। তাই দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইতেছে সে, আর কিছুই দেখা হইল না;—চক্ষু-দুইটি চুরি গেল। কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে শ্রীহস্তের অঙ্গুলি কয়েকটির দিকে। সে দেখিতেছে কয়েকটি স্বর্ণ চাঁপার কলিকা, আর তাহাদের উপর দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মত নখশ্রেণী খচিত। তাহাই দেখিতে দেখিতে সে চলিয়া যাইতেছে, আর কিছুই দেখা হইল না; মনে কত প্রশ্ন ছিল, জিজ্ঞাসা করা হইল না; পরিচয়টিও জানা হইল না। কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে, শ্রীচরণের

দিকে। সে দেখিতেছে, তুইটি রক্তপদ্ম নাচিয়া যাইতেছে, চারিদিকে তাহার ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহার আর কিছু দেখা হইল না। চক্ষু ফিরাইবার উপায় থাকিলে তো দেখিবে? যদি কাহারও পরম ভাগ্যে সে-মধুর হাসিটি দেখা ঘটিতেছে, সে দেখিতেছে—বিম্বফলের মত রাঙা ওষ্ঠ-তুইটির মধ্যে মুক্তমালা সদৃশ দন্তপাঁতি, আর তাহার উপরে তুইটি প্রাণ-মনোহারী টানা টানা চোখ! তাহার তো আর চলিয়া যাওয়ার উপায় রহিতেছে না। সে পথের মধ্যে একটা স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়াই থাকে।

ইহা কবির কাব্যোক্তি নহে। যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই বর্ত্তমান। ইহার জন্য হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খৃষ্টান ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে ভিন্ন মত নাই। বিত্থার্থী স্কুলগৃহে প্রবেশ করিতেছে। ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই দৃষ্টি ঐ একদিকে। অঙ্গে কি লাবণ্যের ছটা! চলনের কি মনোহারী ভঙ্গি! যে-দিক হইতে যে দেখিতেছে সে-ই গ্রীবা বাড়াইয়া দিতেছে, চক্ষু বিস্ফারিত করিতেছে। শতবার যে দেখিয়াছে সে-ও অনিমিষ নয়নে তাকাইয়া রহিতেছে।

বিত্থার্থী কাহারও দিকে তাকাইতেছে না। পাঠকক্ষে প্রবেশ করিয়া সকলের শেষে শেষ-বেঞ্চের শেষ স্থানটিতে বসিতেছে—ধীর শান্ত গম্ভীর; মধুর সারল্যমাখা দৃষ্টি, ঢল ঢল নয়ন, কাহারও সঙ্গে কথাটি নাই। মধুকণ্ঠের প্রাণমাতানো একটি কথা শোনার জন্য সকলেই ইচ্ছুক। নিতান্ত প্রয়োজনে তুই একটি কথা-মাত্র শ্রীমুখে উচ্চারিত হইতেছে। যে শুনিতেছে, তাহারই শ্রবণ জুড়াইতেছে।

জলধর চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, আর ভাবিতেছে—'ওঃ, জগতের কি ভয়ানক গম্ভীরতা! আমাদের দোকানে গিয়া তো কত কৌতুকের কথা বলে। এখন তা বুঝিবার জো-টি নাই।' সত্যসত্যই নববিদ্যার্থীর নবায়মান সৌন্দর্য্যের মধ্যে চাপল্য ও গাম্ভীর্য্যের একটা মিলন-মাধুরী মূর্ত্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে। আর তাহারই মধ্যে লুকাইয়া আছে একটা সর্ব্বলোকাকর্ষী মাদকতা।

উপনয়ন-সংস্কার

"হাতে দণ্ড কাঁধে ঝুলি গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব্ব-সেবকের ঘর॥"

—শ্রীবৃন্দাবন দাস

আজ প্রাতঃসূর্য্য পূর্ব্বাকাশে সোনালী আলো ঢালিয়া দিয়াই শুনিতেছে, চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর সদর দরজায় শানাইতে ভৈরব-রাগিণী আলাপ হইতেছে। ঢোল, কাঁশি, নাগরা প্রভৃতি নানা ছন্দের বাদ্যের ঢংয়ে ব্রাহ্মণকান্দা-গ্রাম প্রতিধ্বনিত। নরনারীর গতায়াতে পথ-ঘাট পরিপূরিত।

আজ জগদ্বন্ধুসুন্দরের উপনয়ন। বঙ্গীয় বার শত একোন-নবতি সাল। চারিদিকে আনন্দ-ধ্বনি উঠিতেছে। মন্দিরে যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িতেছে। সাক্ষাৎ-ব্রহ্মপুরুষের কর্ণমূলে ব্রহ্ম-গায়ত্রী উচ্চারিত হইতেছে। মুণ্ডিত মস্তকটি সবিতার 'বরেণ্য ভর্গঃ' বিকীর্ণ করিতেছে। অরুণ-বসন ভেদ করিয়া

তনুচ্ছটা বাহির হইতেছে। তাহা সকল নরনারীর মন-বুদ্ধি প্রচোদিত করিতেছে। কণ্ঠে নব যজ্ঞসূত্র দোলাইয়া নবীন ব্রহ্মচারী দণ্ড-হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। মনে হইল, গায়ত্রী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া আপন বল্লভের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিতেছে। বৈদিক অনুষ্ঠানাদি যথাবিধি নিষ্পন্ন হইয়া গেল। নবীন তাপসের নবীন রূপ দেখিয়া ব্রাহ্মণকান্দা-বাসী নরনারী উন্মনা হইল। সর্ব্বত্র সকলের মুখে একই কথা। চণ্ডী-মণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া, তাম্রকূটের ধূম্র উড়াইতে উড়াইতে, গ্রামের বৃদ্ধের দল সিদ্ধান্ত করিলেন—পণ্ডিত ন্যায়রত্নের এই ছেলে নিশ্চয়ই শাপভ্রষ্ট দেবতা।

উপনয়ন-সংস্কারের পর হইতেই বন্ধুসুন্দরের পরিনিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যানুকূল যাবতীয় নিখুঁত আচরণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সাত্ত্বিক বেশ-ভূষা; সাত্ত্বিক আহার-বিহার নারায়ণকে নিবেদন করিয়া আহার্য্য-গ্রহণ; স্থির আসনে গায়ত্রী-জপ; যথারীতি পূজা-আহ্নিক ও সন্ধ্যা-বন্দনা। মাথার কেশ ছোট। স্বচ্ছ শুভ্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, স্নান-শৌচাদি অতি কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিভাবে আরম্ভ হইল।

পড়াশুনার দিকে মনোনিবেশ কমিতেছে। নির্জ্জনে একাকী বসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিবার অভ্যাস বাড়িতেছে। গভীর রাত্রি। জগদ্বন্ধু ঘরে নাই। কোথায় গেল, উদ্‌ভ্রান্তের মত দিগম্বরীদেবী গোপাল ও তারিণীকে লইয়া এদিক ওদিক খোঁজ করিতেছেন। শেষে দেখা গেল—বেলতলায় উর্দ্ধনেত্রে

বসিয়া আছে। কোনও দিন বা রাত্রে খোঁজই পাওয়া গেল না। দিদি সারারাত্র দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাটাইলেন। উষাকালে জগৎ আসিতেছে। 'জগত কোথায় গিয়াছিলে, রাত্রে কোথায় ছিলে ? শরীর ভাল আছে ত ?'—এই রকম শত প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর কোথায় ?—যেন কথা কানেই যাইতেছে না, মন যেন মনেই নাই। পড়ার ঘরে বই হাতে করিয়া জগৎ চক্ষু বুজিয়া বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে। দিদি কান পাতিয়া গান শুনিতেছেন—

"সংসার-বাসনা মোর কিছু মনে নাই।
আমায় ডোর-কৌপীন দেও ভারতী গোসাঞি ॥"

কাজের কথা

বন্ধুসুন্দরের উপনয়নের সময়ে বাড়ীতে কত আত্মীয়-স্বজন আসিয়াছেন। আলোকদিয়া হইতে নিস্তারিণী দেবীও আসিয়াছেন। নিস্তারিণী দিদি-দিগম্বরীর সঙ্গে গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা আছেন। এমন সময় জগতের পড়ার ঘর হইতে মধুর কণ্ঠের একটি ডাক আসিল—'নিচু!' দেবী শুনিলেন জগৎ ডাকিতেছে। আদর-মাখা ডাকে প্রাণ গলিয়া গিয়াছে। তবু বাহিরে বলিতেছেন—'কে, জগৎ ডাকিস্ ? কেন রে ?' মধুরতর স্বরে উত্তর আসিল—'নিচু, আমার কাছে আয়।' দেবীর হাতে কাজ, কিন্তু মন তো চলিয়া গিয়াছে। যাহার কাছে যাওয়ার জন্য আসা-যাওয়া এ-যে তাঁহারই ডাক। দেবীর হাতের কাজে আর বিন্দুমাত্র মন নাই। তবু মুখে বলিতেছেন—'আমি এখন যাইতে পারিব না, আমার কাজ আছে।'

গম্ভীর কণ্ঠে গৃহমধ্য হইতে জবাব আসিল—'ওসব অকাজ, আমার কাছে এ'সে কাজের কথা শোন্।' নিস্তারিণীর এবার আর নিজেকে ধরিয়া রাখার সামর্থ্য রহিল না। দরজার কাছ পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—'তুই কে যে তোর কাছে এ'সে কাজের কথা শুন্‌তে হবে?' বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখ হইতে সুগম্ভীর ভাব ও মধুর স্বর-সমন্বিত একটি কথা যেন অতর্কিতে বাহির হইয়া পড়িল—'আমি সেই গৌরাঙ্গ।' কিছু চিন্তা না করিয়াই নিস্তারিণী বলিয়া ফেলিলেন—'যাঃ,আমার বিশ্বাস হয় না।' স্নিগ্ধ-কোমল ঝঙ্কারে মৃদু মধুকণ্ঠে প্রতিধ্বনির মত উত্তরটি ধ্বনিত হইল—'পরে জান্‌বি।'

পরবর্ত্তী জীবনে সদা 'জগদ্বন্ধু-জগদ্বন্ধু জপ-পরায়ণা বয়োবৃদ্ধা দেবী নিস্তারিণীকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিশ্বাস করিয়াছেন যে, এই 'পরে জানার' শুভ দিন সত্যসত্যই একদিন তাঁহার জীবনাকাশে উদয় হইয়াছিল।

স্বতন্ত্রতা

গোপালের ও তারিণীর বিবাহ দেওয়ার জন্য দিদি-দিগম্বরী ব্যস্ত হইয়াছেন। নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে। কথা-বার্ত্তা চলিতেছে। বহরমপুর-গ্রাম হইতে গোপালের একটা ভাল সম্বন্ধ আসিয়াছে। আত্মীয়-স্বজনেরা কন্যা দেখিতে যাইতেছে। বড় দিদির ইচ্ছা জগৎও সঙ্গে যায়, মেয়ে দেখিয়া আসে। দিদি বলিলেন—'জগৎ, তুইও সঙ্গে যা।' দিদির আদেশানুসারে জগৎসুন্দর দাদার ভাবী বধূ দেখিতে গেল।

ফিরিয়া আসিলে, দিদি আগেই জগৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি রে জগৎ, মেয়ে কেমন দেখলি ?' জগৎ কহিল—'খুব ভাল।' 'মুখখানা কেমন ?—সুশ্রী তো ?'—দিদির এই প্রশ্নে বন্ধুসুন্দর সরল শিশুর মত উত্তর দিল—'বাঃ রে তা কি ক'রে বলব ! আমি কি মুখ দেখেছি ?' এই কথা শুনিয়া গ্রামের বৃদ্ধারা হাসিয়া অস্থির। সবাই দিগম্বরীকে বলিলেন—'ভাইটিকে বেশ বউ দেখিতে পাঠিয়েছ ; খুব দেখেছে।'

গোপাল ও তারিণী উভয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দুইটি নব বধূ ঘরে আসিয়াছে। বড় দিদি জগৎকে বলিলেন—'জগৎ, বৌদিদিদিগকে প্রণাম কর্।' বন্ধুসুন্দর একখানা বাঁশের লম্বা চটা লইয়া আসিল। সকলে তাকাইয়া রহিল। চটাখানা দূর হইতে বৌদিদিদের পায়ে ঠেকাইয়া, রঙ্গলাল বন্ধুসুন্দর সেই চটার অগ্রভাগে নিজ হস্ত স্পর্শ করিয়া আপন মস্তকে সেই হাত ঠেকাইল। এই হইল প্রণাম ! এই অভিনব প্রণামের ভঙ্গী দেখিয়া বাড়ী-শুদ্ধ লোক হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল।

দিদি-দিগম্বরী স্নেহের ভাইটিকে সম্বন্ধ-জ্ঞান শিখাইয়া দিয়া বলিলেন—'জগৎ, বড়-বৌকে বড়-বৌদিদি ও মেজ-বৌকে মেজ-বৌদিদি বলিয়া ডাকিও।' দিদির কথা বন্ধুসুন্দরের কর্ণ-গোচর হইল, কিন্তু ডাকিবার কালে সে এক নূতন সম্বোধন আবিষ্কার করিল। উভয় বৌদিদির পিতৃকুলের পরিচয় জগৎ-সুন্দরের জানা ছিল। অধিকারী-বংশের কন্যা বড়-বৌকে জগৎ ডাকিল—'অধিকারী-ভায়া ; আর বাগচি-বংশের কন্যা মেজ-বৌকে জগৎ ডাকিল—'বাগচি-ভায়া।' এই অত্যদ্ভূত ঢঙ্গের

ডাক শুনিয়া বৌদিদিরা হাসিয়া গলিয়া পড়িলেন। যে শুনিল সে-ই হাসিল। বন্ধুসুন্দরের স্বতন্ত্রতার সঙ্গে এই রসিকতার মিলন নিরুপম।

নূতন বউঠাকুরাণীরা তাঁহাদের এই অদ্ভুত দেবরকে লইয়া হাস্য-কৌতুক করেন। দেবরও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া পদ্মপত্রের জলের মত রঙ্গ-রসের কথায় যোগ দেয়। পার্থিব সম্বন্ধ গোলোকের পবিত্র ভূমিকায় উঠিয়া অনাবিল প্রীতিকে মূর্ত্তি দান করে। বন্ধুসুন্দরের শুচি, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সন্ধ্যাবন্দনায় অনুরক্তি দেখিয়া বৌদিদিদের প্রাণ ভক্তিতে ভরিয়া উঠে। আবার, তাহার আদর-মাখা মধুর মধুর কথা শুনিয়া তাঁহাদের বুকে স্নেহমধু উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে।

সকালে পুকুরের-ঘাটে মুখ ধুইতে গিয়া নব বধূরা ঘোম্‌টা খুলিয়া তাকাইয়া দেখিতেছে, তাঁহাদের দেবর পদ্মাসনে জলে ভাসিতেছে—ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড সোনার পদ্ম! আসন ছাড়িয়া সে যখন সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করে, তখন তাঁহাদের মনে হয় ঘন বিজুরী জলের উপর ঢেউ খেলিতেছে! স্নান করিয়া অ-ঘাট দিয়া তীরে উঠিয়া যখন সে গাত্র-মার্জ্জন করে, তখন তাঁহাদের মনে হয় প্রভাত-সূর্য্য সোণালী কিরণ ছড়াইয়া তাঁহাদের পুকুর-পারেই উদয় হইয়াছে! তাঁহারা নির্নিমেষে দেখেন, সরিয়া গিয়া গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখেন। তাঁহারা জানেন, কেহ দেখিতেছে টের পাইলে সে অমনি জলের নীচে গিয়া বহু সময় লুকাইয়া থাকিবে। তাঁহারা আপনা-হারা হইয়া পড়েন, কাজকর্ম্ম ভুল হইয়া যায়। দিদি

দিগম্বরী বউদের ডাকিতে আসিয়া দূর হইতে সেই রূপের ঝলক-দর্শনে স্তম্ভদশা প্রাপ্ত হন; তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। পুকুর-পারে এমন ঘটনা দিনের পর দিন ঘটে।

গোলোকমণির দর্শন

"ইতি সংচিন্ত্য ভগবান মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস স্বংলোকং গোপানাং তমসঃপরং॥"

—শ্রীশুকদেব

ভাইদের বিবাহের সময় পাবনা হইতে দেবী গোলোকমণি স্বামীর সঙ্গে ব্রাহ্মণকান্দা আসিয়াছেন। বিবাহের পরেও কিছুদিন বাপের বাড়ীতে আছেন। বেশী তো আসা হয় না, অনেক বৎসর পরে এই আসা। দাদা, দিদি ও নব ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রসন্নকুমার ও গোলোকমণির দিনগুলি আনন্দেই কাটিতেছে।

গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-বাড়ী বিবাহ। বিবাহের পরদিন নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে পত্নীসহ প্রসন্নকুমার জগৎসুন্দরকে সঙ্গে লইয়া সেই বাড়ীতে গিয়াছেন। বিবাহ-বাড়ীর নানা গল্প-গুজব কথাবার্ত্তায় আহারে দেরী হইয়া গিয়াছে। ফিরিতে ফিরিতে দিবা-শেষ। রক্তিমাভ পশ্চিম-গগন তখন সন্ধ্যার আগমন জানাইতেছে। বিহগ-কাকলীতে মুখর কানন ক্রমে নীরব হইতেছে। ক্লান্ত রাখাল শ্রান্ত ধেনু লইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। প্রসন্নকুমার, গোলোকমণি ও জগদ্বন্ধুসুন্দর সোজা বনপথ দিয়া বাড়ী-মুখে আসিতেছেন।

কুলবধূগণ চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পুকুরের ঘাট হইতে জলের কলসী কাঁখে লইয়া সারি দিয়া বাড়ী যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গোলোকমণির বাল্য-সঙ্গিনী—জ্ঞানদীয়া-গোবিন্দপুরের লোক। কতকাল পরে দেখা! তাহাদের সঙ্গে দুই চারি কথা আলাপ করিতে করিতে গোলোকমণির আরও দেরী হইয়া যাইতেছে। 'লাহিড়ী মশায়, ভাল তো, কিছুদিন থাকা হইবে তো'—বলিয়া দুই চারি জন গ্রামের বিশিষ্ট দরদী ব্যক্তি প্রসন্নকুমারের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। সদাশয় আলাপ-প্রিয় প্রসন্নকুমারও সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিতেছেন ও কথার উত্তর দিতে দিতে দেরী করিয়া ফেলিতেছেন। দিদি-ভগ্নীপতি অন্ধকার বনপথে পথ হারাইয়া ফেলিবেন, এই আশঙ্কায় জগৎসুন্দর চলিতে চলিতে থামিয়া দাঁড়াইতেছে। ধন্য লাহিড়ী দম্পতি, জগদ্বন্ধু যাঁহাদের অপেক্ষায় পথে দাঁড়াইয়া থাকে!

কাহারও সঙ্গে কোনও কথার আলোচনায় প্রসন্নকুমার ও গোলোকমণি উভয়েই একটু অন্যমনস্ক হইয়াছেন। হঠাৎ জগদ্বন্ধু অদৃশ্য। তখন বনানীও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে। পথও যেন হারাইয়া গেল। হারাইবারই কথা। জগৎ-সুন্দরকে হারাইলেই পথ হারাইতে হইবে। দুইজনে এদিক ওদিক চাহিয়া পথ ঠিক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আর বলাবলি করিতে লাগিলেন—জগৎ কি চলিয়াই গেল, না দুষ্টামি করিয়া লুকাইয়া রহিল। চারিদিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইতেই হঠাৎ দুইজনেরই দৃষ্টি একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের গুঁড়ির দিকে আকৃষ্ট হইল।

অহো, কি জ্যোতিঃ। ঐ যে বৃক্ষের মূলদেশ আলোকিত করিয়া তাঁহাদের ধ্যানের মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছেন। যুগলিত রাধা-মদনমোহন! কি রূপের ছটা! মুহূর্ত্তের জন্য বনানী আলোকিত হইয়া গেল। পরক্ষণেই সব নিভিয়া গেল। লাহিড়ী-দম্পতি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরেই সেই বৃক্ষের এক পার্শ্ব দিয়া জগদ্বন্ধুসুন্দর বাহির হইল। দিদি ও ভগ্নীপতির মুখের দিকে চাহিয়া জগৎসুন্দর হাসিরাশি ছড়াইয়া দিল। "হাঁরে জগৎ, হঠাৎ কোথায় গিয়াছিলি?' উত্তর আসিল—'আমি তো এই গাছের তলায়ই ছিলাম।'

লাহিড়ী-দম্পতি উভয়েই অতি বিচক্ষণ লোক ও সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-ধনে ধনী। তবু কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না, যাহা দেখিলেন, তাহা কি চোখের ধাঁধাঁ, না জগদ্বন্ধুর কৌতুক, না, ইষ্ট-দেবতার অযাচিত করুণার খেলা! তবে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়, তাঁহারা যে সাক্ষাৎ গোলোকরতন দর্শন করিয়াছেন, এ কথা নিশ্চিত ভাবেই তাঁহাদের অন্তর-পটে অঙ্কিত হইয়া রহিল। ইহা তাঁহাদেরই নিজ মুখের কথা।

———

পূজারী

"অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্ব-চিত্ত-হর।"

—শ্রীকৃষ্ণ দাস

চক্রবর্ত্তীদের গৃহদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দ চির-জাগ্রত বিগ্রহ। কোমরপুর হইতে গোবিন্দপুর, গোবিন্দপুর হইতে জ্ঞানদীয়া, জ্ঞানদীয়া হইতে ব্রাহ্মণকান্দা ভক্তের ধন ভক্ত পরিবারের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। যে-পরিবারে মূর্ত্ত হইবেন তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়েন কি করিয়া!

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-পূজার দায়িত্ব এখন জগদ্বন্ধুসুন্দরের উপর। উপবীত-ধারণের পর হইতেই এই পূজার ভার পড়িয়াছে। অদ্ভুত পূজা, অপূর্ব্ব বেশবিন্যাস, মনোরম শৃঙ্গার, নিরূপম সেবা-সৌকর্য্য। জগৎ পূজা শেষ করিলে, দিদি-দিগম্বরী আসিয়া নয়ন ভরিয়া তাকাইয়া দেখেন, সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া দেখান, আর বলিতে থাকেন,—'জগৎ পূজা করিলে আমার রাধাগোবিন্দ আনন্দে নাচে।' সকলেই বলে,—'জগতের স্পর্শে ঠাকুর জীবন্ত হন।' কোনও কোনও দিন জগৎসুন্দরের সঙ্গে রাধাগোবিন্দের রসিকতা চলে। অভিনব বেশবিন্যাসে নন্দ-দুলাল ভানু-দুলালী নবরসে রসিত হইয়া উঠেন।

রঙ্গলাল বন্ধুসুন্দরের হাতে আজ রাধাগোবিন্দের পরম কৌতুকাবহ শিঙ্গার হইতেছে। ভানুবালার বেশভূষা ও নীল সাড়ী পরিধান করিয়া ব্রজদুলাল 'নাগরী' সাজিতেছেন।

রসরাজের চূড়া-বাঁশী-পীতধটী পরিধান করিয়া ব্রজমোহিনী 'নাগর' সাজিতেছেন। গোপীবল্লভ আজ প্রিয়া কমলিনীর বামভাগে হেলাইয়া দাঁড়াইতেছেন। বেশ-রচনা শেষ। তখন মঞ্জরী-ভাবাবিষ্ট পূজারী স্বয়ং নয়ন ভরিয়া দোঁহার রূপসুধা পান করিতে করিতে আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া মৃদুমধুর স্বরে গান করিতেছে—

"আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ তো কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥
* * *
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥

গোপালচন্দ্রের পত্নী 'অধিকারী-ভায়া' ঠাকুর প্রণাম করিতে আসেন। রাধাগোবিন্দের বিপরীত বেশে মিলন দেখিয়া হাসিয়া উঠেন; বলেন-'ঠাকুরপো, এ কি রঙ্গ?' জগৎসুন্দর বৌদিদির কথা শুনিয়া মুচকি হাসিয়া মুখ ফিরায়। বাড়ীশুদ্ধ লোক, গ্রামশুদ্ধ লোক আসিয়া ঠাকুর দেখেন। না জানিলেও, না বুঝিলেও, কিন্তু ঐ দুর্লভ হাতে দুর্লভ সাজে সজ্জিত দুর্লভ রত্নযুগল-দর্শনে সকলে আনন্দে ভরপুর হইয়া যান।

পূজারী জগদ্বন্ধু যাঁহার যে বেশ আবার তাঁহাকে তাহা ফিরাইয়া দেয়। দিতে দিতে গুন্ গুন্ করিয়া গায়—

"রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমারি কারণে, রসতত্ত্ব লাগি'
গোকুলে আমার স্থিতি॥"

উচ্চ-বিদ্যালয়ে বাল-ব্রহ্মচারী

মধ্য-ইংরেজী-বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হইয়া গেল। গোপাল-চন্দ্র ভাইটিকে উচ্চ-ইংরেজী-স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে (ক্লাস সিক্সে) ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। বাংলা বারশত নব্বই সাল। উপনয়নের দিন হইতে যে-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত আরম্ভ হইয়াছে তাহার উপর বন্ধুসুন্দরের নিষ্ঠা দিনের পর দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। অন্তরে কি যেন একটা ভাব ক্রমশঃ পুষ্ট ও গভীর হইতেছে। সর্ব্বদা আনমনা—একদিকে হাবার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকা, বাক্যপ্রয়োগে অতি সংযত ভাব, নিম্নদৃষ্টিতে একপাশ ধরিয়া ধীর পদক্ষেপে পথ চলা—এই সকল জগদ্বন্ধু-সুন্দরের অনন্যসাধারণ লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত হইল। এই সমস্ত বাহিরের লক্ষণ যে অন্তর-রাজ্যের কোন্ গভীর ভাবানুভূতির অভিব্যক্তি তাহা কেহই বুঝিতেছে না। বুঝিবে কিরূপে ?

জগৎ কোথায় গেল, খোঁজ পাওয়া যায় না। কেহ আসিয়া খবর দিল—ঐ বনের প্রান্তে বটগাছটার তলায় একা একা আকাশের দিকে তাকাইয়া আছে, দেখিয়া আসিলাম। কোনও দিন প্রিয় সঙ্গীরা কাঁধে করিয়া বাড়ী পোঁছাইয়া দিয়া বলিল—'দেখিলাম, রাস্তার পাশে জগৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাই আমরা বাড়ীতে দিয়া গেলাম, এখনও বোধ হয় উহার ঘুম ভাঙ্গে

নাই।’ কোনও দিন রাত ভরিয়া বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে গান চলিতেছে—

“বন্ধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রাণনাথ হইও তুমি॥”

দিদি-দিগম্বরী কান পাতিয়া জগতের গান শোনেন। হঠাৎ গান বন্ধ হইয়া যায়। দিদি উঠিয়া জগতের শয়ন-কক্ষে যান। শয্যা শূন্য! জগৎ কোথায়? কত ডাকাডাকি, খোঁজাখুঁজি, সাড়াটি নাই। দিদি কত উদ্বেগে রাত কাটান। গোপাল তারিণীরও ঘুম হয় না। বউরা আলো লইয়া ঘরের পিছনে দেখে। প্রভাতে সবাই গিয়া দেখেন—নাঃ, জগৎ তো ঘরেই আছে! শয্যা হইতে নীচে পড়িয়া ধূলায় ঘুমাইয়া আছে! ‘জগৎ, জগৎ’—দিদি ডাকেন। পদ্ম আঁখি মেলিয়া জগৎ তাকায়।

এত অন্যমনস্ক ভাব! মন যেন মনে নাই! বুদ্ধি যেন মাথায় একটুকুও নাই! প্রত্যহ কিন্তু স্কুলে যাওয়াটি ঠিক আছে। ঠিক সময়মত যাওয়া চাই-ই। মাঝে মাঝে স্কুলে পরীক্ষা হয়। সব পরীক্ষা ঠিক ঠিক দেওয়া চাই-ই। পরীক্ষার ফলও বিশেষ সন্তোষজনক হইতেছে। দেবদ্বিজে ভক্তি, শিক্ষকগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সঙ্গিগণের প্রতি অতুলনীয় প্রীতি, সুহৃদ্‌গণে নির্ম্মল সখ্য, কনিষ্ঠে প্রগাঢ় স্নেহ—জগৎসুন্দরের দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে সমস্তই স্বাভাবিক ভাবে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। এই সব বিষয়ে কোনও বৈলক্ষণ্য নাই।

দিদি বলেন—‘জগৎ, কাল রাত্রে বিছানা হইতে পড়িয়া

গিয়েছিলে। আজ আমার কাছে শোও।' 'আচ্ছা দিদি'—বলিয়া দিদির পার্শ্বে একটা সিন্দুকের উপর শোয়। সিন্দুকটা দিদির খাট হইতে হাতে নাগাল পাওয়া যায়, খাটের সঙ্গে প্রায় লাগানো। দিদি কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর জগতের গায়ে হাত বুলান। দিদির হাত সেই অঙ্গস্পর্শ ছাড়িতে চায় না। এক ঘুমের পর দিদি চমকিয়া উঠেন—'জগৎ? জগৎ কোথায়!' মেজ-বউ উঠিয়া প্রদীপ জ্বালেন। জগৎ ঘরে নাই! ঘরের দরজা-জানালা সমস্ত পূর্ব্ববৎ ঘরের ভিতর হইতে বন্ধ। শীতকাল। জগৎ কোথায় গেল? দিদি অস্থির হইয়া যান। সবাই জাগেন ব্যস্ত হইয়া খোঁজে।

জগতের 'বাগচি-ভায়া' দরজা খুলিয়া ঘরের পার্শ্বে গিয়া ডাকেন, বলেন—'ঠাকুর ঝি, ঐ পুকুর পারের দিক হইতে ঠাকুরপো'র গায়ের গন্ধ আসিতেছে।' দিদি আসেন, তারিণী আসেন। সবাই নাক বাড়াইয়া গন্ধ লন। সত্যই ঐ দিক হইতে জগতের অঙ্গ-গন্ধ আসিতেছে! গন্ধ ধরিয়া সকলে পুকুর পারে আসেন 'এই যে আমতলায়"—বাড়ীর ভৃত্য পেনা চেঁচাইয়া উঠে। সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখেন—আমতলায় খালি গায়ে জগৎ ধ্যানস্থ। কেহ ধ্যান ভাঙ্গিতে সাহস করেন না। দিদি গ্রাহ্য করেন না। দুই হাত মেলিয়া কোলে লইয়া দিদি জগৎকে নিয়া সিন্দুকের উপর শোয়ান। সকালে দিদি জগৎকে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করেন জগৎ কিছুই জানে না।

জগৎসুন্দর স্কুলে চলিয়াছে। শুদ্ধ শুভ্র বস্ত্র পরিধানে। সবই অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মাথার কেশ ছোট। চরণ

নগ্ন। স্কন্ধে উজ্জ্বল উপবীত। গাত্র-বস্ত্রের আড়াল দিয়া ব্রহ্ম-তেজ ফুটিয়া পড়িতেছে। সহপাঠিরা, স্কুলের সহযাত্রীরা প্রীতির আকর্ষণে কাছে আসিতেছে, আবার পবিত্রতার ঔজ্জ্বল্যে সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। সান্নিধ্যে না যাইয়াও উপায় নাই, আবার অতি-সান্নিধ্যে যাইবারও জো নাই। এই আকর্ষণ-সঙ্কোচনের মধ্য দিয়া সঙ্গীদের সখ্য-রসানুভূতি মধুর দোল খেলিতেছে।

জগৎসুন্দরের গায়ে একটা ধাক্কা মারিয়া বকুলাল জিজ্ঞাসা করিতেছে—'রাঙা মূলা, আঁচলের গাঁটে রোজই কি বাঁধিয়া রাখিস্।'

'না রে, কিছু না'

'তবে ও গিঁটটা কিসের ? প্রত্যহই তো দেখি।'

'ও একটা চিহ্ন রে বকু।'

'কিসের চিহ্ন রে ?'

'ছাখ্ রে কাপড়ের যে-দিকটা পরি, সেই দিকটা তো কোমরের নীচে থাকে। ঐ দিকটা আবার ঐ কাপড় পরিবার সময় শরীরের উপরের দিকে লাগিয়া শরীর অপবিত্র না করে, এই জন্য গায়ের অংশের দিকে একটা গিঁট বাঁধিয়া চিহ্ন দিয়া রাখি। ওটা তাই। আমার সব কাপড়েই আছে।'

জগতের কথা শুনিয়া সঙ্গীরা অবাক্। পবিত্রতার মূর্ত্ত-বিগ্রহের কাঁধ হইতে বকুলাল সঙ্কোচে হাত সরাইয়া লয়। একটা যেন স্বচ্ছ শুভ্র শেফালী ফুল শিশির-সিক্ত দুর্ব্বাদলের উপর পড়িয়া আছে। বকুলাল লুব্ধ। কিন্তু নিজের মলিন কঠোর হস্তে তাহা তুলিয়া লইতে সে সাহসী নয়। অথবা,

বকুলালের নিজ-মুখের ভাষাতেই বলি—'একটা মানস সরোবরের রাজহাঁস, গগনপথে উড়িয়া যাইতেছিল, যেন কোনও অজানা কারণে এই জড়ভূমিতে নামিতেছে। জড়ভূমি ভয়ে স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না। একটা রাজহংস রে রাজহংস! মানুষ নয়। মানুষ কি? একটা বস্তু। শুধু আস্বাদনের বস্তু। দর্শন, স্পর্শন, ভোগের বস্তু। সে কি মধুর কণ্ঠ! কান জুড়ায় তোমাদের শুনাইতে পারিলাম না। ওঃ কি আকর্ষণ! পুরুষমানুষেব প্রতি পুরুষ-মানুষের এমন আকর্ষণ হইতে পারে, বলিলে কেহ কি বিশ্বাস করিবে?' বকুলাল আর বলিতে পারেন না, কণ্ঠে স্বর নাই!

তুলসী-ছায়া

"ক্বচিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দ চরণ প্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈ র্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতি প্রিয়োঽচ্যুত॥"

—শ্রীশুকদেব

স্কুলের বেলা হইয়া গিয়াছে। স্নান করিয়া গোবিন্দের পূজা সারিয়া স্কুলে যাইতে হইবে। স্নানান্তে সিক্ত বসনে জগৎসুন্দর ঠাকুর-মন্দিরের দিকে যাইতেছে। যাইতে পথের মাঝে একটি তুলসী-বেদী। বেদীর উপর বৃন্দাদেবী। বেদীর ছায়াটি একপার্শ্বে পড়িয়াছে। বন্ধুসুন্দরের চলিবার কালে ছায়াটি চরণের কাছে পড়িল। অমনি, তুলসীর ছায়াটি এড়াইবার জন্য জগৎসুন্দর বৃক্ষটির অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া চলিল। ছায়াটিও অমনি ঘুরিয়া সেই দিকে আসিল। পুনরায় ছায়াটিকে

এড়াইয়া যাইবার জন্য বন্ধুসুন্দর অন্যদিকে ঘুরিয়া আসিল। ছায়া আবার ঘুরিল। তুলসীর ছায়াকে পায়ের তলা হইতে ছাড়াইবার জন্য বন্ধুসুন্দরের চেষ্টা। বন্ধুসুন্দরের শ্রীচরণ-তল ছাড়া না হইবার জন্য ছায়ার চেষ্টা। দুইজনের পাল্লা কিছুক্ষণ চলিল। কেহ কাহাকেও হারাইতে পারিল না। কেবলমাত্র হারাইবার চেষ্টায় বন্ধুসুন্দর কর্ত্তৃক দুই-তিনবার তুলসী-পরিক্রমা হইয়া গেল।

দেবী দিগম্বরী অনতিদূর হইতে ইহা দর্শন করিতেছিলেন। যাহা ঘটিল তাহা সবই দেখিলেন। ঐ খেলার দিকে বড় দিদির দৃষ্টি পড়িয়াছে, বুঝিয়াই তুলসী-প্রিয় বন্ধুহরি তুলসী-বেদী ছাড়িয়া রাধাগোবিন্দজীর পূজামণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল। দিদি ভাবিতে লাগিলেন—'এ কি! জগৎ কি মানুষ, না, দেবতা! তুলসী-ছায়া পায়ে লাগিয়া ঘুরিল কেন?'—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণকালের মধ্যে বাৎসল্যস্নেহের প্রবল প্রবাহ আসিয়া সব ভাবনা ভাসাইয়া লইয়া গেল। ভাবিলেন—কি ছাই, ধাঁধাঁ দেখিলাম। অবোধ শিশু না বুঝিয়া তুলসীদেবীর ছায়ায় পা দিয়া অপরাধ করিয়াছে মনে করিয়া দিদি তুলসী-তলায় মাথা কুটিতে লাগিলেন। পরদিন জগৎকে কাছে ডাকিয়া দিদি বলিলেন,—'জগৎ, তুলসীগাছের ছায়াতে পা দিতে নাই।'

'দিদি, আমি তো ছাড়াইতে চাই, ও তো ছাড়ে না'—বলিয়া জগৎসুন্দর অন্যদিকে চলিয়া গেল। উত্তর শুনিয়া দিদি গত দিন যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আবার ভাবিতে লাগিলেন।

দুঃখীরামের দর্শন

"জীব দুর্জ্ঞেয় মহিমন্ সদা ভক্তৈকচিত্তভাক্।
অসাধারণ লীলোহ্য বিশ্বমঙ্গল মঙ্গল ॥"

—শ্রীসনাতন

দুঃখীরাম ঘোষ। বাড়ী পাবনা-জেলার বাক্সা-গ্রামে। ফরিদপুরের বাজারে দধি-দুগ্ধের ব্যবসায় করে। যৌবন বয়স। যেমন লম্বা, তেমন চওড়া, সুন্দর চেহারা। আজ বৈকালে দধির ভাড় কাঁধে লইয়া দুঃখীরাম ফরিদপুর-বাজার হইতে পশ্চিমমুখে যাইতেছে। বদরপুর-গ্রামে এক বাড়ীতে বিবাহোৎসব সেখানে দধি দিতে যাইবে। বরাবর যশোররোড ধরিয়া দুঃখীরাম চলিতেছে। গোয়ালচামট-গ্রামের মধ্য দিয়া পথ। ডানদিকে শোভারামপুরের রাস্তা রাখিয়া একটু আসিতেই দরবেশের পুল। পুল পার হইয়া দুঃখীরাম থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। কি যেন একটা দৃশ্য সে দেখিয়াছে।

একটি বালক পুঁথি বগলে লইয়া স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। তাহার সারাটি গা সাদা কাপড়ে ঢাকা। দেখা যায় কেবল দুইটি পা। হিঙ্গুলের মত রাঙা-টুক্‌টুকে সে পা-দুখানি। আরও দেখা যায় শুভ্র জ্যোতিঃ, যেন মধ্যাহ্নের তপন-কিরণ, বস্ত্র ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে।

বালকটি নয়ন-পথগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখীরামের গতিবেগ মন্দীভূত হইয়াছে। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সে যে কে, কোথায় কি জন্য যাইতেছে তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে! কি যেন এক অজানিত দেশের

অদ্ভুত আকর্ষণে সে বালকের সঙ্গে চলিতেছে। বালক যখন যশোর রোড্ ছাড়িয়া বামাবর্ত্তে দক্ষিণমুখে চলিল, দুঃখীরামও তাহাই করিল। তাহার স্কন্ধে যে বিবাহ-বাড়ীর দধি—সে যে পথ ভুল করিল, তাহা মনেই হইল না। বালক ব্রাহ্মণকান্দা চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সে চক্ষের একটু অন্তরাল হইতেই দুঃখীরামের জ্ঞানোদয় হইল। অপরিচিত বাড়ীর ভিতরে সে কেমন করিয়া যাইবে?—তাই দাঁড়াইয়া রহিল। হায়! সে রূপের মানুষটি দৃষ্টিপথের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। দুঃখীরাম নয়ন মুদিয়া স্তম্ভের মত স্থির হইয়া রহিয়াছে।

দুঃখীরাম কি করিতেছে? বুঝি-বা যাহা বাহিরে হারাইল তাহাই ভিতরে পাইতে চাহিতেছে। তাহার দুই চক্ষে ধারা গলিতেছে। দুঃখী কি ভাবে? দরদী মহাজনেরা এ ভাবের মরম জানে। তাঁহাদের ভাষায় বুঝি দুঃখী ভাবে—

"কি রূপ দেখিনু মধুর মূরতি পীরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক তার॥"

কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। দুঃখীরাম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া চিন্তা করিতে লাগিল এই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে আর-একবার দেখিয়া যাই। আবার ভাবিল—পরের বাড়ী, কোনও দিন যাই নাই, কাহাকেও চিনি না, কি করিয়া যাই? কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, কি বলিব? দুঃখীরাম বিচার করিয়া, ফিরিল। দুঃখীর দেহটাই ফিরিল। আর একটা কী[illegible] যেন দুঃখীর চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর দরজার দুয়ারে দাঁড়াইয়াই থাকিল।

দুঃখীরাম পথে চলিতে চলিতে কয়েকবার ফিরিয়া চাহিল।

সেইদিন দোকানে গিয়া দুঃখীরাম জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে করিতে, খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে, অনেকবার আনমনা হইয়া গেল। টাকা-পয়সার হিসাব মিলাইতে পারিল না। জিনিষপত্র গুছাইতে পারিল না। রাত্রে আহার হইল না। নিদ্রা হইল না। দুঃখীরাম আজ যাহা দেখিয়াছে, তাহা তাহার সমগ্র জীবনটাকে পাইয়া বসিয়াছে। কি যে একটা আকর্ষণ, কি যে একটা অসোয়াস্তি, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। যাহার এই অনুভব হয় নাই, সে কখনও বুঝিবেও না। রূপ-লুব্ধ নয়ন, অরূপের রূপ দেখিতে চায়। যদি একবার দেখা পায়, তবে এই অবস্থাই হয়।

ক্রমে অনুসন্ধানে দুঃখীরাম জানিল, যাহাকে সে দেখিয়াছে সে ঐ চক্রবর্ত্তী-বাড়ীরই ছেলে। ফরিদপুর-স্কুলে পড়ে। নাম জগদ্বন্ধু। আরও জানিল যে, সে বালক জলধরের সঙ্গী। জলধরকে দুঃখীরাম ভালই চিনে। জলধরের বাবা ও দুঃখীরাম সম-ব্যবসায়ী। দুইজনের দোকান-ঘর কাছাকাছিই। জলধর বলিল,—'দুঃখী-কাকা, তুমি জগদ্বন্ধুকে চিন না? সে তো আমাদের দোকানে কত আসে।' দুঃখীরাম জলধরকে বলিয়া রাখিল—'আর একদিন আসিলে আমার দোকানে নিয়া আস্‌বি। জলধর রাজী হইল।

সে দোকানে আসিলে দুঃখী তাহাকে লইয়া কি করিবে— নানা রকম কল্পনা করিতে লাগিল। আর কিছু হউক না হউক, কিছু ক্ষীর-ছানা সে তাহাকে খাওয়াবেই, এই বাসনাটি সে প্রাণ ভরিয়া করিতে লাগিল। খাইতে দিলে, সে খাইবে কি না?

খাইলে, কেমন করিয়া খাইবে? যখন খাইবে, তখন সে রাঙা ওষ্ঠখানির কি সুষমা ফুটিবে?—দুঃখী মানসনেত্রে সমস্তই দর্শন করিতে লাগিল। দুঃখীরামের মানস-সাধনা শেষ হইয়া গেল। সাধনার ধন আর কি থাকিতে পারে?

হঠাৎ জলধর জগদ্বন্ধুসুন্দরকে সঙ্গে লইয়া দুঃখীরামের দোকানে উপস্থিত—সত্যসত্যই উপস্থিত। ভক্তের ধ্যান সফল। দুঃখীরাম নিজ-চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। সে দিশাহারা হইল। বসিতে আসন কি দিবে? কয়েকখানি ছোট জলচৌকী আর কয়েকখানা ছালা, ইহা ছাড়া বসিতে দেওয়ার তো আর কিছুই নাই! দুঃখীরাম যে দুঃখী, তাহা সে এতদিন জানিত না, আজ জানিল।

দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি তাহার বসিবার জলচৌকীখানায় একটু জলের ছিটা দিয়া মুছিয়া, তাহার উপর তাহার আহ্নিক করিবার সময়ে গায়ে-দেওয়া মুগা-কাপড়ের টুকরাটি ভাঁজ করিয়া ছিন্ন অংশটুকু ঢাকিয়া তাহাতে পাতিয়া দিল। জগৎসুন্দর অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই দুঃখীরামের শুদ্ধ হৃদয়াসন দখল করিয়া তাহাতে বসিয়াছে, এখন তাহার বাহিরের-দেওয়া আসনখানিও হাসিতে হাসিতে অঙ্গীকার করিল। বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখের হাসি স্বাভাবিক, কিন্তু তদ্দর্শনে দুঃখীরামের নয়নের অবস্থা অস্বাভাবিক। পলক-হারা দুঃখীরাম সুধাপান করিতেছে! এ যেন কতকালের পরিচিত মুখ-সুধা! কত জন্ম-জন্মান্তরের প্রাণগলানো হাসিরাশি! যেন কোন্ অজানা-দেশের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার সঙ্গে! স্নেহরসে দুঃখীরামের হৃদয় টলমল করিতেছে!

প্রীতির আবেগে দুঃখীরামের মুখ খুলিয়া গেল। কোনও ভূমিকা না করিয়াই সে আদর-মাখা ভাষায় কহিল,—'আহা, স্কুল হইতে ফিরিয়াছ, মুখ শুখাইয়া গিয়াছে—এই কথা বলিয়াই এক ঘটি জল সামনে রাখিয়া দুঃখী বলিল—'মুখ ধোও'। সে-আদেশ পালন করিতে জগৎসুন্দরের বেশী কালবিলম্ব হইল না। দুঃখী থালায় করিয়া দুধের সর, ছানা, ক্ষীর ও চিনি সামনে ধরিল। দুঃখীর হাত কাঁপিতেছে, চক্ষেও যেন দেখিতে পাইতেছে না। সঙ্কোচ, ভয়, আশঙ্কা, উল্লাস—দুঃখীরামের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবশাবল্যের উদয় হইয়াছে। পাত্রে-পরিবেশিত বস্তু অপেক্ষা ঐ মুখের দৃশ্যটি বন্ধুসুন্দরের অধিকতর আস্বাদনের সামগ্রী।

'নে, ধলা বৈরিগী খা'—বলিয়া বন্ধুসুন্দর জলধরের হাতে কিছু খাবার তুলিয়া দিয়া, সকলের দিকে পিছন ফিরিয়া একটু ঘুরিয়া বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। না খাইয়া উপায় নাই যে! যে-প্রেমে "সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন," সেই প্রেম আজ দুঃখীরামের হৃদয়-সাগরে তরঙ্গায়িত।

জগদ্বন্ধুসুন্দর এখন প্রায়-প্রত্যহই আসে। স্কুল-ছুটির সময় হইলেই দুঃখী পথের দিকে তাকাইতে থাকে। মিনিটে বিশবার তাকায়। কখনও বাহিরে গিয়া, যতদূর দৃষ্টি যায় রাস্তার দিকে তাকায়। অন্যান্য ছেলেরা চলিয়া যায়, তাহাদের দিকে তাকায়। কয়টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করে। আবার ঘরে আসে। ছানার পাশে চিনিটুকু সুন্দর করিয়া রাখে। জলটায় একটু কর্পূর দিয়া রাখে। আসনখানা তিনবার মুছিয়া দেয়।

দুঃখী পিছন ফিরিয়া আসন পাতিতেছে। সচকিতে ফিরিয়া দেখে, রূপের ঝলকে ঘর আলো করিয়া স্নেহের ধন দাঁড়াইয়া আছে। কোনও কোনও দিন দুঃখীরাম খাইবে, বলিবার আগেই খাইতে চায়। দুঃখী প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইয়া শাশ্বত সুখে ডুবিয়া যায়। এখন আর জগৎ ঘুরিয়া বসে না, সামনেই খায়। গোষ্ঠ-শ্রান্ত ব্রজদুলালকে ব্রজের রাজা-রাণী যে-ভাবে খাওয়াইতেন, স্কুলের পাঠ-শ্রান্ত জগদ্বন্ধুসুন্দরকে দুঃখীরাম সেই ভাব লইয়া ভোজন করায়। তাই-দুর্লভ ধন বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। দুঃখী, সংসারে তুমিই সুখী। তোমায় প্রণাম।

"অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরব্রহ্ম"

পরীক্ষা-কেন্দ্রে বিহ্বলতা

ফরিদপুর জেলা-স্কুল। ছাত্রদের বাৎসরিক পরীক্ষা হইতেছে। বাংলা বারশত তিরনব্বই সাল, অগ্রহায়ণ-মাস। স্কুলঘর নীরব। সকলের মন প্রশ্ন-পত্রে নিবদ্ধ। দপ্তরী কাগজ কালি জোগাইতেছে। তত্ত্বাবধায়কগণ পরীক্ষার হলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কে কোথায় অন্যায় উপায় অবলম্বন করিতেছে, সেই দিকে কড়া নজর রাখিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কেহ ভীত, কেহ ত্রস্ত, আবার কেহ-বা আশান্বিত হইয়া সাধ্যমত লিখিতেছে।

তৃতীয় শ্রেণীর (ক্লাস এইটের) ইতিহাস-পরীক্ষা। জগদ্বন্ধু-সেই শ্রেণীরই ছাত্র। কয়েক দিন যাবতই পরীক্ষা চলিতেছে।

জগৎসুন্দর-সম্বন্ধে শিক্ষকদের মধ্যে অনেক কথা আলোচনা হয়। তাহার রূপে, লাবণ্যে ও মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু সকলেই জানে যে, সে মোটেই পড়ে না। অথচ পরীক্ষায় সে কি করিয়া ভাল ফল করে, ইহা সকলেরই একটা কৌতূহলের বিষয়। হেড্ মাষ্টার ভুবন সেন অন্যান্য শিক্ষকদিগকে বলেন যে, পড়াশুনা না করিলে কিছুতেই কেহ ভাল ফল করিতে পারে না। পরীক্ষার সময় উহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কিন্তু পরীক্ষার সময় জগতের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন, ভুবনবাবু ছাড়া আর কোনও শিক্ষকই মনে করেন না। তাঁহাদের কাহারও জগতের সততায় অবিশ্বাস নাই। পরন্তু, সকলেই মনে করেন, তাহার কোনও অলৌকিক শক্তি আছে। ভুবন সেন মহাশয় অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে একমত হন না। তিনি অলৌকিক শক্তি বিশ্বাস করেন না, হাসিয়া উড়াইয়া দেন।

ইতিহাসের প্রশ্ন পাইয়া জগৎসুন্দর কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া ফেলিয়াছে। হঠাৎ পরীক্ষা-কেন্দ্রের নীরবতা তাহার নির্জ্জনপ্রিয় চিত্তের উপর ক্রিয়া করিল। বনের মাঝে নদীর তীরে বসিয়া কি যেন কি ভাবিতে ভাবিতে আনমনা হইয়া পড়ার অভ্যাস তাহার তখন খুব বেশি। সেই অভ্যাস-বশতঃ কি যেন কোন রাজ্যের কি চিন্তাধারা তাহাকে একেবারে আত্মবিস্মৃত করিয়া দিল। সে যে পরীক্ষা দিতে বসিয়াছে, ইহা সে একেবারে ভুলিয়া গেল। কেহ কেহ বলেন যে, পরীক্ষায় শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন ছিল। সেই প্রশ্নটি লিখিতে আরম্ভ করিতেই তাহার ভাবান্তার উপস্থিত হয়।

জগৎসুন্দরের হাতে কলম আছে, চলিতেছে না। প্রশ্ন-পত্রখানা পড়িয়া গিয়াছে, সেদিকেও লক্ষ্য নাই। ঈষৎ আনত কন্ধর। ঢলঢল উদাস দৃষ্টি। জগৎ জগদতীত-রাজ্যে আপনা-হারা। তাহার এ বিহ্বলতা বুঝিবে কে ? জড় দেশে যাহাদের বাস ও জড় বস্তু লইয়া যাহাদের মন সতত বিব্রত, ভাব-রাজ্যের খবর তাহারা কি রাখে ?

'জগৎ, পরীক্ষা দিতে পার্‌বে না'—হঠাৎ এইরূপ একটা কঠোর কর্কশ আদেশ পরীক্ষার হলের মধ্যে ধ্বনিত হইল। ভাবাবেশ তৎক্ষণাৎ টুটিয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া জগৎসুন্দর হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইল। ভুবনবাবু পুনরায় বলিলেন,—'জগৎ, অন্য ছেলের খাতা দেখছ, পরীক্ষা দিতে পার্‌বে না।' হঠাৎ ভাবের আবেশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় জগৎসুন্দরের তখন মনে হইতে ছিল, যেন কেহ তাহাকে উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে নিক্ষেপ করিয়াছে। তদুপরি আসিল কঠোর হুকুম। মানসিক আঘাতের উপর নির্ম্মম আদেশের আঘাত। সবই বিনা কারণে।

ভুবনবাবু জগদ্বন্ধুর খাতাখানা টানিয়া হাতে লইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সত্যসত্যই নকল করিতেছে কিনা তাহাই দেখা। কিন্তু বন্ধুসুন্দরের তখন ক্ষণমাত্র অপেক্ষাও সহ্য হইতেছে না। আপত্তিজনক বা আত্মসমর্থন-সূচক একটি কথাও উচ্চারণ না করিয়া সে নীরবে পরীক্ষা-কেন্দ্র ত্যাগ করিল।

সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকগণ দেখিলেন জগৎ বাহির হইয়া গেল। সকলেরই মনে জাগিল যে, কাজটি অসমীচীন হইল,

কারণ জগৎ কখনও অসৎ হইতে পারে না। জগদ্বন্ধুসুন্দরের লিখিত খাতায় দুই-এক মিনিট চক্ষু বুলাইতেই ভুবনবাবুরও ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে, জগৎ যাহা লিখিয়াছে ভালই লিখিয়াছে এবং তাহা নকল-করা লেখা নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ স্কুলগৃহের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে তাকাইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। শিক্ষকেরাও সবাই খুঁজিলেন। জগতের কোনও সন্ধানই পাইলেন না। জগৎ হয়তো হলের বাহিরে গিয়া সাধারণ ছেলের মত মলিন বদনে দাঁড়াইয়া থাকিবে—ভুবনবাবুর মনে এইরূপই ধারণা। কিন্তু যে-বালকের উপর তিনি অন্যায় শাসন চালাইয়াছেন, সে যে অনন্যসাধারণ, তাহা তিনি কিঞ্চিৎ জানিলেও সেই সময়ের জন্য একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রুত আছি, পরবর্ত্তী কালে স্কুলের কাজ ছাড়িয়া দিয়া অবসর-জীবন-যাপনের সময়েও তিনি এই ঘটনাটি মনে করিয়া অনুতাপ করতঃ আত্মশোধন করিতেন।

———

মদন মিত্রের লেনে

জগদ্বন্ধুসুন্দর একাকী আপন-মনে পথ চলিতেছে। চলিতে চলিতে বহুদূর চলা হইল। তারপর ট্রেণে উঠা। অবশেষে কলিকাতায় অবতরণ। এক নম্বর মদন মিত্রের লেন, এই ঠিকানা ছাড়া জগৎ কলিকাতার আর কোনও ঠিকানা জানে না। কারণ ঐ ঠিকানায় দিগম্বরী দেবী ক্ষীরোদার কাছে পত্র দেন। পত্র জগৎকে দিয়া লেখান। সেই ঠিকানায় জগৎসুন্দর উপস্থিত। অতুলচন্দ্রের মনে সেই ছোট মামা-শ্বশুরটির ছাপ অঙ্কিত আছে। আজ তাহাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে নিকটে পাইয়া তিনি পরম প্রীত হইলেন।

'ছোট্ মামা, ছোট মামা'—বলিতে বলিতে ক্ষীরোদা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়া আসিল। বাল্যের কত সুখস্মৃতি তাহার মানসে ফুটিয়া উঠিল। সকলের খবর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। খুঁটিনাটি কত শত কথা জানিতে ক্ষীরোদার আগ্রহ। গ্রামের মেয়ে ক্ষীরোদা সহরের বাড়ীতে বিবাহিত হইয়া কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে; কিন্তু কি যে একটা নিবিড় শান্তির স্নিগ্ধ নীড়ে সে বাস করিত, তাহার তুলনা ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও মিলিবার নহে। জগৎসুন্দরকে পাইয়া ক্ষীরোদাসুন্দরী একেবারে কচি বালিকা হইয়া পড়িল। স্নেহ-স্নিগ্ধ সুকোমল সম্ভাষণে দুইজনের কত মধুর কথাই না হইল! অতুলচন্দ্র কখনও কাছে থাকিয়া, কখনও আড়ালে দাঁড়াইয়া, সে নিখুঁত প্রীতির নির্ম্মল বিনিময় আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

কথায় কথায় গোপন কথা বাহির হইয়া পড়িল। ক্ষীরোদা বুঝিয়া ফেলিল যে, ছোট মামা তাহার মায়ের কাছে না বলিয়াই কলিকাতায় আসিয়াছে। অতুলচন্দ্র তখন পত্র লিখিয়া গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জগদ্বন্ধুর পৌঁছিবার সংবাদ জানাইয়া দিলেন।

এদিকে স্কুল-ছুটির পর জগদ্বন্ধু বাড়ী আসে নাই। সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাত্রি হইল। জগৎ আসিল না। স্নেহময়ী দিগম্বরীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। গোপালচন্দ্র চিন্তিত হইলেন। তবুও দিদিকে কোনও প্রকারে প্রবোধ দিয়া রাত্রি-প্রভাতে জগতের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। ক্রমে পরীক্ষা-বিভ্রাটের কথা সকলই শুনিলেন। কিন্তু ভাইটির সন্ধান কিছুই মিলিল না। মলিন বদনে গোপালকে ফিরিতে দেখিয়া দিদি দিগম্বরী উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। জগৎ বাঁচিয়া নাই, ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। হইবেই তো,—কবিরা বলিয়াছেন—"অনিষ্টাশঙ্কিনী খলু বন্ধু-হৃদয়ানি!" প্রিয়জনের হৃদয় কেবল অনিষ্টই আশঙ্কা করে।

ব্রাহ্মণকান্দাবাসী সকলে বিষণ্ণ হইল। জগদ্বন্ধুর সহপাঠীরা উতলা হইয়া উঠিল। অন্যান্য ছাত্র এবং শিক্ষকেরাও বিশেষ ভাবনাযুক্ত হইয়া পড়িলেন। ভুবনবাবুও চিন্তায় রহিলেন। জলধর সারাদিন কাঁদিল। দুঃখীরাম তিনদিন দোকানের ঝাঁপ খুলিল না। স্বজনের প্রেম বাড়াইবার এই এক কৌশল, —যুগেযুগেই।

অতুলচন্দ্রের পত্র পড়িয়াই গোপালচন্দ্র কলিকাতা রওনা

হইলেন। বড় মামাকে দেখিয়া ক্ষীরোদার কত আনন্দ! পরদিনই জগৎসুন্দরকে লইয়া তিনি যখন রওনা হইলেন তখন ক্ষীরোদা কাঁদিয়া আকুল হইল। অতুলচন্দ্র নিজ-মনের বেদনা চাপিয়া রাখিয়া স্ত্রীর প্রবোধ-বিধান করিতে লাগিলেন। গোপালচন্দ্র ব্রাহ্মণকান্দা পৌঁছিয়া দিদির কোলে জগৎকে দিয়া যেন হাঁপ ছাড়িলেন। হারানিধি বুকে পাইয়া দিগম্বরী-দিদি নবজীবন লাভ করিলেন। তিনদিন ধরিয়া ফরিদপুর জেলা-স্কুল হইতে বদরপুরের প্রান্ত পর্য্যন্ত যে একটা বিষাদের তপ্ত বাতাস বহিতেছিল তাহা শান্ত হইল।

রাঁচি-যাত্রা

জগৎসুন্দর ফরিদপুর-স্কুলে আর পড়িবে না। কোথায় পড়া হইবে? অনেক আলোচনায় ঠিক হইল, জগৎ মেজ-দাদা তারিণীচরণের কাছে থাকিয়া রাঁচি-স্কুলে পড়িবে। তারিণীচরণ তখন রাঁচিতে ইন্‌কম্‌ ট্যাক্সের এসেসর পদে নিযুক্ত। দেবী দিগম্বরীর প্রাণ আন্‌চান্‌ করিতে লাগিল। কি করিয়া জগৎ-সুন্দরকে বিদায় দিবেন, রাঁচিতে জগতের কত কষ্ট হইবে, ইহা ভাবিয়াই দিদি ব্যাকুল হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

জগৎসুন্দর রাঁচিতে রওনা হইতেছে। দিগম্বরী কত দেবালয়ের মাটি তাহার মাথায় মাখিতেছেন, কতবার তাহার শিরে-বুকে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। কত পূজার নির্ম্মাল্য আঁচলে বাঁধিয়া দিতেছেন। একই কথা কত শত বার বলিয়া, কত সদুপদেশ দিয়া দিতেছেন। জগত ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া

তাকায়, পথ চলিতে জানে না, ইহাই দিদির বড় ভয়। কেমন করিয়া পায়ের দিকে তাকাইয়া, চারিদিকের লোকজন গাড়ী-ঘোড়া সামলাইয়া পথ চলিতে হইবে, তাহাই বারংবার বলিতে বলিতে দিদি অঝোরে ঝুরিতেছেন। 'আমার জন্য ভাবিবেন না, বড়দি, আমার কোনও বিপদ নাই'—বলিয়া জগৎসুন্দর দিদির পদধূলি মাথায় লইয়া যাত্রা করিতেছে। বৌদিদিরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যাত্রামঙ্গলের আয়োজন করিতেছেন।

ব্রাহ্মণকান্দা আঁধার হইয়া গেল। পথে জলধর শেষ-দেখা দেখিয়া লইল। 'ধলা বৈরিগী' বলিয়া কে আর আদর করিবে? —ভাবিতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বকুলাল, গদাধর ছটফট করিতে লাগিল। দুঃখীরামের দুঃখের আর অবধি নাই। জগৎচাঁদের চাঁদমুখ না দেখিলে সে যে একদিনও বাঁচে না! সে চাঁদ-অধরে ক্ষীর-ছানা না দিতে পারিলে সে বাঁচিবে কি করিয়া! দুঃখীরামের উজ্জ্বল মুখ কালিময় হইল। প্রিয়জনদের বেদনা-সন্তপ্ত পথ দ্রুতগতি ছাড়াইয়া জগদ্বন্ধুসুন্দর রাঁচি-সহরের স্নিগ্ধ বাতাসে উপস্থিত হইল।

পাগলা ঘোড়া

"প্রমত্ত তুরগ-পৃষ্ঠে হরষিত বন্ধু"।—বন্ধুস্মরণ-মঙ্গল

তারিণীচরণ ভাইটিকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পরম স্নেহ-আদরে সর্ব্ববিধ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বাসায় গৃহলক্ষ্মীরা কেহ আসেন নাই। ভৃত্য ও পাচক ঠাকুর আছে। নূতন স্কুলে নূতন ভাবে জগতের পড়া আরম্ভ হইল। মানুষের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে জগদ্বন্ধুসুন্দর অদ্বিতীয়। অল্প-দিনের মধ্যেই সে অনেকের ভালবাসার রাজ্যের একচ্ছত্রী রাজা হইয়া পড়িল। মানুষ তো মানুষ, উন্মাদ পশুও তাহার শুদ্ধ ভালবাসায় শান্তভাব ধারণ করে। একদিন রাঁচিবাসী তাহা প্রত্যক্ষ করিল।

রায়বাহাদুর রাখালবাবু তারিণীচরণের বন্ধু। বাসাও কাছাকাছি। রায়বাহাদুরের একটি শক্তিশালী ঘোড়া ছিল। শক্তিমান বটে, কিন্তু ঘোড়াটি উন্মাদ-বিশেষ। কেহ তাহাকে দিয়া ইচ্ছামত কোনও কাজ করাইতে পারে না। তাহার পৃষ্ঠে কোনও মানুষ উঠিলে সে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া পাগলের মত ছুট দেয়। এমন ভাল দামী ঘোড়াটা অকেজো হইয়া গেল, এই কথা রাখালবাবু অনেক সময় দুঃখ করিয়া তারিণী-চরণের নিকট বলেন।

কথাটা একদিন জগদ্বন্ধুসুন্দরের কানে গেল। সে অমনি বলিয়া উঠিল—'রায়বাহাদুরের ঘোড়া আমি ঠিক করিয়া দিতে পারি।' এই কথা শুনিয়া তারিণীচরণ ভয়ে ভয়ে বলিয়া উঠিলেন—'জগৎ, এমন দুঃসাহস কখনও করিও না। ও খুনে ঘোড়া, কত বড় বড় সোয়ারকে ফেলিয়া দেয়।' উহার কাছে যাইও

না। ঈষৎ হাসিয়া জগৎ কহিল—'মেজদা, আমার কাছে সিংহও মূষিক হইয়া যায়।' তারিণীচরণ সে কথা কানে না তুলিয়া, পুনঃ পুনঃ তাহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন, যেন ঐ ঘোড়ার কাছে না যায়।

একদিন অপরাহ্নে রায়বাহাদুর কার্য্যস্থল হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, আস্তাবলে ঘোড়াটা নাই। তারিণীচরণ আফিস হইতে বাসায় আসিয়া দেখেন, ঘরে জগৎ নাই। দুইজনে দরজার সিঁড়ির উপর বসিয়া নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে প্রত্যক্ষদর্শী দুই-একজনের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, জগদ্বন্ধু সেই ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছে। এই সংবাদে সকলেই বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। জগতের দেহ কোমল, স্বভাব শান্ত, নিরীহ। দুর্দ্দান্ত ঘোটক নিশ্চয়ই তাহাকে বিপদে ফেলিয়া দিবে—ভাবিতে ভাবিতে তারিণীচরণ বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন। রায়বাহাদুরও মলিন মুখে বলিলেন—'চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমার ঘোড়া যায় যাউক! আপনার ভাইয়ের কিছু না হইলেই বাঁচি।' জগদ্বন্ধু সকলেরই প্রিয়। যে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে, সে-ই তৎপ্রতি আকৃষ্ট। সকলেই ব্যাকুল ভাবে পুনঃ পুনঃ পথ চাহিতে লাগিল। অন্তরে দুশ্চিন্তা, বাহিরে সন্ধ্যা, দুই-ই ঘনাইয়া আসিল।

ঐ যে ধূলি উড়িতেছে। যাহারা দেখিল সবাই চেঁচাইয়া উঠিল—ঘোড়া ফিরিতেছে। অনেকেই মনে করিল, সোয়াড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াই অশ্ব আসিতেছে। চক্রবর্ত্তী, মহাশয়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ধূলি ছাড়াইয়া যতই ঘোড়া নিকটে আসে

জগৎও তত স্পষ্ট হইয়া নয়নগোচর হয়। উৎকণ্ঠিত জনগণের অন্তরের উৎকণ্ঠা, বিষাদ-কালিমা কাটিয়া তথায় উজ্জ্বল আনন্দের উদয় হইল; সকল ভাবনাও কাটিয়া গেল। বিদ্যুৎগতিতে আরোহী-সহ অশ্ব আসিয়া রায়বাহাদুরের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সে-মূর্ত্তি সকলকে চমৎকৃত করিল। সে-দৃশ্য দেখিতে বহু লোক জমিয়া গেল। সে-ঘটনা সহরময় ছড়াইয়া পড়িল।

অশ্বোপরি জগদ্বন্ধুসুন্দর। বীরপুরুষোচিত সুগঠিত দেহ। মাংসের পেশী-সকল ফুলিয়া উঠিয়াছে। রাঙা দেহ আরও রক্তবর্ণ হইয়াছে। সর্ব্ব-কলেবর ঘর্ম্মাক্ত। বন্ধুসুন্দরের একহাতে লাগাম, অন্যহাতে চাবুক। প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, গর্ব্বোন্নত বক্ষ—ঠিক যেন অসুর-রণে ক্লান্ত দেব-সেনাপতি কুমার কার্ত্তিকেয়। উন্মুক্ত অবস্থায় সকলে দর্শন করিল—একটি মনোহর দিব্য বস্তু।

বীর-সুলভ গর্ব্বে কিশোরবন্ধু অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া অবতরণ করিল। তারিণীচরণের ও রাখালবাবুর দেহে প্রাণ আসিল। উভয়ে আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। জগৎসুন্দর ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক চাপড় মারিয়া কহিল—'রায়বাহাদুর, আপনার ঘোড়া আর দুষ্টামি করিবে না।' তারিণীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জগৎ, কতদূর গিয়েছিলি?' 'রাতুর রাজার বাড়ী'—উত্তর করিয়া জগৎসুন্দর ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। রাঁচির প্রিয়জন আশ্বস্ত হইল, পাগলা ঘোড়া শান্ত হইল।

বিষ-প্রয়োগ

পশুর পশুত্ব দূর করিয়া অনেক সময় তাহাকে ভাল করা যায়। মানুষ কিন্তু মনুষ্যত্ব হারাইলে পশ্বাধম হয়। তাহাকে ভাল করা একরূপ অসম্ভব। তাহার ব্যাধি দুরারোগ্য। দেবী দিগম্বরীর বাৎসল্য-সাগরে বাস করিত যে বন্ধু-মীন, সে আজ আসিয়া পড়িয়াছে বেতন-ভোগী ঠাকুর-চাকরের সেবার মরু-ভূমিতে। মরুভূমির প্রখর তাপে মীনের জীবনধারণ যে কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়।

একদিন তারিণীচরণ আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া দেখেন জগদ্বন্ধু যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে; 'দেহ জ্বলে গেল'—বলিয়া মর্ম্মান্তিক কষ্ট প্রকাশ করিতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকাইয়া আনিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন —'আর্সেণিক-বিষের ক্রিয়া।' সুযোগ্য ডাক্তারের উপযুক্ত চিকিৎসায় অল্পসময়ের মধ্যেই দেহের সুস্থতা ফিরিয়া আসিল।

বাসায় ভৃত্য আর পাচক ব্যতীত তৃতীয় লোক নাই। পাচকঠাকুর পূর্ব্বেই পলাতক হইয়াছে। ভৃত্যটিকে কিছু কঠোর শাসন-বাক্য বলিতেই সে সব স্বীকার করিল—ঠাকুর খাবারের সঙ্গে দারমুজ দিয়াছে। 'কারণ বিশেষ কিছু নয়, এই ছোটবাবুটি আসার পর তাহাদের অবাধ চৌর্য্য-কার্য্যে কিছু বাধা উপস্থিত হইতেছিল। হায় রে অর্থ! তোমার প্রতি লালসা মানুষকে কত নিম্নেই নামাইতে পারে!

চাকর যোগাযোগে ছিল বুঝিয়া তারিণীচরণ পুলিশ ডাকাইয়া

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার লাহিড়ী

শ্রীযুক্তেশ্বরী গোলোকমণি দেবী

তাহাদিগকে ধরাইয়া দেবার কথা বলিতেই জগৎসুন্দর বলিল— 'মেজদা, শাস্তিতে শিক্ষা হয় না, অনুতাপেই শিক্ষা হয়। ছাড়িয়া দিলে অনুতাপ হইবে।' জগতের কথায় তারিণীচরণ চাকরকে বিদায় দিলেন। বাসায় পরিবার-পরিজন না থাকিলে জগদ্বন্ধুকে রাখা নিরাপদ নহে। এই চিন্তা তারিণীচরণকে পাইয়া বসিল। জগৎ আদরের ধন, আদর-ছাড়া সে বাঁচিতে পারে না। ইহা মনে করিয়া ভ্রাতৃ-বৎসল তারিণীচরণ জগৎসুন্দরকে পুনরায় ব্রাহ্মণকান্দায় বড় দিদির নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রাঁচি-স্কুলে একটা ভালবাসার প্রাসাদ প্রস্তুত হইতেছিল। অকস্মাৎ তাহাতে যেন কে বাজ হানিল! রঙ্গময়ের রঙ্গমঞ্চের এ দৃশ্য-পরিবর্ত্তন কে বুঝিবে?

পাবনা পদার্পণ

বন্ধুসুন্দর রাঁচি হইতে ব্রাহ্মণকান্দায় উপস্থিত। দেবী দিগম্বরী সমস্ত কথা শুনিলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের দয়ায় জগৎ বিষ খাইয়াও মরে নাই, এই কথা ভাবিতে কৃতজ্ঞতায় দিদির হৃদয় ভরিয়া গেল। জগৎকে কোলের কাছে বসাইয়া গায়ে-পিঠে পুনঃ পুনঃ হাত বুলাইতে লাগিলেন। কতদিন পরে জগৎ আসিয়াছে, দিদি যেন হাতে চাঁদ পাইয়াছেন! আদর আর শেষ হয় না। মুখে হাসি, চোখে জল, চিত্তে আনন্দ। বাৎসল্য-স্নেহে হৃদয় উদ্বেলিত হইল। সকল কথা শুনিয়া গোপালচন্দ্র আবার জগতের পড়ার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন। যাঁহার কথা ভাবনা করাই একমাত্র সাধনা, তাঁহার জন্য যাঁহারাই ভাবিতে

পারিয়াছেন, তাঁহাদেরই জন্মের সার্থকতা। ভাইবোনে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন, জগৎসুন্দর পাবনায় গোলোকমণির কাছে থাকিয়া পড়িবে।

চৈত্রমাস। বাংলা বারশত তিরনব্বই সাল। পাবনা-সহরের রৌদ্র-সন্তপ্ত রাজপথের একপাশ ধরিয়া ধীরে নীরব পদবিক্ষেপে চলিতেছে একটি শুভ্র-বস্ত্রাচ্ছাদিত নব কিশোর। ক্রমে বালকটি ইংরেজী-স্কুলের সম্মুখে আসিল। স্কুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। একই মুহূর্ত্তে শত শত ছাত্রের, শিক্ষকদের সোৎসুক দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। যাহারা দেখিলেন, তাহারা আর চক্ষু ফিরাইলেন না। নয়ন বিস্ফারিত করিয়া, গ্রীবা দীর্ঘ করিয়া তাহারা দেখিলেন। দেখা শেষ হইল, অন্যদিকে ফিরিল কিন্তু আবার ক্ষুধা, আবার ভাবনা,—এ আবার কোন্ দেশের মানুষ! মানুষের দেহে এত রূপ! কি সুন্দর! কি স্নিগ্ধ! যেন কনকচাঁপাটি! ক্লাসে সঙ্গীরা সকলেই মিশিতে চায়, প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে—ছেলেটি কিন্তু সকলকেই এড়াইয়া একপাশে থাকিতে ভালবাসে। অল্প মধুর হাসে। দৈবাৎ একটি কথা কয়। আবার তেমনই ধীরে ধীরে বাড়ীতে ফেরে।

থাকিবার স্থান তাহার লাহিড়ীকুল-প্রদীপ প্রসন্নকুমারের বাড়ীতে। বড় বাড়ী, বড় পরিবার। প্রসন্নকুমার, রমেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের মত পঞ্চ ভ্রাতা একান্নেই আছেন। ভাইদের পরস্পরের প্রাণের মিল ও একাত্মতা আদর্শ-স্থানীয়। দাদা প্রসন্নকুমার সকলের পূজনীয়, গুরুস্থানীয়; দেবী

গোলোকমণি সকলের হিতৈষিণী, মাতৃস্থানীয়া। পরম সুখের সংসার। তাহার মধ্যে সর্ব্বসুখময় জগদ্বন্ধুসুন্দরের শুভ উদয়। সকলের স্নেহের দুলাল জগৎসুন্দর সকলের মাঝখানে আপনার আসন পাতিয়া লইল।

বন্ধুসুন্দরের স্কুলে ক্রমে সহযাত্রী, সহপাঠী, খেলার সাথী মিলিল অনেক। শ্রীশচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র প্রমুখ লাহিড়ী-বাড়ীর যুবক ও ছেলেমেয়েদের সকলেরই জগদ্বন্ধু ছোট মামা। রমেশ লাহিড়ীর ছোট মেয়ে পুণ্টু ও তাঁহার স্বামী আশুতোষ মৈত্র বন্ধুকে ভালবাসেন। আশুতোষ শ্বশুর-বাড়ী থাকিয়াই পড়েন। প্রসন্ন-কুমার ওকালতী করেন। তাহার মুহুরী মাধব তলাপাত্র। তলাপাত্র মহাশয়ের বাড়ী লাহিড়ী-বাড়ীর সংলগ্ন। তলাপাত্র মহাশয়ের কন্যা হেমাঙ্গিণী ও তাঁহার স্বামী হরিদাস রায় বন্ধুর প্রিয়জন। হরিদাসের বাড়ী ভাউডাঙ্গা-গ্রামে, শ্বশুর-বাড়ী থাকিয়াই পড়াশুনা করেন। এইরূপ বিদ্যালয়ের সহাধ্যায়ী ও লাহিড়ী-পাড়ার সমবয়স্ক বহু বালক-বালিকা বন্ধুসুন্দরের পাবনার পাবনী-লীলার প্রথম পরিকর।

পাবনায় পাবনী-লীলা

সত্যসত্যই জগৎ-পাবনের জগৎ-পাবনী লীলার পাবনাতেই শুভ আরম্ভ। একটি ফুল যেন 'ফুটি ফুটি' করিতেছিল। পাবনা আসিয়া ফুলটি ফুটিল। ঐ যে আনমনা ভাব, ঢল ঢল দৃষ্টি, চকিতের মত চমকিয়া চমকিয়া উঠা, নির্জ্জনে একাকী আকাশের দিকে চাহিয়া থাকা, এই সকল অনুভাব যে-হৃদ্‌গত অস্ফুট রসানুভূতির বিকাশ, তাহা ক্রমে পুষ্ট হইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল।

বন্ধু কীর্ত্তন-প্রিয়। কীর্ত্তন করিবার প্রবল আগ্রহ। আগ্রহ দিনের পর দিন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু বাড়িলে কি হইবে, কীর্ত্তন করিবার উপায় নাই। আরম্ভ করিলেই ভাবদশা। কীর্ত্তন শুনিবার লালসা অতি তীব্র। সে-তীব্রতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধি পাইলে কি হইবে, কীর্ত্তন শুনিবার উপায় নাই। একটু শুনিতেই জ্ঞানহারা। ভক্তিমূলক যাত্রাভিনয় দেখিবার সাধ অত্যধিক। সাধও যেমন, সুযোগও তেমনি। পাবনায় বহু যাত্রাভিনয় হয়। কিন্তু সুযোগ থাকিলে কি হইবে, অভিনয় দেখিবার উপায় নাই। একদণ্ড দেখিতে না দেখিতে অস্বাভাবিক মূর্চ্ছা হয়।

জগদ্বন্ধু একটা সন্ত-ফোটা ভক্তি-কমল। ভাববিকারগুলি তাহার ঘন সৌরভ। সে-সৌরভ মধুকর-মণ্ডলীকে নিকটবর্ত্তী করিতেছে। মধুপানে যে আসিতেছে সে আর যাইতে পারিতেছে না। কেহ বাঁধা পড়িতেছে রূপের ফাঁদে, কেহ

মুগ্ধ হইতেছে অকৈতব নির্ম্মল স্নেহের মাধুর্য্যে, আবার কেহ-বা আকৃষ্ট হইতেছে তাহার সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-ধারার প্রবাহে। জগদ্বন্ধু সকলের কাছেই মধুর। কেন মধুর, তাহা বিশ্লেষণ করা বা বোঝানো সম্ভব নয়। এ পর্য্যন্ত যতটুকু বুঝা বা দেখা গিয়াছে তাহা হইতে ইহাই মনে হয়, জীবমাত্রের হৃদয়ে যে-একটা মাধুর্য্যের ক্ষুধা আছে, জগদ্বন্ধুর কাছে গেলেই সেইটি পরিতৃপ্ত হয়; একেবারে কিন্তু মিটে না। ক্ষণেকের জন্য যদিও মিটে, আবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। পাবনায় হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল।

জগৎসুন্দরের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা অতি অদ্ভুত ও সুকঠোর নিয়মানুবর্ত্তী। যে দেখে সেই বিস্মিত হয় এবং সেইরূপ একটা সংগঠিত জীবনের সুখ-আস্বাদনে নিজে লোলুপ হয়। লুব্ধ যাহারা, তাহারা বন্ধুসুন্দরের কাছে উপদেশ-মধু পাইত। বন্ধুর উপদেশ-দান অতি স্বাভাবিক, তাহার মধ্যে যেন চেষ্টা ছিল না। কোনও রকমের নিঃসরণের পথ থাকিলেই জল যেমন পূর্ণ পাত্র হইতে অপূর্ণ পাত্রে গড়াইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ স্বাভাবিক ও সরল ভাবে বন্ধুসুন্দরের উপদেশামৃত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাতে শত শত শূন্য পাত্র প্রতিক্ষণে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

বর্ত্তমান জগতের তরুণ-তরুণীরা অধিকাংশই জীবনের মেরুদণ্ডহীন। সব থাকিতেও তাহাদের অভাব কোথায়, অনেকেই দেখেন না। তরুণপ্রিয় চিরতরুণ বন্ধুসুন্দর তাহাদের আসল অভাবটাকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। অভাব—ওজঃশক্তি স্ফুরণের, ব্রহ্মচর্য্যের—জীবনের মধ্যে ব্রহ্মতেজ-ধারণের।

এই একটি মাত্র মৌলিক অভাবই মানব-জীবনকে অসার করিয়া তোলে। ব্রহ্মতেজের পুঞ্জীকৃত প্রতিমা জগদ্বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে জীবন-গঠনে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ-মধু ক্ষরণ হইতে লাগিল। একদল কিশোর নিবিষ্ট চিত্তে সেই মধু আস্বাদন করিল, সেই আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কন করিয়া লইল, সেই শিক্ষাকে জীবনের মাঝে মূর্ত্ত করিয়া মানুষ হইতে চাহিল।

বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখ হইতে মহাশক্তিপূর্ণ অথচ স্নেহ-করুণামাখা উপদেশ-ধারা প্রবাহিত হইতেছে—

"চৈতন্য লাভ কর। নৈষ্ঠিক হও। ধর্ম্মে জয়যুক্ত হও।" "সদা পবিত্রতা, সদা নিষ্ঠা। নৈষ্ঠিক হইলে কেহ তাহার কাজে বাধা দিতে পারে না।" "বৃথা কথা বলিও না। বৃথা বাক্য-ব্যয়ই দুর্ভাগ্য।" "নিজেকে বড় জ্ঞান করিও, তা' নৈলে কদাচ কিছু করিতে পারিবে না। স্বপদে ও প্রতিষ্ঠায় থাকিও।" "সর্ব্বতোভাবে বপুঃ রক্ষা করিও। শরীর মন ও প্রাণ দ্বারা যথাসাধ্য ধর্ম্মকে রক্ষা করা উচিত। ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইয়া যদি মৃত্যু বা যে কোন প্রকার বিপদ হয়, সেও ভাল। যে সত্যপথে চলে কেহ তার কেশাগ্রও ছুঁতে পারে না! ভয় কি? ব্রহ্মচর্য্য কর ও করাও।"

এই সংসারে উপদেশের প্রয়োজন কম, আচরণশীল আদর্শের প্রয়োজন বেশী। পাবনার তরুণদের ভাগ্যে সেইটিই উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যহীন মানবের ভোগেও যোগ্যতা নাই, ত্যাগেও অধিকার নাই। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় মার্গের সংযোগ-স্থলে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্যের ধ্বজা চাই—অটুট ব্রহ্মতেজ

সংরক্ষণের দৃঢ় সাধনা চাই। জগদ্বন্ধুসুন্দরের কার্য্যে ও বাক্যে এই সত্যই ফুটিয়া উঠিল। অন্তরে সুগভীর ভক্তি-ভাবরসের উন্মেষ, বাহিরে ব্রহ্মবীর্য্যের উদ্বোধন, জগৎসুন্দরের লীলাঙ্কুরের দ্বি-পত্রোদ্গম পাবনাতেই প্রথম।

স্কুলের পড়াশুনায় জগদ্বন্ধুর অভিনিবেশ কমিতে লাগিল। কেবল কীর্ত্তন করা, কীর্ত্তন শোনা, ভক্তিমূলক যাত্রা দেখা। প্রিয়জন লইয়া বনে-জঙ্গলে বসিয়া উপদেশ-দান। ত্রিস্নান, তপস্যা, কঠোর আহার-বিহার। এই সব দিকেই অধিক অভিনিবেশ। কিন্তু সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত যে, জগদ্বন্ধুর পরীক্ষার ফলটি ভালই হয়। সবাই বলাবলি করিত— 'অমন অটুট ব্রহ্মচর্য্য থাকিলে বেশী পুঁথি পড়িতে হয় না।'

হরিদাস হরদয়াল প্রভৃতি পাঁচ-ছয় জন বসিয়া তাস খেলিতেছে। জগৎসুন্দর আসিয়া বলিল—'খেলা রাখ ; চল, ভাই, সবাই কীর্ত্তন করি।' খেলা জমিয়াছে, কেহ কথা শোনে না। অমনি বন্ধুসুন্দর দূর হইতেই কাহার হাতে কোন্ কোন্ তাস আছে সব ঠিক ঠিক বলিয়া দিল। খেলা নষ্ট হইয়া গেল। নেশা যায় না, খেলা আবারও আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে জগৎসুন্দর আবারও সকলের হাতের তাসের খবর সকলকে বলিয়া দিল। আর খেলা চলিল না। সবাই হাসিতে হাসিতে খেলা ছাড়িয়া উঠিল। খোল করতাল আসিল। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল—

"নগরবাসী পুরুষ নারী।
ভজ নিতাই গৌরহরি॥"

কেলিকদম্ব-তলে

"পেখলু শ্যামর ধাম
কুঞ্জ সমীপে নীপ অবলম্বনে
রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম।"—শ্রীঘনশ্যাম দাস

লাহিড়ী-বাড়ীর সম্মুখেই একটি কেলিকদম্ব-বৃক্ষ। বিশাল বৃক্ষ, বহু শাখাপ্রশাখা ছড়াইয়াছে। বৃক্ষবর বহুকাল এখানে দণ্ডায়মান আছেন, যেন-বা কাহারও প্রতীক্ষায়! নিকটে জয়কালী-মাতার মন্দির। মায়াশক্তি মা কালিকাদেবীও যেন কাহারও 'অপেক্ষায় অনেকদিন তাকাইয়া আছেন! আজ দুইজনেরই আকাঙ্ক্ষিত ধন মিলিয়াছে। ঐ দুইটি স্থানই বন্ধুসুন্দরের বিশ্রামের নীড়। মা কালিকাদেবীর মন্দিরে, থাকাকালে প্রায়ই দ্বার রুদ্ধ থাকিত। অভ্যন্তরে গুন্ গুন্ স্বরে গান চলিত—

"এস হে ওহে পাগলা কালী
লয়ে প্রেমের ডালি।
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হে
তুমি গণপতি অংশুমালী॥
তুমি বিলাও এসে প্রেমসুধা হে
আপনি মা হ'য়ে মালী॥
তুমি পুরাও এসে মনোসাধ হে
না ক'রে মা চতুরালী॥
তোমার সুত জগদ্বন্ধু যাচে হে
দাও মা চরণের কোটালী॥"

কাত্যায়নী যোগেশ্বরীর নিকট 'প্রেমের ডালি' চাহিয়া

জগৎসুন্দর কেলিকদম্বের তলে আসিয়া দাঁড়ায়। "মধুবাতা-ঋতায়তে"—অমনি বিশ্ব মধুময় হইয়া মাধুরী-ধারা ঢালিতে থাকে! কেলিকদম্বে হেলান দিয়া জগৎসুন্দর দণ্ডায়মান। ঈষৎ ভঙ্গিম ঠাম। ঐটি বুঝি-বা ঐ বৃক্ষেরই গুণ। দুইয়ের অঙ্গ-স্পর্শে দুইয়েরই পুলক। বৃক্ষরাজ পুলকে সকল ফুল ফুটাইয়া দিয়া হাসির ছটায় দিক উজ্জ্বল করে। মন্দ পবন গন্ধ বহন করিয়া আকাশ-পথ আমোদে মাতায়। ভ্রমর গুঞ্জরণ তুলিয়া কদম্বের ফুলেফুলে উড়ে। বিহগের কাকলী প্রাণ আকুল করে! সমস্ত মিলিয়া একটা মাধুর্য্যের হাট। অনুভবী ছন্নমতি ভক্ত অপরোক্ষ নেত্রে দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—

"কেলিকদম্ব-তলে কন্দর্প-দলন।
স্বর্ণ-প্রতিম বন্ধু পরাণ-রমণ॥
মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-রাণী বিলুণ্ঠিতা হায়।
রাশি রাশি রাকাশশী নখে শোভা পায়।"

পাবনার রাজপথ ধরিয়া লোক চলিতেছে। যে দেখিতেছে সে-ই লোলুপ নেত্রে তাকাইয়া রহিয়াছে। বড়-ছোট, পুরুষ-নারী, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী নির্নিমেষ নয়নে সে রূপ-সুধা পান করিতেছে। তাঁহাদের অন্তর যেন মহাজনের ভাষায় বলিতেছে—

"কাঞ্চন-দরপণ বরণ সুগোরা রে
বরবিধু জিনিয়া বয়ান।
দু'টি আঁখি নিমিখ মূরখ বড় বিধি রে
না দিল অধিক নয়ান॥

লাহিড়ী-পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছোট মামার সৌন্দর্য্যের ছটায় মুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া আছে। সকলের আগে পুণ্টু, তাহার পার্শ্বে হেমাঙ্গিনী, তাহাদের আশেপাশে পিছনে কামিনী, বিনী, মাধু, শান্তি আরও কতজন্। হঠাৎ বন্ধুসুন্দরের ঢল ঢল দৃষ্টি তাহাদের দিকে পড়িল। অমনি যেন কোন্ দেশের কাহাদের কথা উদ্দীপন হইল। অমনি কর্ণ স্থির হইল, কাহার যেন মধুর সঙ্গীত শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে জগৎসুন্দর নিজেই গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল—

"কদম্বের বনে থাকে কোন জনে
কেমন শবদ আসি'।
একি আচম্বিতে শ্রবণের পথে
মানসে রহিল পশি'॥
না জানি কেমন সেই কোন জন
এমন শবদ করে।
না পাইয়া তারে হৃদয় বিদরে
রহিতে না পারি ঘরে॥"

পূর্ব্বরাগবতী বৃষভানু-কুমারীর ভাব-বিভাবিত ঢল ঢল বন্ধুসুন্দর ! ঐ দেখ, "সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ-পানে, না চলে নয়ন-তারা।" আবার, "হসিত বদনে চাহে মেঘ-পানে কি কহে দু'হাত তুলি।" পুণ্টুরা গম্ভীর হইয়া তাকাইয়া থাকে। কখনও-বা হাসে, কিছু বোঝে না, ভাবে ছোট মামা কি পাগল ! নিজে নিজে কি কথা বলে, হাত তোলে, আকাশ দেখে ! দেবী গোলোকমণি

আসেন, দাঁড়াইয়া দেখেন। দিদি জানেন, জগতের বাল্যকাল হইতেই এই আনমনা ভাব। সেইটাই পাবনা আসিয়া একটু বদলিয়া গিয়াছে। দিদি ডাকেন—জগৎ! জগতের সাড়া নাই।

খোল-করতাল বাজাইয়া একদল বালক কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। কীর্ত্তনের রোল শুনিয়াই জগৎসুন্দর কাঁপিতেছে। কীর্ত্তন নিকটে আসিল। শোনা গেল—

"ভজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ॥"

বন্ধুসুন্দর সুনিপুণ নাটুয়ার মত নাচিতেছে। কীর্ত্তনের তালে তালে অঙ্গ দুলিতেছে। কি অঙ্গভঙ্গী! নয়নে কি জলধারা! কেলিকদম্ব শাখা দোলাইয়া কীর্ত্তন-রঙ্গে চামর ঢুলাইতেছে। জয়কালী মা প্রেমের ডালি লইয়া মন্দির হইতে জয়ধ্বনি দিতেছেন। হঠাৎ জগৎসুন্দর ধরাস্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য, মুখে ফেনা উঠিতেছে। গোলোক-মণি হায় হায় করিয়া কোলে তুলিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। মনে ভাবিতে লাগিলেন—পাড়ার সবাই জানে যে, কীর্ত্তন শুনিলে আমার জগৎ এমনই অস্থির হইয়া যায়, তবু ইহারা এমনই কীর্ত্তন করিয়া এখানে আসিবে!

———

মাতৃরূপে

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব"

শরৎকাল। মেঘমুক্ত আকাশে নক্ষত্র-পরিবেষ্টিত নিশাকর কিরণধারা ঢালিয়া তাঁতিবন্দ গ্রামের রাস্তাঘাট উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। জগজ্জননী মা-দুর্গার শুভ আগমনে লাহিড়ী-জমিদারদের বাড়ীখানি আনন্দময়। পাবনার বাসা হইতে ছেলেমেয়েরা, বধূরা ও কর্ত্তা-গিন্নীরা সবাই গ্রামের বাড়ীতে আসিয়াছেন।

মা-জগদম্বার পূজার উৎসবানন্দে সমস্ত বাড়ীখানি মুখরিত। মন্দিরে পুরোহিতগণ চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। বাদ্যকরেরা শানাই-বাঁশী-ঢাক-ঢোল বাজাইতেছে। কাছারী-ঘরে আমলা কর্ম্মচারীরা কোলাহল করিয়া হাটবাজারের ফর্দ্দ করিতেছে। পাড়ার লোক নূতন কাপড় পরিয়া প্রতিমা দর্শন করিতেছে। কর্ত্তাবাবুরা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া করযোড়ে মন্দিরের সম্মুখে 'মা মা'-শব্দে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভক্তি নিবেদন করিতেছেন। পুরনারীগণ রন্ধন-ঘরের কোলাহলে ব্যস্ত থাকিয়াও কাঁসর-ঘণ্টার বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি দিয়া সদর ও অন্দর উভয় বাড়ীর আনন্দের সমতা রক্ষা করিতেছেন। এই সময় বালক-বালিকাদের দল কি করিতেছে? তাহারা তাহাদের ভালবাসার ধন জগদ্বন্ধুসুন্দরকে সাজাইতেছে।

মহাষ্টমীর দিন। একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে জগৎসুন্দরের সাজ হইতেছে। কেহ কাহাকেও বলে নাই। কোন পরামর্শ নাই।

স্বাভাবিকভাবে কাজ হইতেছে। কেহ কাপড় আনিতেছে। কেহ শাড়ী আনিতেছে। কেহ অলঙ্কার আনিতেছে। কেহ-বা পরচুলা আনিতেছে। কেহ সিন্দুর গুলিতেছে, কেহ-বা কাজল তৈয়ার করিতেছে। কেহ কপালের টিপ আনিতেছে, কেহ আলতা আনিতেছে। যাহার যাহা প্রাণে চায়, ভাল লাগে, সে তাহাই আনিয়া বন্ধুসুন্দরকে সাজাইতেছে। সাজিতে সাজিতে বালক জগদ্বন্ধুসুন্দর পরমা সুন্দরী বালিকা হইয়া যাইতেছে।

নাকে নোলক, কানে দুল, চোখের তলে কাজল-রেখা। কটিতে কাঞ্চী, কণ্ঠে হার, বাহুতে কঙ্কণ, মণিবন্ধে বালা। আলতা-পরা পায়ে বাঁকা মল। পরিধানে রঙ্গীন সাড়ী। মাথায় পরচুলা বিন্যস্ত করা হইল। সিঁথি বানাইয়া তাহাতে সিন্দুর দেওয়া হইল। অর্দ্ধমস্তক অবগুণ্ঠনাবৃত হইল। ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি! কাহারও আর চিনিবার উপায় রহিল না।

রঙ্গের ঠাকুরের যত রঙ্গ, সবই ভালবাসার দায়। কালো-বরণ গৌর হইল, তাহাও ভালবাসার দায়। বংশী-ধরা কোমল হাতে কঠোর বংশের দণ্ডধারণ, তাহাও ভালবাসার দায়। আজও প্রিয়জনদের ভালবাসা যেমন সাজাইল, তেমনি সাজ সাদরে গ্রহণ করিতে হইল। সমুদ্র-মন্থনের সুধাবণ্টনের জন্য জগন্মোহনের জগন্মোহিনী বেশ। আজ বুঝি-বা স্বীয় মাধুরী-সুধা বণ্টনের জন্য জগদ্বন্ধুর এই জগদম্বা-সাজ। সাজও যেমন, আবেশও তেমন। ভিতর-বাহির এক হইয়া গেল। একবিন্দুও কৃত্রিমতা রহিল না।

কাজল-মাখা আকর্ণ আঁখি বিঘূর্ণিত করিয়া সেই হর-রামা

বামাজাতির দৃষ্টিভঙ্গিতে চাহিলেন। মহিষমর্দ্দিনী রণসাজে সজ্জিতা নহেন। মেনকা-তুলালী উমা যেন মদন-সঙ্গে পিনাকীর তপস্যা ভঙ্গ করিতে চলিয়াছেন। প্রিয় সখীরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া সঙ্গে চলিতেছে। শোভাযাত্রার সঙ্গে শঙ্খ-ঘণ্টা ঢাক-ঢোল আসিয়া মিশিয়া যাইতেছে। ধূপের গন্ধ, ঘৃতের বাতি, বামা-কণ্ঠের কাকলী, প্রাণ-চুরি-করা চাহনী সব মিলিয়া মিশিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়-মনোহর একটি অভিনব দৃশ্য প্রকট হইয়াছে।

যে দেখিল, তাহারই সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল—আজ মহা-অষ্টমীর দিন, মা সাক্ষাৎ মণ্ডপ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছেন। কিন্তু এ মা যে প্রতিমা নহেন, জীবন্ত! তাহা দেখিয়াও কাহারও সন্দেহ অবকাশ পাইতেছে না। সকলেরই অনুভব, আজ তাঁতিবন্দ-বাসীকে কৃতার্থ করিবার জন্য মা প্রত্যক্ষীভূতা হইয়াছেন।

অপরূপ শোভাযাত্রা বাড়ীর প্রত্যেক গৃহের অঙ্গন-প্রাঙ্গন ঘুরিয়া সদর-বাড়ীতে আসিল। সদর-বাড়ী ছাড়িয়া প্রতিবেশী অপর এক জমিদার-বাড়ীতে যে-তুর্গোৎসব হইতেছিল সেখানেও গেল। বহু নরনারী ছুটিয়া আসিল। শোভাযাত্রা আবার মণ্ডপ-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল।

সকলেই ভূতাবিষ্টের মত দেখিতেছে। কেহ করযোড়ে প্রণাম করিতেছে। কেহ দণ্ডবৎ নতি করিতেছে। কেহ তুর্গতিহারিণীর নিকট তুর্গতিমোচন যাচ্ঞা করিতেছে। কেহ প্রাণ ভরিয়া অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতেছে। কেহ আরতি করিতেছে, কেহ প্রদক্ষিণ করিতেছে, কেহ-বা করতালি দিয়া মনের প্রগাঢ় আনন্দে বাতাসা ছড়াইতেছে। কেহ-ই

চিনিতেছে না। যাহারা সাজাইয়াছে তাহারাও যেন ভুলিয়া গিয়াছে। গুরুজনেরাও যুক্ত-কর। অন্যের কা কথা, দেবী গোলোকমণি পর্য্যন্ত প্রণতা। দূরস্থ কোনও কোনও বাল্যসখা সংবাদ পাইয়া মনে করিয়াছিল, ঐ রাজবেশের জন্য হাসি-তামাসা করিবে, কিন্তু সম্মুখে আসিয়া তাঁহার অপলক দেবদৃষ্টি দেখিয়া তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইল। তাহারা আবিষ্টের মত শ্রদ্ধায় প্রণত হইল। কেহ জানে না—এ কে! যাহার যেমন ভাব সে তেমনই ভাবে। তাহাদের সকলের ভাবনা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরেরর ভাষায় বলি—

"সিন্ধু হ'তে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহ গৃহিণী কি জানকী আইলা॥
কিংবা মহালক্ষ্মী, কিংবা আইলা পার্ব্বতী।
কিংবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মুর্ত্তিমতী॥
কিংবা ভাগীরথী কিংবা রূপবতী দয়া।
কিংবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া॥
এই মত অন্যোন্যে সর্ব্ব জনে জনে।
না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে॥"

মধুর খেলা বহুক্ষণ পরে শেষ হইল। যাঁহারা মানসনেত্রে দেখিতে জানেন, তাঁহারা অদ্যাপি দেখেন—হরি হর-কামিনী সাজে রূপসুধা ছড়াইয়া ভবক্ষুধা মিটাইতেছেন।

অগ্নি-শিখা

"অন্তর্ভানীহ যাবন্তি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।
ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেঽদৃষ্টং বিপশ্যতঃ ॥"

—শ্রীঅক্রুর

রাত্রি প্রভাত হইলেই নবমীপূজা। লাহিড়ী-বাড়ীর লোক-জন সপ্তমী অষ্টমী দুইদিনের খাটুনীতে ক্লান্তদেহ। এখন পর্য্যন্ত সবাই নিদ্রাবিভোর। রজনী প্রায় শেষ। অষ্টমী শশী বহু পূর্ব্বে বিদায় লইয়াছে। অন্ধকার যেন এলোকেশীর মুক্তকেশ। জোনাকী পোকাগুলি আঁধারের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছে। একজন পূজারী ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের নিদ্রা টুটিয়াছে। প্রভাত মনে করিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

দেখিলেন, পূর্ব্বাকাশে অরুণের আভাষও দেখা দেয় নাই। প্রভাতী তারাগুলি একটির পর আর একটি উদয়শিখরে উঁকি দিতেছে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, সকাল সকাল স্নান সমাপন করিয়া পূজার যোগাড় করিব।—এই ভাবিয়া তিনি শৌচান্তে স্নানের ঘাটে অবতরণ করিয়াছেন।

'ও কি! জলের ভিতর ও বস্তুটি কী?' ব্রাহ্মণ চমকিত! তথাপি সাহসে ভর করিয়া দুই-তিনটি সিঁড়ি অবতরণ করিলেন। 'এ কি! জলে আগুন জ্বলিতেছে কেন? এ যে জলে আগুন! এ কি কোনও জ্যোতিষ্কের প্রতিবিম্ব?' ব্রাহ্মণ আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, তাহা তো নহে! ব্রাহ্মণের শরীর কণ্টকিত হইল। একবার উপরে, একবার নীচে, একবার পার্শ্বে ভীত-বিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তবে কি এ ভৌতিক

ব্যাপার ? জলের মধ্যে দাউ দাউ অগ্নি জ্বলিতেছে ! ব্রাহ্মণের ভয় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। পরে, কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'জলে আগুন লেগেছে ! জলে আগুন !'

চীৎকারে অনেকের ঘুম ভাঙিল। ক্রমে ঘাটে লোক জমিতে লাগিল। নরনারী অনেকে আসিল। সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিল—জলমধ্যে প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা ! সকলেরই ভয়ের উদয় হইল। সিঁড়ির শেষ-ধাপে নামিয়া জলের কিনার পর্য্যন্ত গিয়া কেহই তথ্য-নির্দ্ধারণে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে না। অবশেষে একটি সাহসী যুবক কতকটা সাহসে ভর করিয়া কম্পিত পদে জলের কিনারায় গিয়া উপস্থিত হইল। কিছু সময় নিরীক্ষণ করিয়া সে বলিয়া উঠিল—'আগুন নয়, মানুষ ! একজন মানুষ বসিয়া আছে, তাহার গায়ের তেজ—ভীষণ তেজ, ঝল্‌ঝল্‌ করিতেছে।' তখন অনেকেই নিকটস্থ হইয়া স্ব-স্ব-চক্ষে দেখিল। যাহার যেরূপ মনের মত কল্পনা তাহাই করিতে লাগিল। জলস্পর্শ করিতে সকলেরই সঙ্কোচ হইতে লাগিল।

হঠাৎ বালসূর্য্যের প্রভাকে ম্লান করিয়া একটি পুরুষ জল-মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিল। সিক্ত বসনেই অতি দ্রুতগতি সে ভিতর-বাড়ী চলিল। রূপের ছটায় সকলের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া গেল। শরীর রোমাঞ্চ হইল। বিস্ময়-রসটি যেন মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁতিবন্দের পুকুরপারে আত্মপ্রকাশ করিল। যাহারা চিনিবার, তাহারা চিনিল। যাহারা চিনিল না, তাহারা জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—'ইনি কে ?'

যাহারা চিনে বলিয়া মনে করে, তাহারা চিনাইয়া দিল—

'ইনি কর্ত্তা-মার কনিষ্ঠ। দেশ, বোধ হয়, ফরিদপুরে।' চিনি যে তাহাও নয়, চিনি না যে তাহাও নয়—এই দুইয়ের বাহিরে আমরা ক্ষুদ্র জীব, কেবল হতভম্ব হইয়া দেখি—

"প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা জলকূপে বন্ধু।"—বন্ধুস্মরণ-মঙ্গল

ভাবময়

পাবনা-সহরের মধ্য দিয়া ইছামতী-নদী চলিয়াছে। নদীর জলে সোণালী রং ঢালিয়া দিয়া প্রভাত-রবি উদিত হইয়াছে। তীরবর্ত্তী তরু-শাখার নৈশ আশ্রয় ছাড়িয়া পাখীরা খাদ্যান্বেষণে উড়িয়াছে। ঠাকুর-বাড়ী মঙ্গল আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা এইমাত্র থামিয়াছে। এমন সময় ইছামতী-নদীর ঘাটে একটা কোলাহল উঠিল। ঘাটের স্নানার্থীরা একস্থানে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে! ব্যাপার কি?

লাহিড়ী-বাড়ীর জগদ্বন্ধু জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। তোলা হইয়াছে। এখনও হুঁস হয় নাই। ঘন ঘন কম্প হইতেছে, আর রোমকূপ দিয়া রক্তবিন্দু ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কেহ বলে অনেক জল খাইয়াছে, কেহ বলে মাথায় রক্ত উঠিয়াছে; কেহ বলে মূর্চ্ছা গিয়াছে, কেহ বলে মৃগীর ব্যাধি আছে। মাধব তলাপাত্র মহাশয়ের জামাতা হরিদাস বলিতেছে—'না মৃগী নয়, গান শুনিয়া এরূপ হইয়াছে। আমি সব জানি এবং সব দেখিয়াছি। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমরা যাত্রাগান শুনিতে গিয়াছিলাম। প্রহ্লাদ-চরিত্র-পালা। প্রহ্লাদ যখন বধ্যভূমিতে ঘাতকের অসির নীচে নতজানু হইয়া গান ধরিল—"আর কবে

দেখা পাব যুগলরূপ একাসনে”—সেই সময়ই জগদ্বন্ধুর মূর্চ্ছা হয়। সে অস্বাভাবিক মূর্চ্ছা। যাত্রা শেষ হইবার পর পর্য্যন্ত আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া সুস্থ করি। তারপর অনেক রাত্রে বাড়ী আসিয়া শয়ন করি। আজ সকালে আমরা স্নান করিতে আসিয়াছি। জগদ্বন্ধু যখন স্নান শেষ করিয়া তীরে উঠিতেছিল, তখন নদীর ওপারে কে যেন গানের সুরে টান দিয়াছে, ঐ সেদিনকার প্রহ্লাদের গান—“আর কবে দেখা পাব যুগলরূপ একাসনে।” যেইমাত্র গান শোনা, অমনি মূর্চ্ছা। এই তো ব্যাপার!

যাহারা তখন ঘাটে ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেরাত্রে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তাহারা সকলেই বিশ্বাস করিল। যাহারা জগদ্বন্ধুর স্বভাব কিছুমাত্র জানিত, তাহাদেরও অবিশ্বাস করিবার উপায় রহিল না। জনৈক বৃদ্ধ বৈষ্ণব বলিলেন—‘তোমরা হরিনাম কর। দেখ না, কিরূপ সাত্ত্বিক বিকার, কিরূপ রোমাঞ্চ হইতেছে।’—এই বলিয়া তিনি নিজেই হাতে তালি দিয়া ‘হরি বোল’ ‘হরি বোল’ বলিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকেই তাঁহার সঙ্গে ‘হরি বোল’ বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বন্ধুসুন্দর চক্ষু মেলিয়া বসিল এবং মাথা দোলাইতে লাগিল। তারপর দাঁড়াইয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া দুলিতে লাগিল। নেত্র-রসায়ণ ভঙ্গিমা-দর্শনে সকলে মুগ্ধ হইল। তারপর সঙ্গীরা বন্ধুকে হাত ধরিয়া বাসায় পৌঁছাইয়া দিল।

প্রাতঃস্নান করিয়া ফিরিতে জগতের বিলম্ব দেখিয়া দিদি গোলোকমণি অনেক চিন্তিতা হইয়াছিলেন; বালকদের কাছে

সকল কাহিনী শুনিয়া বিশেষ উদ্বিগ্না হইলেন। জগৎকে আর কিছুতেই যাত্রাগানে বা কীর্ত্তনে যাইতে দিবেন না, ইহা মনে মনে ঠিক করিলেন এবং সমস্ত ছেলেদিগকে বলিয়া দিলেন।

দেবী গোলোকমণি সত্য সত্যই গোলোকের মণি। তাঁহার হৃদয়খানি অগাধ স্নেহের সিন্ধু। তাঁহার মাতৃত্ব বিশ্বজোড়া। পূজা-অর্চ্চনা, সংসারের সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পাড়াপ্রতিবেশীর ভালমন্দ সব দেখিয়া-শুনিয়া নিজের আহারে বসিতে তাঁহার প্রত্যহই তৃতীয় প্রহর অতীত হয়। বাড়ীর আশেপাশে একটা কুকুর বা বিড়াল পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিলে তিনি আহার করিতে পারেন না।

অপরাহ্ণ-বেলা। দিদি সবেমাত্র আহার করিতে বসিয়াছেন। তখন নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে খোল-করতালের শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। জগৎসুন্দর কীর্ত্তনের সাড়া পাইয়াই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। দিদি টের পাইয়াই বলিলেন—'জগৎ, কীর্ত্তনে যাইও না।' দিদির কথায় গমনোদ্যত বন্ধুসুন্দর বসিল। দিদি আহার শেষ করিয়া আসিয়া দেখেন, জগৎ আবার যাইবার জন্য প্রস্তুত। জগতের ভাব-অবস্থা দেখিয়া দিদি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জগৎ তো কীর্ত্তনে যায় না, কীর্ত্তনই জগৎকে টানিয়া নেয়। এত জোরে টানিয়া নেয় যে, সে আর আত্মবশে থাকে না। দিদি ঠিক করিলেন—সে যাহাই হউক, জগৎকে আজ আর কিছুতেই যাইতে দিব না। এইরূপ ঠিক করিয়া তিনি বন্ধুসুন্দরকে দালানের একটি প্রকোষ্ঠে তালা বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

নিরুপায় জগৎসুন্দর কুঠরীর অভ্যন্তরে থাকিয়াই কীর্ত্তনের তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিল। দিদি শব্দ পাইয়া জানালা দিয়া উঁকি দিলেন। আহা কি অপূর্ব্ব নৃত্য! ভাইটির শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্য ও নটন-ভঙ্গি দেখিয়া দিদি চিত্র-পুত্তলির মত অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে জগতের মাথা দেয়ালে ঠেকিল। অমনি সে ভাবের দেহটি বিহ্বল অবস্থায় মেজেতে পড়িয়া গেল। পড়িয়াই মূর্চ্ছা। দিদি ত্রস্ত পদে ছুটিয়া গিয়া তালা খুলিলেন; সংজ্ঞাহারা জগৎসুন্দরের মাথাটি কোলে তুলিয়া হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জগতের সম্বিত ফিরিল। অমনি আবার, সে যে-দিক হইতে কীর্ত্তনের ধ্বনি আসিতেছে সেই দিকে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হইল। অগত্যা দিদি সঙ্গে একটি লোক দিয়া জগৎকে কীর্ত্তন-স্থলীতে পাঠাইয়া দিলেন। লোকটিকে শতবার বলিয়া দিলেন—সর্ব্বদা কাছে থাকিবে ও চোখে চোখে রাখিবে।

এক ঠাকুর-বাড়ী প্রভাতী কীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তনের আনন্দ-কোলাহল শুনিয়া বন্ধুসুন্দর হরিণের মত উৎকর্ণ হইতেছে। তারপর ঐ যে মাতালের মত ছুটিয়া চলিল। বাড়ীর প্রাঙ্গন ছাড়াইতে না ছাড়াইতে অজ্ঞান অবস্থায় নর্দ্দমার মধ্যে পদস্খলন হইল। দিদি 'হায় হায়' করিতে করিতে ছুটিয়া গেলেন। সকলে ধরিয়া সংজ্ঞাহীন দেহ ঘরে আনিল। অলৌকিক ভাব-বিকার-সমূহ আজ স্পষ্টতর ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল।

সকলে ভাব দেখিয়া বিস্মিত। দিদির চক্ষুস্থির। বন্ধুসুন্দরের সর্ব্বাঙ্গে অপরিমিত ঘাম ঝরিতেছে। মুখে লালা ক্ষরণ হইতেছে। চক্ষু শিবনেত্র হইয়া গিয়াছে। স্বর্ণবর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া হিক্কা উঠিতেছে ও সর্ব্বাঙ্গ ভয়ানক ভাবে কাঁপিয়া উঠিতেছে। ভয়ে-ভাবনায় প্রসন্নকুমার, দেবী গোলোকমণি ও অন্যান্য সকলে বিকল হইয়া পড়িলেন। সঙ্গিগণ আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। সারাটি দিন একই-ভাবে কাটিল। অনেক রাত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল। তখন সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

কঠিন-কোমল

বন্ধুসুন্দরের আচরণ ও নিষ্ঠার আদর্শ অতীব কঠোর। নিত্য নিয়মিত স্নান তিনবার। নিরামিষ আহার। শ্রীগোবিন্দের প্রসাদ-গ্রহণ। ঘড়ি ধরিয়া ঠিক ঠিক সময়ে পূজাহ্নিক। আসনাদি করাই চাই। মস্তকে ছোট ছোট গাঢ় কৃষ্ণ-ঘন কেশ। আড়ম্বরহীন বেশ। আপনার শয্যা, বস্ত্র, জলপাত্র পৃথক। কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না! কাহারও বস্তু স্পর্শ করা হয় না! সবাইকে মর্য্যাদা দিয়া কথা বলা—একটা কুকুর-বিড়াল, একটা ঘটি-বাটিকে পর্য্যন্ত। অটুট ব্রহ্মচর্য্যের মূর্ত্তি আপন জ্যোতির ছটায় আপনি উদ্ভাসিত। ভজন, নিষ্ঠা, তপশ্চর্য্যা ও পবিত্রতা একাধারে সম্মিলিত।

বন্ধুসুন্দরের আচরণে অনেকেই অনুপ্রাণিত। আবার

তাহার আব্দারে, অনুরোধে, অনুনয়-বিনয়ে অনেকে তৎপ্রদর্শিত পথে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলিতে আরম্ভ করিত। শেষে চলিতে চলিতে কি যেন একটি অপার্থিব বস্তুর লোভ তাহাকে পাইয়া বসিত। প্রিয় সঙ্গীরা একই প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে। কেহ নিকটবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম করিতেছে, কেহ-বা নিকটবর্ত্তী বাড়ীতে আছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাহাদিগকে ডাকিয়া উঠানো চাই-ই। শীত গ্রীষ্ম বারমাস সবাইকেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিতে হইবে। যাহারা উঠিতে আলস্য দেখায় তাহাদিগের হয় শাস্তি। তাহারা যখন দেরী করিয়া উঠিতে যায়, তখন দেখে একের কাপড়ের সঙ্গে অন্যের পায়ের সঙ্গে বাঁধা। উঠিতে গিয়া টানাটানি পড়িয়া যায়। হাসির তরঙ্গ উঠে। সকলে বোঝে, ইহা বন্ধুসুন্দরেরই কাণ্ড,—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে না উঠার শাস্তি।

অতি কঠোর তপশ্চর্য্য-পরায়ণ মানুষ প্রায়শঃ শুষ্ক হইয়া থাকে। তাহাদের ব্যবহারের মধ্যে রস থাকে না। কাছে গেলে নীরস কাষ্ঠের মত মনে হয়। বন্ধুসুন্দর কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। আচরণের কঠোরতা ও স্বতন্ত্রতার সঙ্গে ব্যবহারের সরলতা ও মধুরতার মিলন,—অভিনব সামগ্রী। রসে ঢল ঢল মানুষটি অথচ তাঁহার জীবনের ব্রতগুলি বজ্রবৎ সুদৃঢ়। দেহ-মন-প্রাণ তিনই সদ্যতোলা নবনীত-কোমল ; অথচ দৈনন্দিন কর্ম্মধারাগুলি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত। এই দুইটি ভাবধারা গঙ্গা-যমুনার মত 'মিশে মিশে মিশে না', অপূর্ব্বগতিতে প্রবাহিত হয়। কড়ি-কোমলের মিলনে বন্ধুর জীবন-সঙ্গীতটি রাগিণী-মুখর।

ক্ষ্যাপা

পাবনা-সহরে কেবল একটিমাত্র স্থান আছে যেখানে জগৎ-সুন্দরের ভালবাসা ও তপস্যা এই দুই মিলিয়া সর্ব্বতোভাবে একত্বপ্রাপ্ত হয়। কেবল তাহাই নহে, শুষ্ক তপস্যা যেন রসের ভালবাসার ভয়ে পলায়ন করে ও কেবল একচ্ছত্রী ভালবাসার তপস্যা রাজত্ব করে। মাধুর্য্যের অমিয়প্রবাহ প্রবল হইয়া স্বাতন্ত্র্যকে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

সেই স্থানটি পাবনা-সহরের উপকণ্ঠে একটি বৃদ্ধ বটের ছায়াতলে। সেখানে একটি জরাজীর্ণ ভগ্ন কদর্য্য দালান আছে ; তাহারই একটি পুতিগন্ধময় প্রকোষ্ঠে। কথাটা অদ্ভুত বটে, সকলের কাছেই অদ্ভুত ঠেকে ; কিন্তু অত্যদ্ভুত হইলেও, অসত্য নহে। ঐ স্থানে থাকে এক ক্ষ্যাপা—ছাই-চাপা প্রবল অগ্নি, বীভৎসতা-ঘেরা একটি মহারত্ন। জহুরীই জহর চিনে। তাছাড়া চিনিবে কে ?

ক্ষ্যাপার বাড়ী-ঘর কোথায় কেহ জানে না। বহু দেশের ভাষায় সে কথা কহিতে পারে। তাহার বয়স যে কত কাহারও অনুমান করিবার উপায় নাই। সহরে বৃদ্ধশ্রেণীর যাঁহারা, তাঁহাদের অনেকেরই ঠাকুরমার বিবাহ সে দেখিয়াছে। যেখানে যত বড় অন্ধ দীঘি আছে সেগুলির খননের সময়কার কথা সে প্রত্যক্ষদর্শীর মত বর্ণনা করে। যে-দেশের যাহার কথাই বল না কেন, তাহাকেই সে চিনে। কেবল যে চিনে তাহা নহে, কাহার ছেলে কোথায় বিবাহ করিয়াছে, কাহার

কখনও-বা অশ্লীল শব্দ বলে কখনও-বা বিনা-অপরাধে কাহারও চতুর্দ্দশ-পুরুষের উপর রোষপূর্ণ গালি বর্ষণ করে। তবুও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি দাহিকাশক্তি ত্যাগ করে না। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী তাহার আশেপাশে মধুমক্ষিকার মত ঘুরিতে থাকে। তাহাতে গভীর জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া দু'দশজন জ্ঞানীও নির্জ্জনাবসরে তাহার চরণ-ধূলির প্রত্যাশী হয়। ক্ষ্যাপার নাম হারাণ। সে হারানো-ধন বন্ধুসুন্দরও খুঁজিয়া বাহির করিল।

'জগা' ও 'শিব'

কয়েক দিন যাবত প্রেমের ঠাকুর জগদ্বন্ধুসুন্দর ক্ষ্যাপার কাছে আসা-যাওয়া আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষ্যাপার নাম হারাণ, সবাই তাহাই ডাকে। বন্ধুসুন্দরের আদরের দেওয়া নাম—'বুড়োশিব'। জগদ্বন্ধুসুন্দরকে কেহ ডাকে জগৎ, কেহ ডাকে বন্ধু। ক্ষ্যাপার আদরের ডাক 'জগা'! ক্ষ্যাপা কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'জগা রে জগা জগা রে জগা' এইরূপ বলিতেই থাকে। জগদ্বন্ধুসুন্দর যখন তাহার কাছে না থাকে, তখন ঐ ডাক শুনিয়া লোকে ভাবে ক্ষ্যাপা বন্ধুকে স্মরণ করিতেছে। কিন্তু জগদ্বন্ধুসুন্দর যখন সম্মুখে বসিয়া, তখনও ঐরূপ পুনঃ পুনঃ ডাকের তাৎপর্য্য যে কি লোকে বোঝে না। কেবল রসিক যাঁহারা তাঁহারা জানেন উহার মধ্য দিয়াই ভালবাসার গভীর আস্বাদন।

নামের দ্বারা নামীকে পাওয়া যায়। নামের দ্বারা প্রেমধন

লাভ হয়। কিন্তু প্রেম-প্রাপ্তি ও নামীর দর্শন পাইবার পরেও নামের প্রয়োজন থাকে। থাকে, প্রেমের সহিত প্রেমাস্পদকে আস্বাদন করিবার জন্য। সে-টি যে কেমন, তাহা প্রত্যক্ষ করা যাইত 'শিব' আর বন্ধুসুন্দরের রহস্যময় মিলনের মধ্যে। বন্ধু বলিতেছে 'শিব রে', শিব বলিতেছে "জগা রে"—শুধু এই উত্তর-প্রত্যুত্তর ঘণ্টা ধরিয়া চলিতেছে। ইহার মাঝে কি আস্বাদন, যে জানে সে-ই জানে।

দুইজনের মধ্যে পরিচয় যেন কত কালের! দুইজন যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচিত আপন-জন! এই মতই প্রথম আলাপন। ক্রমে ঐ স্বাভাবিক প্রীতির গাঢ়তা যখন প্রকট হইল, তখন তাহা এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, শিবের কাছে বন্ধুসুন্দর বসিয়াই আছে। শিব বন্ধুকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, বাহু-বেষ্টনে কণ্ঠটি জড়াইয়া ধরিয়াছে। দুইজনের কানে দুইজনে কত প্রাণের কথা বলিতেছে। দুইজনের কথায় দুইজনার দেহে পুলক-কদম্ব দেখা দিতেছে। এত যে কি অফুরন্ত কথা দুইজনকেই আত্মহারা করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কে জানে,—জানিবেই বা কিরূপে?

কি আশ্চর্য্য দেখ, চির-স্বতন্ত্রতা-প্রিয় জগৎসুন্দর 'শিবের' সঙ্গে একশয্যায় শয়ন করিয়া আছে। আর সে কী শয্যা! সে যে শ্মশানের পরিত্যক্ত মূর্ত্ত কদর্য্যতা। তাহার মধ্যেই শেফালী-শুভ্রকান্তি পবিত্রতার প্রকট প্রতিমাখানি নির্ব্বিকার চিত্তে শয়ন করিয়া আছে। কেবল নির্ব্বিকার চিত্তে নহে, পরম আনন্দে, যেন কত তৃপ্তির সহিত। 'শিব' কত আদরে

দুই হাতে তাহার প্রাণপ্রেষ্ঠ 'জগা'কে বুকে জড়াইয়া রহিয়াছে। দুইজনে বিড়্ বিড়্ করিয়া কথা কহিতে কহিতে যেন কোন্ এক রসের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। এ-দেশের চন্দ্রসূর্য্যও সে-রাজ্যের খবর রাখে না। দুইটি মিশিয়া একটি প্রেম-বিহ্বলতার ঘনীভূত মূর্ত্তি হইয়াছে। হঠাৎ শিব প্রস্রাব করিয়া দিয়াছে!

'শিব রে, ও কি করিস্?'

'আরে বড় টাল (শীত), গরম কইরা লই।'

শিবের কথায় বন্ধু হাসিয়া গলিতেছে, কিন্তু তাহার বাহু-বন্ধন ছাড়িয়া উঠিতেছে না। কেতকী-কুসুমের মধু, মধুব্রত কণ্টক-ক্ষত হইয়াও লুটিয়া লয়। প্রেমের পরশে এত মধু যে, তাহা আর সকল-কিছুই অগ্রাহ্য করিতে পারে।

'শিব' মাঝে মাঝে লাহিড়ী-বাড়ী আসে। দেবী গোলোকমণি তাহাকে বিশেষ যত্ন করিয়া আহারাদি করান। দিদির মুখের দিকে চাহিয়া 'শিব' বলে—'দিদি আমার দেশের নোক (লোক)।' আবার বলে—'ছ্যাখ্ দিদি, জগাও মানুষ নয়, আমিও মানুষ নই। জগা রাজা, আমরা সব প্রজা।' দিদি কিন্তু এ সব হেঁয়ালী-কথা বোঝেন না, তবু শোনেন, কারণ ক্ষ্যাপার কথাগুলি এত মিষ্ট যে, শুনিতে দিদির বড় মধুর লাগে।

ক্ষ্যাপার এই সব রহস্য বুঝিবে কে? শুনিয়াছি, কোনও মরমীভক্ত শ্রীবন্ধুর মরমের কথা গোপনে শুনিয়াছিল—'শিব সাক্ষাৎ শিব। গৌরলীলার সীতানাথ। মহাপ্রভুর লীলা অপ্রকট হইবার পর হইতে ছদ্মবেশেই আছেন।' এইরূপ গোপন রহস্য দুই-একটি বাহির হইয়া পড়িলে, তবেই বোঝা যায় অত

গলাগলি ঢলাঢলির গোড়ার কথা কি ? শান্তিপুরের বুড়া আর নদীয়ার গোরা না হইলে কি অমন জোড়া হয়! রৌদ্র-রসাবতার নরসিংহদেবের পার্শ্বে প্রহ্লাদ দাঁড়াইলে, রৌদ্র-বাৎসল্য-মিলনে এক অভিনব মাধুরী হইয়াছিল। স্বর্গপথে দেবতারা তাহা দেখিয়াছিলেন। আজ মলমূত্র-দুর্গন্ধ-ভরা বীভৎস-রসের বিগ্রহ বুড়োশিবের কোলে সখ্যরসাবিষ্ট প্রেমঘন-বিগ্রহ বন্ধুসুন্দর শয়ন করিলে প্রীতি-রসমাধুরী যেন উজ্জ্বলতর রূপে জীবন-লাভ করে। যেন কালো পটভূমিতে রঙীন চিত্র! যেন শিবসুন্দরের মিলন-পটে রসাল সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপ! যেন ক্ষীরোদধি-কূলে হরি-হরের একাত্মতা! জগৎপতি পশুপতির জয় হউক!

'ভৃগু-পদ-চিহ্ন'

দেবী গোলোকমণির সর্ব্বকর্ম্ম-মধ্যে জগদ্বন্ধুসুন্দরের চিন্তা। দেবী একটি মাতৃত্বের প্রকটীভূত প্রতিমা। বন্ধুধন তাঁহার ভালবাসা-রাজ্যের কেন্দ্র। সেই কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বের সীমান্ত-পরিধি পর্য্যন্ত যেন একটা অফুরন্ত প্রীতি-প্রবাহ দেবীর হৃদয় জুড়িয়া। তাঁহার স্নেহের শীতল ছায়ায় যাহার আসিবার ভাগ্য-লাভ হইয়াছে, সে-ই সুস্নিগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

জগতের ক্রম-পরিবর্ত্তন দিদি লক্ষ্য করেন। মন ভাল লাগে না। যেখানে-সেখানে যখন-তখন জগতের এমন মূর্চ্ছাদশা দিদিকে বড় বেদনা দেয়। জগতের স্নানের সময় ঠিক থাকে না, আহারের সময় ঠিক থাকে না, কথা

জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাওয়া যায় না। তাহার মন যেন সব সময় তাহার কাছে থাকে না। স্নেহময়ী সকল সময় জগতের অবস্থার কথা চিন্তা করেন।

মাঘমাসের দিন। প্রবল শীত। এই শীতেও কিন্তু শেষ-রাত্রে জগৎ স্নান করিবেই। দিদি কি করিবেন ?—সে কোনও বাধাই মানে না। সকালে স্নানে গিয়া কোনও কোনও দিন ফিরিতে জগতের অনেক দেরী হইয়া যায়। কোথায় যায়, কি করে, সকলই রহস্যাবৃত। আজও বেলা প্রায়-মধ্যাহ্নের কাছাকাছি। জগৎ এখনও ফিরে নাই। দিদি গৃহকার্য্য করিতে করিতে দণ্ডে শতবার গবাক্ষপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। হরিণীর মত উৎকর্ণ হইয়া চারিদিকের কথা শুনিতেছেন—কোনও সাড়া পাওয়া যায় কিনা।

ঐ যে জগৎসোনা আসিতেছে শুষ্ক বেশ, রুক্ষ কেশ, বস্ত্রাবৃত ধূলি-মলিন দেহ। কোথাও কীর্ত্তনাবিষ্ট হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি করিয়া থাকিবে, তাই বুঝি এমন অবস্থা। জগৎ আসিয়াই বলিতেছে—'দিদি স্নানটা করিয়া আসি' দিদি জগৎসুন্দরের হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন। "জগৎ, তোকে কেমন দেখায় রে!" নিজের শরীরটার দিকে নিজে তাকাস্ না। তোর কেবল স্নান আছে, তিন-চারবার। গায়ে তেল মাখা নাই, গা রগড়ানো নাই, কেবল কি ডুবাইলেই হয়! আজ আর নদীতে স্নান করা হইবে না, আজ তোকে গায় তেল মাখিয়ে, ঘরে গরম জলে শরীর মেজে স্নান করিয়ে দেবো। এই কথা বলিতে তে দিদি ভাইটির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

বন্ধুসুন্দর তখন—'না ছোড়্দি, তেল দেবো না, আমি তেল কিছুতেই মাখবো না'—বলিতে বলিতে, হাতখানি ছাড়াইয়া লইল। হাত ছুটিয়া যাইতে দিদি তৎক্ষণাৎ কাপড় ধরিয়া ফেলিলেন। জগতের অনিচ্ছাসত্ত্বে দিদি কোনও দিন কোনও কাজ করেন না। আজ তাহার মঙ্গল-চিন্তা আর সব বিচার ঢাকিয়া দিয়াছে। সোনার চাঁদ ভাইটি কেমন হইয়া গিয়াছে! শীতের দিনে গায়ে তৈল না মাখিলেই দেহ ঐরূপ রুক্ষ দেখায়, ইহা দিদির দৃঢ় বিশ্বাস। তাই তৈল আজ মাখাইতেই হইবে। ইহাতে আবার জগতের মতের অপেক্ষা কিসের? নিজের কিসে ভাল তাহা সে বিন্দুমাত্রও বোঝে না। সারাদিন গায় কাপড়-ঢাকা থাকা উহার এক অদ্ভুত স্বভাব। শরীরে হাওয়া-বাতাস না লাগিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। ইহাও দিদি কিন্তু জানেন, জগৎ বোঝে না। জগৎসুন্দর ভাইটি তাহার কত যে সুন্দর, তাহা জগতের সকলে দেখিতে পায় না। গায়ের কাপড় তাহার বাঁধা। সর্ব্বদা গায়ে কাপড়, দিদির ভাল লাগে না। তাই কি আজ জগতের অনিচ্ছার ভাব দেখিয়াও, দিদি তাহার গায়ের কাপড় ধরিয়া টানিতেছেন?

বন্ধুসুন্দরের গায়ে কাপড় দেওয়া, সে-ও এক অভিনব ব্যাপার। অন্য দশজনের মত নয়। কোন্ দিক দিয়া নিয়া কি-ভাবে যে তাহা জড়ানো তাহা কিছুতেই বুঝা যাইত না। সেই গাত্র-আলিঙ্গিত বস্ত্রখানির পারিপাট্য যেন একজন সুনিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত আলেখ্যের মত! গায়ে তৈল মাখাইবেন বলিয়া দিদি কাপড় ধরিয়া টানিতেছেন। কাপড় কিছুতেই সে

দুর্লভ অঙ্গ-সঙ্গ ছাড়িতেছে না। জগৎসুন্দর নিজেও কাপড়ের পক্ষেই। যাহাতে না খুলে, সেই তাহার চেষ্টা। টানাটানিতে জগৎ প্রথমে বসিয়া পড়িল। সুযোগ পাইয়া দিদি কাপড় অনেক আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। জগতের বিশাল বক্ষ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল।

আর কাপড় টানা হইল না। দিদির হাত অবশ হইয়া আসিতেছে। চক্ষু স্থির হইয়া স্পন্দনহীন হইয়া পড়িতেছে। মুখে কেবল—'বাপ্‌রে এ কী, বাপ্‌রে এ কী'—আতঙ্কগর্ভ শব্দ! দিদির দেহ-তরু কাঁপিতেছে। তিনি যেন কি দেখিয়াছেন! তিনি নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না—সংজ্ঞাহারার মত পড়িয়া গেলেন।

অবসর পাইয়া চতুর-চূড়ামণি জগৎসুন্দর উঠিয়া দাঁড়াইল। স্থানভ্রষ্ট গাত্রবস্ত্রকে আবার সাদরে স্বস্থানে রক্ষা করিল। দিদির কপালে কোমল কর-পদ্ম বুলাইতে বুলাইতে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" উচ্চারণ করিতে লাগিল। মলয়জ সুশীতল জগৎসুন্দরের করতলের অমৃতময় স্পর্শ পাইয়া দিদি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন।

'ও কি রে জগৎ! তোর বুকের উপর ও কী দেখিলাম?'

'কিছু না, দিদি!'

'কিছু না কি রে? আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি।'

'দিদি, যাহা দেখিয়াছেন, উহাকে বলে ভৃগু-পদ-চিহ্ন।'

'ভৃগু-প-দ-চি-হ্ন!'

'হাঁ দিদি, কাহাকেও বলিবেন না। ঐ জন্যই তো বুকের কাপড় খুলি না।'

জগৎসুন্দর এই বলিয়া ধাঁ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। দিদি তাকাইয়া রহিলেন। ভাবিলেন, ওটা বোধ হয় জন্ম-দাগ। দিদি দাগটার গুরুত্ব ক্রমে হালকা করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিলেন। তবে জগতের গলায় যে একটা অপূর্ব্ব মালা দেখিয়াছেন, সেটির সৌকর্য্য ও সৌরভের কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। দিদি মনে করিলেন—'জগৎকে কতজন কত ভালবাসে। কী যত্ন করিয়াই না মালাটি গাঁথিয়াছে! আমি আর উহাকে কতটুকু আদর করিতে পারি!' ঐশ্বর্য্যের ঝলক দর্শনে দিদির দৈন্য আসিল।

'মাতুল শ্রীহরি'

দেবী গোলোকমণির কন্যা শশীমুখীর বিবাহযোগ্য বয়স। পিতা প্রসন্নকুমার নানাস্থানে যোগ্য বরের অনুসন্ধান করেন। পাবনা-সহরেই একটি বিশিষ্ট ঘরে ভাল বর জুটিল। কথাবার্ত্তা ঠিক। কাল পাকা-দেখা, আশীর্ব্বাদ পাঠানো হইবে। হঠাৎ জগৎসুন্দর বলিল—'দিদি, এ বিবাহ হইবে না।' পাকা-দেখা বন্ধ থাকিল। পাঁচ-সাতদিন পরে প্রসন্নকুমার গোলোকমণিকে কহিলেন,—'দেখ, ছেলেমানুষের কথায় কাজটা বন্ধ রাখা ভাল হইল না। কালই পাকা দেখার কার্য্য শেষ করিব।' উভয়ের মত হইল। সকালে সংবাদ আসিল ভাবী সেই বরের কলেরা হইয়াছে। তৎপর চারি-পাঁচদিনের মধ্যে তাহার জীবনলীলা শেষ হইল। জগৎসুন্দর প্রসন্নকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—'কেমন, বিবাহ দিলেন না?' সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

গোলোকমণি দেবী পরম পতিসেবা-পরায়ণা ছিলেন। পতিহারা হইয়া কোনও দিন সংসারে থাকিতে হইবে, একথা কখনও মনে জাগিলে তাঁহার বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ করিয়া উঠিত। সাধ্বী রমণী-মাত্রেরই উঠে। সাধু-সন্ন্যাসী বা জ্যোতিষী পাইলে দিদির একটিমাত্র প্রশ্নই জিজ্ঞাস্য ছিল। 'আমি সধবা মরিতে পারিব তো?' সবাই বলিত—'মা, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; তোমার কখনও বৈধব্য হইবে না। তবু দিদির মন মানে না। মানুষের মন মন্দটাই ভাবে। ঘরের মধ্যে একটা কাঠের সিন্দুকের উপর বন্ধুসুন্দর বসিয়া আছে। কি জানি কি ভাবিতে ভাবিতে রাঙা চরণ দোলাইতেছে। দিদি হঠাৎ আসিয়া বলিলেন—'জগৎ, তুই বল্ তো, আমি এই ভাবে মরিতে পারিব কি না?' জিজ্ঞাসামাত্র উত্তর আসিল—'দিদি, তুমি মাস ছয়েক কষ্ট পাবে।' শুনিয়া দিদির বুকের মধ্যে যেন একটা কঠোর আঘাত লাগিল।

এই কথাবার্ত্তার প্রায় ত্রিশ বৎসর পর ৺কাশীধামে প্রসন্নকুমার দেহরক্ষা করেন। গোলোকমণি দেবী পুত্রকন্যাগণকে কাছে ডাকিয়া বলেন—'জগৎ ত্রিশবৎসর আগে যাহা বলিয়াছিল তাহাই হইল। তাহার কথা অনুসারে আমি আর ছয়মাস বাঁচিব।' ঠিক ছয়মাস পূর্ণ হইতেই দেবী পরাৎপর-ধামে গমন করিলেন: মহাযাত্রাকালে দেবী প্রবোধকুমার, সুশীলকুমার, শশীমুখী প্রমুখ সকল সন্তান-সন্ততিগণকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—'তোমরা সৎপথে থাকিও। তোমাদের জীবনে কোনও বিপদ হইবে না। যদি কখনও তোমাদের মনে হয় যে,

কোনও বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের 'মাতুল শ্রীহরি'কে স্মরণ করিও। দিদির পুত্রকন্যাগণ আজ পর্য্যন্ত সেই 'মাতুল শ্রীহরি'কে হৃদয়ে ধরিয়া নির্ভয়ে সংসার পথে চলিতেছেন।

দেবী গোলোকমণির দুইটি ভাব। জগৎসুন্দর কাছে থাকিলে এক ভাব, দূরে থাকিলে অন্য ভাব। ভাইটি যখন দূরে থাকে, দিদি তখন ভাবেন—'জগৎ কিছুতেই মানুষ নহে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান।' ভাইটি যখন কোলের কাছে থাকে, দিদি তখন তাহাকে সামান্য বালক-ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারেন না। অলৌকিক যাহা-কিছু দেখিয়াছেন সব যেন কোথায় ডুবিয়া যায়, মনেও থাকে না। দূরে গেলে সেগুলি ভাসিয়া উঠে। বাৎসল্যের বারিধি-মধ্যে ঈশ্বর-বুদ্ধি এইরূপ একবার তলায়, একবার উপরে, একবার ডুবে, আর একবার ভাসে! এইতো খেলা!

আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয়া

মানব-সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া জগদ্বন্ধুসুন্দরের হৃদয়ে বেদনা জাগিয়াছে। শারীরিক মানসিক শতপ্রকার আধিব্যাধিতে মানব ক্লিষ্ট। ইহার কারণ কি? দূর করিবার উপায়ই বা কি? বন্ধুসুন্দর বলেন—'ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই দুঃখের কারণ। ব্রহ্মশক্তির সংরক্ষণই শান্তির নিদান।' সত্যসত্যই ব্রহ্মচর্য্যহীন নর-নারীর জীবন অশেষবিধ সন্তাপের আকর। নর-নারীকে বীর্য্যবান করিতে হইবে। সাধনা ও তপস্যাদ্বারা বীর্য্যবান হইয়াই মানুষ সুখদুঃখের উপরে উঠে। তখনই শান্তির স্নিগ্ধ বাতাসে প্রাণ-জুড়ানো তৃপ্তি আসে। ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বীর্য্যলাভের আর পথ নাই। দেহে যে ওজঃশক্তির উদ্বোধন হয়, যথাযথ সংরক্ষিত হইলে, তাহা জীবন-যুদ্ধে লৌহবর্ম্ম-সদৃশ সহায়ক হয়। ত্যাগের ভূমিতে দাঁড়াইয়া যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, ভোগভূমিতে সে-ই কৃতকার্য্য। এই শক্তি-সঞ্চয়নের যথাযোগ্য কাল কৈশোর। বিশ্ব-কল্যাণব্রতী বন্ধুসুন্দরের ইচ্ছাশক্তি নিয়োজিত হইল কিশোরদের মধ্যে শক্তিধারণের সাধনা-প্রবর্ত্তনে।

বন্ধুসুন্দরের কাজ শুধুমাত্র বক্তৃতা করা বা নিরন্তর উপদেশ দেওয়া নহে। তাহার স্বকীয় জীবন-ধারাই তরুণ সমাজের নিকট সহস্র গ্রন্থ হইতে উজ্জ্বল শিক্ষাপ্রদ ও কার্য্যকরী। বন্ধুর ভাস্বর মূর্ত্তি, উদাত্তগম্ভীর ভাব ও সুপবিত্র সরলতামাখা আচরণ—স্বভাবতঃই অন্য হৃদয়ে তদনুকরণ ও অনুশীলনের প্রেরণা জাগাইয়া

তুলিত। পাবনায় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। বন্ধুর সুদীপ্ত আদর্শের আকর্ষণে দলে দলে তরুণ বালকগণ উন্মুখী হইয়া উঠিল। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ইহারই পাশাপাশি একটা আসুরিক শক্তির বিক্ষোভ দেখা দিল।

ছাত্রদের অভিভাবকগণ অনেকেই ক্ষিপ্ত হইলেন। সকলের মিলিত পরামর্শে সিদ্ধাত হইল যে, জগদ্বন্ধু তাঁহাদের ছেলেদের ভবিষ্যত নষ্ট করিতেছে। প্রথমতঃ ছেলেদের উপর শাসন চলিল। তাহা বিন্দুমাত্র ফলপ্রসূ হইল না, বরং বাধাপ্রাপ্ত স্রোতবেগের মত ক্রমে বাড়িয়াই চলিল। অভিভাবকদের বিরুদ্ধতায় তরুণদের উদ্যম নব উন্মাদনা লাভ করিল। শেষ-পর্য্যন্ত ভোগসর্ব্বস্ব অভিভাবকদল ঠিক করিলেন—জগদ্বন্ধুকে পাবনা-ছাড়া করিতেই হইবে, নতুবা ছেলেদের আর রক্ষা নাই। একদিকে প্রবল প্রতিক্রিয়া, অন্যদিকে প্রবলতর আকর্ষণ, পাবনায় নীরব-যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

ক্ষমার দেবতা

দুইচারি দণ্ড বেলা হইয়াছে। বন্ধুসুন্দর একাকী ইছামতী-নদীতে স্নান করিতেছে। জন-কতক লোক হঠাৎ শার্দ্দূল-গতিতে ছুটিয়া আসিল। মূর্ত্তিমান দুষ্কৃতি-স্বরূপ তাহারা বন্ধুসুন্দরকে জলের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। যেন পদ্মের পলাশে বজ্রপাত হইল! অসুরের আয়োজন চিরকালই সুরের প্রাণ-নাশের জন্য কিন্তু সুর যে মরে না; সে ক্ষত হয়, কিন্তু হত হয় না; সাময়িক আহত হয়, কিন্তু তাহার শাশ্বত সাধনা ব্যাহত হয় না।

এতগুলি দানবের হাতের বজ্রমুষ্টি হইতে বন্ধুসুন্দর হঠাৎ কেমন করিয়া খসিয়া গেল। কেমন করিয়া যে সে অত্যাচার-কারীদের দৃঢ় বন্ধন ও বেষ্টনী ছাড়াইয়া ছুটিয়া পলাইল, তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শিকার ছুটিয়া গেলে হিংস্র-প্রকৃতির জীব আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাহাই হইল। বন্ধুসুন্দর ছুটিয়া পলাইলে তাহারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। জগৎসুন্দর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া লাহিড়ীদের ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিল। পশ্চাদ্ধাবনকারী দুষ্কৃতকারিগণ বাড়ীর একটি ভৃত্যকে আদেশ করিল—'জগদ্বন্ধুকে ধরিয়া আন্।' তাহাদের আদেশানুযায়ী ভৃত্য বন্ধুসুন্দরের অনুসরণ করিল। তাহারা অদূরে অপেক্ষায় রহিল।

দৈবক্রমে ঐ সময়ে ঠাকুর-ঘরে দেবী গোলোকমণি বসিয়া পূজা-আহ্নিক করিতেছিলেন। জগৎসুন্দর হাঁপাইতে হাঁপাইতে

আসিয়া দিদির কোলের কাছে বসিয়া পড়িল। দিদি দেখিলেন, জগৎ যেন ভীতিবিহ্বল! কারণ কি, ভাবিতে না ভাবিতে দিদির আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি দেখিলেন একজন ভৃত্য জগৎকে তাড়া করিয়া লইয়া আসিয়াছে, যেন তাহাকে ধরিতে উদ্যত।

দিদি গোলোকমণির হৃদয়খানি হিমবন্ত হিমালয় অপেক্ষাও স্নিগ্ধশীতল। জীবনে কাহাকেও কটুবাক্য কি করিয়া বলে কখনও জানেন না! কিন্তু, আজ এমনই একটা কল্পনাতীত বিসদৃশ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল, যাহাতে সমুদ্রকেও বেলাভূমি অতিক্রম করিতে হইল। দুঃখে ও রোষে দিদির স্নিগ্ধ শুভ্র মুখমণ্ডল রক্তরাঙা মধ্যাহ্ন রৌদ্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অতি তীব্র ভাষায় দিদি বলিলেন—'তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা' তুই বাড়ীর চাকর হইয়া আমার ভাইকে তাড়া করিয়া আসিয়াছিস্? ভয়ে জড়সড় হইয়া ভৃত্যটি একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। দুইহাত জোড় করিয়া সে বলিল,—'মা ঠাকরুণ, আমার কোনও দোষ নাই, বাবুরা আমাকে পাঠাইয়াছেন।'

লজ্জায়-ভয়ে মাথা হেঁট করিয়া চাকর চলিয়া গেল! জগতের দেহ তখনও কাঁপিতেছে। দিদি গোলোকমণির দুইটি চক্ষু তপ্ত অশ্রুতে ভরিয়া যাইতেছে। তাঁহার অন্তরে ক্ষোভ ও দুঃখের ঝঞ্ঝা বহিতেছে। ঘূর্ণীবাত্যার প্রকোপে যেমন নদীর জল তীর ভূমিকে প্লাবিত করে, ক্ষোভের বাত্যাঘাতে গোলোকমণির অশ্রুপ্রবাহ তেমনই তাঁহার নয়ন-নদীর কূল ছাপাইয়া বক্ষভূমিকে ভাসাইতেছে। সে অশ্রুর তপ্তস্পর্শে ক্রোড়স্থ জগৎসুন্দর

চমকিয়া উঠিল। শ্রীবদন ফিরাইয়া গ্রীবা ঈষৎ উন্নত করিয়া পদ্মনয়ন উন্মীলন করতঃ বন্ধুমণি দিদির মুখের দিকে তাকাইল। গম্ভীর সমুদ্রে বেদনার বান ডাকিয়াছে, সেই দিকে জগৎসুন্দরের দৃষ্টি পড়িল। একখানি কোমল বাহু-দ্বারা দিদির কণ্ঠ জড়াইয়া, অপর কর-কিশলয়ে দিদির নয়ন দুইটি মুছাইয়া দিতে দিতে করুণ কণ্ঠে প্রেমের দেবতা কহিল—'দিদি, আপনি এ কি কর্ছেন! কাঁদ্ছেন? আপনি শিব পূজা কর্তে ব'সে এমনি চোখের জল ফেল্ছেন! আপনি এমন কর্বেন না। দিদি, আপনার চোখের জল শিবলিঙ্গের উপর পড়্লে যে ওঁদের ভীষণ অকল্যাণ হবে!'

সেই নদীয়ার রাজপথের গোলোকীয় দৃশ্যের আর-একটি বিচিত্র আলেখ্য, আজ পাবনায় লাহিড়ী-বাড়ীর এক ছোট ঠাকুর-ঘরে প্রকট হইয়া, আপন সুষমায় ও মহত্ত্বে আপনি শোভা পাইতে লাগিল।

———

হরির লুট

ভগিনী গোলোকমণির পাবনার বাড়ীতে আজ দেবী দিগম্বরী আসিয়াছেন। একটি অন্নারম্ভ-উৎসব-উপলক্ষে আসিয়াছেন। দিগম্বরী দেবী লোকপরম্পরায় শুনিলেন যে, জগৎসুন্দরকে মারিবার জন্য বিশিষ্ট লোকদের ষড়যন্ত্র চলিতেছে! তাহা শুনিয়া দেবীর শরীর শিহরিয়া উঠিল, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি জগৎকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণকান্দায় চলিয়া আসিলেন।

দিগম্বরী পথে আতঙ্কিত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ ভাবিতে লাগিলেন —জগতের নিশ্চয়ই কোনও গ্রহবৈগুণ্য ঘটিয়াছে, নতুবা এমন দুঃসময় কেন উপস্থিত হইল! অথবা নিশ্চয়ই কোনও দেবতা রুষ্ট হইয়া থাকিবেন, কোনও দেবতার চরণে তাঁহার কোনও অপরাধ হইয়া থাকিবে। ভাবিতে ভাবিতে স্নেহময়ীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—এক সময় জগদ্বন্ধুকে ওজন করিয়া হরির লুট মানত করিয়াছিলেন মা রাসমণি দেবী; দিদির যতদূর মনে পড়িল, মা দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহা আর দিয়া যাইতে পারেন নাই। কথাটা দেবীর ধূ-ধূ মনে পড়িতে লাগিল। জগদ্বন্ধুর সর্ব্বপ্রকার গ্রহবৈগুণ্যের কারণ যে একমাত্র উহাই, এ সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ব্রাহ্মণকান্দায় পৌঁছিয়াই স্নেহময়ী দিদি জগদ্বন্ধুর ওজনে হরি লুটের ব্যবস্থা করিলেন।

হরির লুটের কথা শুনিয়া হরিনাম-প্রিয় বন্ধুসুন্দরের আনন্দ ধরে না। সকলেরই উল্লাস। আত্মীয়-স্বজন ও ভৃত্যদিগকে

সঙ্গে লইয়া গোপালচন্দ্র দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্যৈষ্ঠমাস। আম, কাঁঠাল, কদলী, তরমুজ ইত্যাদি বহু প্রকারের ফল সংগৃহীত হইল। বড় বড় ঝাঁকা বোঝাই করিয়া বাতাসা আসিল—জগদ্বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে তুলিতে হইবে।

বড় দাঁড়িপাল্লা আসিল। একদিকে জগৎসুন্দর উপবেশন করিলেন, অপর দিকে হরির লুটের দ্রব্যসম্ভার উঠিতে লাগিল। একদিন দ্বারকার মহিষী সত্যভামাদেবী ভাণ্ডারের যাবতীয় ধন-রত্নের সঙ্গে যাঁহাকে ওজন করিতে গিয়া অকৃতকার্য্যতার লজ্জায় মুখ ঢাকিয়াছিলেন, আজ ব্রাহ্মণকান্দার বাড়ীতে ভগ্নী দিগম্বরীর হাতে ফলমূলের সঙ্গে তাঁহারই তৌল হইতেছে। দিদি কিন্তু লজ্জা পাইলেন না। একে তো তাঁহার গুরু-স্নেহের কাছে জগৎ-সুন্দর চির অধীন; তদুপরি হরির লুট-আখ্যায় দ্রব্যসামগ্রী হরিনামময় হইয়া যাওয়ায় তৎসঙ্গে নামীর অধীনতা কিছু অস্বাভাবিক হইল না। মোটকথা, এ যে বিশ্বম্ভরকে ওজন করিতেছেন, স্নেহান্ধতায় দিদি তাহা জানিতে পারিলেন না। দুই রকম অন্ধেরাই তাঁহাকে চিনে না—মায়ান্ধ আর প্রেমান্ধ। এই না-চেনার ফলে প্রথম শ্রেণীর লভ্য নিদারুণ দুঃখ, দ্বিতীয় শ্রেণীর লভ্য নিবিড় রসানুভূতি।

নানাস্থান হইতে কীর্ত্তনের দল আসিল; কত রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গে কীর্ত্তনে আনন্দের ঢেউ খেলিল। বন্ধুসুন্দরের শ্রীঅঙ্গেও কত ভাবের লহরী খেলিতে লাগিল। কখনও নৃত্যগোপালের নৃত্য, কখনও দোলগোবিন্দের দোলন, কখনও বেতসীলতার মত কম্পন, কখনও সংজ্ঞাহীন কাষ্ঠ-কঠিন দেহের স্তম্ভন। সকলেই

দেখিল, সাক্ষাৎ নামের দেবতা সারা রজনীব্যাপী নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে খেলিয়া বেড়াইল।

হরির লুট পরমানন্দে পরিসমাপ্ত হইল। ভাবময় বন্ধুসুন্দরের দর্শন-প্রসাদ, কীর্ত্তনোন্মাদনার আনন্দ-প্রসাদ, মধুময় ফুলবাতাসার হাতভরা মুখভরা তৃপ্তি-প্রসাদ, তিন প্রসাদে তিন চারিশত লোক কৃতকৃতার্থ হইয়া বাড়ী ফিরিল।

শান্তিপুরে

"জয় শান্তিপুরচন্দ্র সীতা-জীবন" —শ্রীবন্ধুহরি

'দিদি, এবার ত হরির লুট দিলেন, আমার আর এখন কোনও বিপদ হইবে না।' বিপদবারী বন্ধুসুন্দর স্নেহকাতরা দিদিকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া ব্রাহ্মণকান্দা হইতে যাত্রা করিল। জগৎসুন্দর শান্তিপুর-অভিমুখে চলিয়াছে। কি যে কারণ, কেহই জানেন না। জীবজগৎকে শান্তিপুরে লইবার জন্যই শান্তির দেবতার আসা-যাওয়া। সে আসা-যাওয়ার মধ্যে শান্তিপুরের দান অনেক! শান্তিপুরের তুলসী দলেই আসা, শান্তিপুরের তরজার বিদায়েই যাওয়া। শান্তিপুরের বাউলই "বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল" বলিয়া নদীয়ার বাউলকে বিদায় দিয়াছে। আজ এ নব বাউল কি পাবনার বাউল বুড়োশিবেরই কোনও ইঙ্গিতে শান্তিপুরের 'হাটে' সেই 'চাউলের'ই দাম জানিতে চলিয়াছে? কে বলিবে?

শান্তিপুর পৌঁছিয়া কোথায় কি কাজ হইল, সত্যসত্যই কেহ জানে না। হঠাৎ শান্তিপুরবাসী দেখিল এক সোনার বরণ তরুণ

কিশোর শ্রীশ্রীগোবিন্দ রায়ের মন্দিরের জগমোহন আলো করিয়া পদ্মাসনে বসিয়া আছে। শ্রীগোবিন্দ রায় আনন্দমোহন মৈত্র মহাশয়ের গৃহ-দেবতা। মৈত্র মহাশয় বন্ধুসুন্দরের রূপের ছটা দেখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। অপরাহ্নে শ্রীগোবিন্দ রায়ের অঙ্গনে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বন্ধুসুন্দর তন্ময়। ক্রমে বিহ্বল হইয়া পদ্মাসনে উপবিষ্ট-অবস্থায় গড়াগড়ি আরম্ভ হইল। নয়ন হইতে পিচকারীর মত জল বর্ষণ হইতে লাগিল। সকলে সিক্ত হইয়া গেল। কীর্ত্তনে তুমুল আনন্দ হইল। চারিদিক হইতে নরনারী ছুটিয়া আসিল। কীর্ত্তনানন্দ-আস্বাদনে ও সেই অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেশ দর্শনে উপস্থিত নরনারী ব্রজভাবে বিভাবিত হইল।

কীর্ত্তন থামিল, কিন্তু ভাবময়ের ভাবাবেশ থামিল না। সকলে বন্ধুকে ঘিরিয়া বসিয়া শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব গন্ধ আস্বাদন করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে প্রকৃতিস্থ হইয়া বন্ধুসুন্দর উঠিয়া বসিল।

"জয় শান্তি দীপ, শান্তিপুরাধিপ,
দয়ানিধি সীতাপতি"—

শ্রীঅচ্যুত তাত সীতানাথের জয় দিয়া বন্ধুসুন্দর শান্তভাব ধারণ করিল। বন্ধুর ভাব অবস্থা দেখিয়া মৈত্র মহাশয় বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। পর দিবস কয়েকটি মৃদু মধু কথা ও হরিনাম উপদেশে সকলকে বিশেষ তৃপ্তি দান করিয়া বন্ধুচন্দ্র শান্তিপুরে নীরবে নিজ কার্য্য সাধন করতঃ পাবনায় আসিয়া পৌঁছিল।

রণজিতের অনুরাগ

এবার পাবনায় পৌঁছিবার পর জগৎসুন্দরের কয়েকদিন পাঠে বড় মনোনিবেশ দেখা গেল। আসার সময় বড় দিদি দিগম্বরী বারংবার দিব্যি দিয়া বলিয়া দিয়াছেন—'জগত, ভাল করিয়া পড়িও।' তাই কিছুদিন দিদির আদেশ পালনে খুব নিষ্ঠা দেখা গেল। কিন্তু ব্রজপুর শান্তিপুরের প্রেম প্রবাহ এমনই ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, সে ভাবমগ্নতার মধ্য হইতে আপনাকে তুলিয়া লইবার শক্তি যেন জগদ্বন্ধুর আর থাকিল না।

রথযাত্রার সময় বালকদলের তুমুল কীর্ত্তনানন্দ হইল। কীর্ত্তন শোভাযাত্রা রাজপথে বাহির হইল। ভাববিহ্বল প্রেমের ঠাকুর রসাবেশে পথ আলো করিয়া চলিল। উদ্দীপ্ত সূর্য্যকিরণ শ্রীঅঙ্গের উপর পতিত হইয়া শ্রীমুখমণ্ডলকে শতগুণ আরক্তিম করিয়া তুলিল। সহরের আকাশ বাতাস হরিনাম রোলে তরঙ্গায়িত হইল। বালকদলের সঙ্গে বৃদ্ধেরাও যোগ দিলেন। কত শত নরনারী প্রাণভরা আকুলতা লইয়া উধাও ছুটিল। পরম বৈষ্ণব দীনবন্ধু বাবাজী, ভক্তচূড়ামণি বৈদ্যনাথ চাকী, কবিরাজ নৃত্যগোপাল প্রমুখ সজ্জনগণ সাগ্রহে কীর্ত্তনের দল নিজ নিজ প্রাঙ্গনে লইয়া গেলেন।

হেমদণ্ড ভুজ তুলিয়া, সিংহনিন্দি কটি নাচাইয়া, কৃষ্ণ কেশমণ্ডিত শ্রীমস্তক দোলাইয়া, সে রূপের মানুষটি যখন নৃত্য করে, তখন সকলেরই মন প্রাণ তাহাতে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। সকলেই মাতে; কিন্তু কাহারও কাহারও হৃদয়-তন্ত্রীতে নূতন

মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। যাহার হয়, তাহার আর কিছু ঠিক থাকে না। তাই আজ রণজিতচন্দ্রের কিছুই ঠিক নাই। শ্রীবন্ধুসুন্দরের মোহন মাধুরী রণজিতকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

রণজিতচন্দ্র রমেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। রমেশচন্দ্র প্রসন্নকুমারের কনিষ্ঠ ভাই। রণজিত অতি শান্ত, সরল, সুন্দর কিশোর। দেহ-মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি কেবল ফুটিতেছে। বর্ণটি গৌর। রূপটি সুন্দর সুদৃশ্য। যেমন বাহিরের আকৃতি, ঠিক তেমনই, বা ততোধিক, মধুর অন্তরের প্রকৃতি। রণজিত পাবনা-স্কুলের উচ্চ-শ্রেণীর ছাত্র। কুলের ও স্কুলের মুখ-উজ্জ্বলকারী কৃতিমান্ ও মেধাবী ছাত্র। জগৎ-সুন্দরের মাধুরীতে সে মুগ্ধ। তীব্র আকর্ষণে সে আকৃষ্ট। অদম্য অনুরাগেও সে রঞ্জিত। তাহার প্রেমে সে আত্মহারা। রণজিতের আত্মীয়-স্বজন অভিভাবকগণ ইহাতে প্রমাদ গণনা করিলেন। করিবারই কথা।

রণজিতচন্দ্রের জীবনের এই গতিকে ফিরাইবার জন্য তাঁহার অভিভাবকগণ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। শুনিয়াছি, যাহাতে জগদ্বন্ধুর দিক হইতে তাহার মন ফিরিয়া আসে, এই সংকল্পে তাঁহারা গৃহে শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবী-শক্তি মা জগজ্জননী চণ্ডিকাদেবী। তিনি কি কখনও কাহারও কৃষ্ণভক্তি-প্রসারের পথে বাধা হইতে পারেন ?

রণজিত প্রমুখ অনেক বালকই স্কুল-ছুটির পর ঘরে বই খাতা

রাখিয়া বন্ধুসুন্দরের কাছে ছুটিয়া আসে। কেলিকদম্ব-তলে বন্ধুকে না দেখিলে জয়-কালীমাতার মন্দিরে খোঁজে। সেখানে না দেখিলে, কেহ-বা কালাচাঁদ-পাড়া দীনবন্ধু বাবাজীর বাড়ীর উদ্দেশে যায়, কেহ-বা বুড়োশিবের গোফায় পাইব, এই আশায় প্রধাবিত হয়। বন্ধুকে পাইলে তাহারা কাছে বসে, কথা শোনে, মুগ্ধ হইয়া আপনা হারাইয়া ফেলে। প্রেমের মূর্ত্ত-বিগ্রহের আকর্ষণে মুগ্ধ রণজিত যন্ত্রচালিতবৎ একপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়ায়। আপনার অজ্ঞাতে রণজিত সেই প্রেম-মধু আস্বাদন করে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বংশী-শ্রবণে গোপগোপীকুল যেরূপ আকুল হইয়া ছুটিত, বন্ধুসুন্দরের প্রেম মুরলীর নীরব আকর্ষণেও রণজিত প্রমুখ পাবনার তরুণ দল সেইরূপ উধাও হইয়া ধাবমান হইত। বন্ধুর শ্রবণ-রসায়ন বাণী তাহাদের কর্ণ পথে প্রবেশ করিয়া প্রাণ উদ্‌ভ্রান্ত করিত, প্রাণের ভিতর দিয়া গিয়া সমগ্র জীবনটাকে নিত্য নবায়মান মাধুর্য্যের ভূমিকায় তুলিয়া দিত। বন্ধুর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ, ত্যাগ ও তপশ্চর্য্যা, প্রেমাবেশ ও ভাবতন্ময়তা—সব মিলিয়া একটা আনন্দ আকর্ষণের মূর্ত্তি তাহাদের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিল। তাহারা যেন নিজত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা ভূতাবিষ্টের ন্যায় মোহন বন্ধুকে খুঁজিয়া বেড়াইত। বন্ধুটি যেখানে থাকিত, সেইখানেই তাহারা আসিত। কিন্তু আসিয়া আর যাইতে পারিত না।

তাহাদের প্রতি তাহাদের প্রিয় বন্ধুসুন্দরে প্রাণের টান যেরূপ দুর্ণিবার, বন্ধুসুন্দরের প্রতি তাহাদের স্নেহ প্রবাহও তেমনি সহজ ও নির্বাধ। প্রত্যেককে প্রত্যেক দিন না দেখিলে বন্ধুর

যেন কত ব্যথা! কাহাকেও পবিত্র মার্গ হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিত দেখিলে বন্ধুর সুকোমল হৃদয় অমনি বেদনা-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সে অকৈতব সখ্যের তুলনা নাই।

অই যে পুণ্টু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বন্ধুর কাছে কি যেন বলিতে চাহে, বলিতে পারিতেছে না। সে আজ শ্বশুরবাড়ীতে যাইবে। যাইতে প্রাণ চাহিতেছে না। বন্ধুকে আর শীঘ্র দেখিতে পাইবে না। বন্ধু কি আর তাহাকে মনে রাখিবে? ঐ শোনো মরমের বেদনা মরমে জানিয়া প্রাণের দেবতা বলিতেছে,—'পুণ্টু, তুই যাচ্ছিস তবে যা। তোর যদি কখনও মনে হয়, কোন দুঃখ বেদনা বা বিপদ-আপদ আস্‌ছে, তা'হলে তখনই একটা তুলসীপাতা হাতে ল'য়ে আমার নাম ক'রে জলে ফে'লে দিস্। তা'হলেই আমি জান্‌তে পারবো।' নয়নের দৃষ্টিখানির মধ্যে স্নেহের টান মূর্ত্ত হইয়া উঠে। ভালবাসার ধনের স্নিগ্ধ ছবিখানাকে হৃদয়ে ধরিয়া পুণ্টু বিদায় লয়। বন্ধু চাহিয়া থাকে।

শ্রীবনমালী রায়

"কে রে জাহ্নবী-তীরে হরি ব'লে যায়।
(আহা) হেন অপরূপ রূপ কেউ কি দেখেছ কোথায়॥"

—শ্রীবন্ধুহরি

পাবনা-সহরের মধ্য দিয়া নগর-সংকীর্ত্তন চলিয়াছে। মধুর মাদল সুরসাল করতালের ঝঙ্কারের সহিত শত শত ভক্তের নর্ত্তন-

কীর্ত্তন এক মহারোলের সৃষ্টি করিয়াছে। সমস্ত সহরখানি আনন্দে টলমল করিতেছে। প্রেমোচ্ছ্বাসে যেন গাছের পাতা পর্য্যন্ত খসিয়া পড়িতেছে। গৌরলীলা-অপ্রকটের পর পূর্ণ চারিশত বৎসর হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তন-সাগরে যেন ভাঁটা পড়িয়াছিল। বন্ধুচন্দ্রের উদয়ে নামের সাগর আবার ফুলিয়া উঠিয়াছে। সেই প্রেমবন্যা আবার খরতরধারে বহমান। সুদীর্ঘকাল ধরণীর বক্ষে এমন প্রাণ-মাতানো কীর্ত্তন আর হয় নাই। ভাবে-রসে-নামে তরঙ্গ খেলিতেছে,—

"কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
রাধা মাধব রাধিকা নাম॥"—

নামের রোল সুনীল অম্বর ভেদিয়া উঠিতেছে।

রাজগৌরবে গৌরবান্বিত কে যেন রাজপথ দিয়া হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিতেছেন। সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ লোকলস্কর বহু। হয়তো কোনও রাজাই হইবেন। সে-কীর্ত্তনের মনোমোহন ধ্বনি রাজার কানে পৌঁছিল। কীর্ত্তন এমনই প্রাণ-ভোলানো যে, রাজার আর গজপৃষ্ঠে থাকা সম্ভব হইল না। মাহুতকে হস্তী থামাইতে আদেশ করিয়া, সেই স্থানেই অবতরণ করিলেন। নগ্নপদে দ্রুত অগ্রসর হইয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। রাজা আপনা ভুলিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। যাহারা চিনে, তাহারা চিনিল—ইনি তাড়াসের স্বনামধন্য বনমালী রায়।

আশ্চর্য্য! রাজার আগমনে কাহারও কোনও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সকলেই কীর্ত্তন-বিহ্বল। কিছুক্ষণ পরে রাজাকেই চঞ্চল দেখা গেল। তিনি কি যেন দেখিতে পাইয়াছেন, দেখা

অবধি আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছেন না। রাজা বনমালী দেখিতেছেন—কীর্ত্তনের কেন্দ্রস্থলে একটি রসে-গড়া সোনার পুতুল নাচিতেছে। এমন রূপ, এমন ভঙ্গী, এমন ঢলঢল চাহনি তাঁহার জীবনে আর কখনও দেখেন নাই। মনে হইতেছিল, যেন সমস্ত কীর্ত্তনের আনন্দরাশি একটি স্থলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, আর তাহা হইতে দশদিকে শান্তোজ্জ্বল কারুণ্যধারা প্রবাহিত হইতেছে। একটা অপূর্ব্ব অপার্থিব অনুভবের রাজ্যে রাজা আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া কীর্ত্তন থামিল। কীর্ত্তনান্তে বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত দুইচারিটি মধুর কথাই সকলের শ্রবণ-মন পরিতৃপ্ত করিল। রাজা দুই একটি প্রশ্ন করিলেন ও মনোমত উত্তর পাইয়া পরম প্রীত হইলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে রাজা একটি নিবেদন জানাইলেন—'যদি কৃপা করিয়া এই দীনের বনওয়ারী-নগরের বাড়ীতে পদধূলি দেন, তবে কৃত-কৃতার্থ হই।' 'বৃষভানুনন্দিনীর ইচ্ছা হইলে, সময়ে হইবে'—শ্রীবন্ধুসুন্দরের হাস্যময় শ্রীমুখারবিন্দ হইতে এই উত্তর আসিল।

তাড়াসের ধনাঢ্য জমিদার রাজা বনমালী রায় বাহাদুর। বহুকালের রাজা-খেতাবী। তাঁহার পিতা বনওয়ারী রায় খ্যাতনামা সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। আজ পাবনার পথে রাজা বনমালীর জীবন-নাট্যের একটি পটপরিবর্ত্তন দৃশ্য। যদিও রাজার বাড়ীতে পিতৃপুরুষের শ্রীরাধাবিনোদজীর সেবা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তথাপি আবেষ্টনীর প্রভাবে বাল্যে ভগবৎ-সেবার্চ্চনার দিকে তাঁহার তেমন রুচিমতি ছিল না। ক্রমে তৎকালীন

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে অনেকটা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন। ঈশ্বর মানেন, ব্রহ্ম মানেন, উপাসনা মানেন, কিন্তু ভগবানের শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব বুঝেন না। অনুরাগময়ী সেবা, রাধা-গোবিন্দের ব্রজবিলাস সমস্তই কবির কল্পনা বলিয়া মনে করেন। এমতাবস্থায় জনৈক ছদ্মবেশী মহাপুরুষের দর্শন ও কৃপালাভে রাজার চিত্ত ভক্তিমার্গের সাধনের দিকে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, রাগাত্মিকা ভজনটি যে কি প্রাণ-নিঙ্‌ড়ানো মাধুরী-মণ্ডিত, তাহা তখনও তাঁহার অনুভবের মধ্যে আসে নাই।

আজ পাবনার পথে সে প্রেমঘন রস-সাগরটির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দর্শন পাইয়া রাজা বনমালী যেন প্রেম-সাম্রাজ্যের সদর-দুয়ারে উপনীত হইলেন। যুগপৎ নাম ও নামীর করুণার বাতাসে রায় বনমালীর সকল আবরণ উড়িয়া গেল। আজ রাজা বনমালীর নব জন্ম। পরম আশায় বুক বাঁধিয়া নিজ বাটীতে ফিরিলেন। পথে কেবলই সেই অভাবনীয় ঘটনা ও দৃশ্য নয়ন-পথে নৃত্য করিতে লাগিল। বারংবার মনে পড়িতে লাগিল—কীর্ত্তন নাটুয়ার সেই মধুময় রূপখানি, সেই প্রাণস্পর্শী সুর-ঝঙ্কার, আর সেই অভিনব ভাবময় ভাষা—'বৃষভানুনন্দিনীর ইচ্ছা হইলে, সময়ে হইবে।' মধুরং মধুরং অখিলং মধুরং—বনমালী মধুসিন্ধুর সন্ধান পাইয়াছেন!

ভাব-সমাধি

পাবনা-সহরতলীতে শালগাড়িয়া নামে একটি গ্রাম। সেখানে কোনও বাড়ীতে ধ্রুবচরিত-যাত্রাভিনয় হইবে। সন্ধ্যার পর গান আরম্ভ হইবে। সেখানে যাইবার জন্য বন্ধুসুন্দরের প্রাণ উতলা হইয়া উঠিল। 'আশু, চল, ভাই, সেখানে যাই'—এই বলিয়া বন্ধুসুন্দর আশুকে তোষামোদ করে। আশু বলে—'না, আজ আর তোমাকে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া হইবে না। সেইখানেই গেলেই তোমার মূর্চ্ছা হইবে। শেষে এক বিপদ! তোমাকে নিয়া ঐরূপ কোনও স্থানে যাইতে তোমার দিদির বিশেষ নিষেধ আছে।' বন্ধুসুন্দর অতি-কাতরভাবে দীনহীনের মত আজ অনুনয়-বিনয় করিয়া বলে,—'নারে, ভাই, চল, আজ আর মূর্চ্ছা হইবে না। তোদের ভয় নাই, আমি খুব ঠিক থাকিব। লক্ষ্মীটি আশু, চল্ যাই, ভাই।' এমন আরও কত কথা। অনুনয়ে সময় সময় এমনই কাতর ভাবের প্রকাশ পায় যে, তাহাতে পাষাণ গলিয়া যায়,—আশু তো সামান্য বালক। সে রাজী হইতে বাধ্য হইল। প্রিয় সঙ্গিদল লইয়া জগৎসুন্দর লীলাভিনয় দেখিতে গেল।

আজ আর কিছুতেই মূর্চ্ছা হইবে না, মন দৃঢ় করিয়া জগদ্বন্ধু সম্মুখ-ভাগে বসিয়াছে। আধ ঘণ্টা কাটিতে না কাটিতেই শ্রীমস্তক দুলিতে লাগিল। তার পর—'কোথা পদ্মপলাশলোচন হরি'—বলিয়া যখন আর্ত্তিভরা কণ্ঠে বালক ধ্রুব গান ধরিল, অমনি অত দৃঢ়তা টুটিয়া গেল, ভাবের মূর্ত্তি প্রেমের ঠাকুর বন্ধুসুন্দর

ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল। অদ্ভুত অবস্থা! অত্যাশ্চর্য্য ভাব-দশা! কুসুম-কোমল বন্ধুর দেহ আজ বজ্রবৎ দৃঢ় ও নিশ্চল। কোথায়ও কোনও স্পন্দন নাই। সুচিক্কণ গণ্ড বহিয়া অশ্রুগঙ্গা ঝরিতেছে। অন্তরে যে একটা বিপুল ভাবসমুদ্র আলোড়িত হইতেছে, প্রত্যেকটি রোমকূপ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। চারিদিক হইতে সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে। কেহ-বা ভক্তির সহিত, কেহ-বা কৌতুকের সহিত, কেহ-বা বিরক্তির সহিত। একজন প্রবীণ লোক তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, ঘোরতর সংশয়ের সহিত। তাঁহার নাম ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী।

ডাক্তার কালী সবেমাত্র ডাক্তারী পাশ করিয়া আসিয়াছেন। বিজ্ঞানের জড়বাদে বিচার বুদ্ধি অভিভূত। লাহিড়ী-বাড়ীর জগদ্বন্ধু-নামক একটি বালকের কীর্ত্তনে যে ভাবদশা হয়, এই কথাটা পাবনা-সহরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কথাটা চন্দ্রশেখরবাবুর কানেও আসিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছেন ও মুখে বলিয়াছেন—'ও সব হিষ্টিরিয়া অথবা বুজরুকী-ছাড়া আর কিছুই নয়।'

আজ যাত্রার আসরে তিনি স্বয়ং উপস্থিত। স্ব-চক্ষে জগদ্বন্ধুর ভাব-দশা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। মানুষের অবিশ্বাসী মন কিন্তু নিজ-চক্ষুকেও বিশ্বাস করে না। তাই, তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়া বন্ধুসুন্দরের দেহটি স্পর্শ করিলেন। কেহ কেহ আস্তে আস্তে আপত্তি জানাইল। বিশিষ্ট লোক, তখনকার দিনে একজন পাশ-করা ডাক্তার, তাই কেহ জোর করিয়া আপত্তি করিতে সাহস করিল না। নাড়ীর স্পন্দন, বুকের

কম্পন কিছুই নাই, দেখিয়া চন্দ্রশেখরবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অবিশ্বাসী মন কিন্তু তাহাতেও প্রবোধ মানিল না। তিনি তাঁহার অনুগত নিকটস্থ দুইচারিজন ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন—'ইহাকে ধরিয়া আমার পরীক্ষাগারে লইয়া চল।' তাহাই করা হইল। কিন্তু বন্ধুর প্রিয় সঙ্গীরা ইহা আদৌ পছন্দ করিলেন না, কারণ বন্ধুসুন্দর তাহাদিগকে বলিয়াছে যে, ভাবান্তর হইলে, তাহার দেহ যেন তাহারা ছাড়া আর কেহ স্পর্শ না করে।

বন্ধুসুন্দরের দেহ রোগী-পরীক্ষার টেবিলের উপর শায়িত করা হইল। ডাক্তারবাবু নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই যান্ত্রিক যুগে যান্ত্রিক-বিদ্যা মানুষের বুদ্ধিকেও যন্ত্রময় করিয়া দিয়াছে। যন্ত্র পরীক্ষা-ছাড়া অন্য কিছুই তাহারা বুঝিতে চায় না। যন্ত্রের শক্তির সীমান্তেও যে বিরাট সত্য বিদ্যমান আছে, তাহা তাহাদের কাছে অলীক কল্পনামাত্র। ডাক্তার কালী দেখিলেন, জগদ্বন্ধুর দেহ-পরীক্ষায় যন্ত্র অচল! নিজের এবং নিজ-যন্ত্রের অক্ষমতায় চন্দ্রশেখরবাবুর নবচৈতন্যোদয় হইল। তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। এ ভাব যে মানবীয় নহে, সর্ব্বতোভাবে অলৌকিক, তাহা ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। কিন্তু আবার এ কি? ডাক্তার তিনি, কত সংক্রামক-রোগী স্পর্শ করিয়া তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন, স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভিতরে কোনও রোগ পূর্ব্বে কোনও দিন প্রবেশ করে নাই। আজ রোগীর রোগ যেন দ্রুতগতিতে তাঁহার দেহে সংক্রামিত হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখরবাবুর দেহে পুলক খেলিতে লাগিল। চক্ষে জল আসিল। মুখে 'হরি বোল' 'হরি বোল'

বলিবার অদম্য ইচ্ছা জাগিতে লাগিল। আগুন চিরদিনই আগুন। শিশু, না বুঝিয়া স্পর্শ করিলেও, আগুন তাহাকে দগ্ধ করিতে ছাড়ে না। "ন হি বস্তুশক্তি বুদ্ধিমপেক্ষতে।"

কম্পিত কণ্ঠে ডাক্তারবাবু তাঁহার অনুচরবৃন্দকে বলিলেন— ইঁহাকে ডিষ্টার্ব্ করিয়া ভাল করি নাই। এখনই যথাস্থানে রাখিয়া আসি, চল।' অভিনয় তখনও চলিতেছে। বন্ধুর দেহ যথাস্থানে রক্ষিত হইল। রাত্রিশেষে যাত্রা শেষ হইল। কিন্তু জগৎসুন্দরের ভাবাবেশের পরিসমাপ্তি হইল না। শ্রীমুখ হইতে তখনও সাদা সাদা ফেনা নির্গত হইতেছে। বিন্দুমাত্র স্পন্দনও নাই। প্রিয়গণ কাঁধে তুলিয়া ধীরে ধীরে 'হরি বোল' 'হরি বোল' বলিতে বলিতে বন্ধুসুন্দরকে বাসায় লইয়া আসিল। শেষরাত্রে বন্ধুসুন্দর উঠিয়া বসিয়া শয্যায় হাতরাইতে লাগিল— যেন কাহাকেও খুঁজিতেছে। আশুতোষ আলো জ্বালাইল। বন্ধুসুন্দরের স্বাভাবিক ভাব ক্রমে সম্পূর্ণরূপেই ফিরিয়া আসিল।

ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের জীবনেও ঐ দিন হইতে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিল। জড়ের উপরে যে চেতন আছে, চেতনের উপরে যে পরম-চেতন আছে, জীবনের মধ্যে যে তাহার ক্রিয়া আছে, অন্তরের মধ্যে যে তাহার অনুভূতি আছে, আস্বাদন আছে,—শ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিবার পর হইতে তাঁহার চিত্তে ঐ বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ডাক্তারবাবু, আপনি পরম ভাগ্যবান!

শ্রুত আছি, একসময় অপর এক ব্যক্তি বন্ধুসুন্দরের

ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অতি নির্ম্মম ব্যবহার করিয়াছিল। তুমুল কীর্ত্তনানন্দের মধ্যে বন্ধুসুন্দর প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া পড়িয়াছে। পাপবুদ্ধি-পরিচালিত ব্যক্তিটি তখন একটি জ্বলন্ত টিকা বন্ধুর বাম-চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর রাখিয়া দিল। প্রিয় ভক্তগণ দেখিবামাত্র তাহা ফেলিয়া দেয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ফোস্কা পড়িয়া যায়। ক্রমে উহা ঘায়ে পরিণত হয়। কুসুম-কোমল চরণের দগ্ধ ক্ষত দরদীগণের হৃদয়ে তাপ দিতে লাগিল। ঘা দেখিয়া পাষাণ-হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। লজ্জায়, সঙ্কোচে, ভয়ে অপরাধকারী কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিল। শ্রীবন্ধুসুন্দরের সদা-হাস্য-বদন কিন্তু বিন্দুমাত্রও মলিন হইল না। সেই দুষ্ট লোকটি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া উত্তর-কালে বন্ধুর স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান লাভ করে।

পাষণ্ডীর পুরস্কার

আসুরিক বৃত্তি চিরদিনই আধ্যাত্মিক-ভাবের প্রতিকূলাচরণ করে। বিচার করিলে দেখা যায়, শুধুমাত্র প্রহ্লাদের নহে, অনেকেরই পিতা হিরণ্যকশিপু। হিরণ্য বা সুবর্ণের প্রতি লালসা-সম্পন্ন অর্থাৎ ভোগসর্ব্বস্ব অভিভাবকগণ পুত্রেরা সাধু-সঙ্গে সৎপথে জীবন চালাইতে আরম্ভ করিলেই হিরণ্যকশিপুর অভিনয় আরম্ভ করেন। কুসঙ্গে মিশিয়া পুত্র বিপথে গেলেও বুঝি-বা তাঁহারা ততটা চিন্তিত বা কুপিত হন না। কিন্তু সাধু-সঙ্গের প্রভাবে পুত্র সদাচারী বা বৈরাগ্য-প্রবণ হইতেছে দেখিলেই তাঁহারা ভীত হইয়া পড়েন, পুত্র হয় তো সন্ন্যাসী

হইল ! তাঁহাদের বার্দ্ধক্যের সম্বল, আশার ধন, সাধের সংসার বুঝি-বা বিনষ্ট হইল !

পাবনার একদল যুবক নবীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। তাহাদের আচরণ পবিত্র, বেশভূষা বিলাসিতা-বর্জ্জিত, নয়নের দৃষ্টি নত, ব্যবহার সুমার্জ্জিত। তাহাদের অন্তর তেজোদ্দীপ্ত, বাহির স্নিগ্ধতায় ভরা। পুঁথিগত বিদ্যাকেই তাহারা চরম-বিদ্যা মনে করে না। তাহার উপরে তাহারা আরও অধিক কিছু অনুধ্যান করে, যাহা জীবনকে শাশ্বত তৃপ্তির ভূমিকায় তুলিয়া দিতে পারে। সেই ধ্যানের ধন তাহারা তাহাদের জীবনের প্রিয়তম সাথী জগদ্বন্ধুসুন্দরের মধ্যে মূর্ত্ত দেখিতে পায়।

অভিভাবকগণ চঞ্চল হইয়া উঠে। ছাত্রজীবনে অধ্যয়ন, যৌবনে ধনার্জ্জন, বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মাচরণ—এই নীতি-বাক্য তাহারা পুনঃ পুনঃ আওড়ায়। তাহারা 'ধর্ম্ম অর্থ কাম' এই ত্রিবর্গের সেবক। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি ইহারই সাধক। তরুণেরা কিন্তু চতুর্থ পুরুষার্থ 'মুক্তি'র স্বাদ পাইয়াছে। পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেম'-সাগরে তাহারা স্নান করিয়াছে। তাই ইহাদের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ স্বাভাবিক। লক্ষ্য ভিন্ন কি না। অভিভাবকদের কথা তাহাদের কানে প্রবেশ করে না। পাশ-করা আর চাকুরী-করাই যে জীবনের মুখ্য কাজ, ইহা বুঝিবার বয়সও তাহাদের হয় নাই ; এবং বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর এ কথা তাহাদের বুঝাতে পারাও এক কঠিন ব্যাপার। অতএব সে-সব কথাই তাহারা আর ভাবিতে পারে না। তাহারা তাহাদের বন্ধুর মুখে শুনিয়াছে—'মানব-জন্ম পাপ

করিবার জন্য নহে, কৃষ্ণসেবার জন্য।' এই কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণের জীবের সেবার জন্য জীবন তৈয়ারী করা যে কী, তাহা তাহারা প্রতিক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

অভিভাবকদের পরামর্শ হইল। আমাদের ছেলেরা যখন আমাদের কথা শোনে না, তখন আমাদের একমাত্র উপায় তাহাদের নষ্ট হইবার মূল কারণটিকে নির্ম্মূল করা। তাহাদের এই দুরভিসন্ধি টের পাইয়া ছেলেরা তাহাদের প্রিয় বন্ধুকে এই কথা জানাইল। কথা শুনিয়া বন্ধুসুন্দর কিন্তু ধীর শান্ত হিমাচলের মত অচঞ্চল রহিল। সুগম্ভীর কণ্ঠ হইতে দুইটি কথা উচ্চারিত হইল—'এ দেহের উপর অনেক অত্যাচার হ'বে কিন্তু কেউ একেবারে মেরে ফেল্‌তে পার্‌বে না। তোমরা মা'র খাইও, মারিও না। সদা নির্ভয়ে বিচরণ করিও। অহিংসায় সিংহবিক্রমে চল।'

অন্ধকার রজনী, নীরব নিঝুম। কর্ম্মশ্রান্ত জীবকুল নিদ্রিত। তস্কর, লম্পট অপকর্ম্মের সুযোগানুসন্ধানে ব্যাপৃত। শ্মশানে শবদেহ লইয়া শৃগাল শ্বাপদ বিবাদ-রত। সাধুভক্ত ইষ্টধ্যানে জাগরিত। শেষরাত্রে আপন মনে ইছামতী-পুলিনে গুন্‌গুন্‌ ভৈরবী-আলাপনে বন্ধুসুন্দর ভাব-স্তিমিত। নিবিড় নীরবতার মধ্যে পরম প্রশান্ত দেবতার মাধুর্য্যময় সঙ্গ-সুখে আকাশ-বাতাস যেন রোমাঞ্চিত। কি জানি ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় গগনের শশী মধ্যরাত্রেই অস্তমিত হইয়াছে। তারকাকুল মেঘের গাত্রাবরণ টানিয়া চক্ষু বুজিয়া ঘুমাইতেছে। শেষরাত্রে জগদ্বন্ধু একাকী মাঠে-ঘাটে ফেরে, এই সন্ধান জানিয়া জনকতক দুর্ব্বুদ্ধি-

সম্পন্ন লোক গা ঢাকা দিয়া পলাইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মমূহূর্ত্ত সমাগত। রবির উদয়াভাসে বাহিরের অন্ধকার যতই কমিতেছে, দুর্বৃত্তগণের মোহ-অন্ধকার যেন ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। বন্ধুসুন্দর যখন স্বানুভাবানন্দে আপন-হারা, তখন অতর্কিতভাবে তাহারা ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া আসিল। অতি নির্ম্মম নৃশংসভাবে তাহারা সেই নবনীত-কোমল অঙ্গে প্রহার করিতে লাগিল।

হায় বিধি! চাঁদে অশনি নিক্ষেপ করিবার লোকও আছে! কুসুমে কামান দাগিবার লোকও জুটিল! চম্পক-কলিকায় অগ্নিসংযোগ হইল! বিধাতা, ধন্য তোমার সৃষ্টি! এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে সকলই সম্ভব। যাহারা আজিকার এই নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তি, তাহারা বন্ধুসুন্দরের অপরিচিত নহে। তিনটি মানুষের মুখ জগৎসুন্দরের নিতান্তই পরিচিত; একটিবার-মাত্র তাহাদিগের প্রতি চাহিয়াই, পদ্ম-আঁখি দুইটি নিমীলিত হইল। তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত-মধ্যেই আঘাতের পর আঘাত। সে সুকোমল তনুখানি শান্তভাবে ক্রমশঃ ঢলিয়া পড়িল। যাঃ, মরিয়া গেল বুঝি—মনে করিয়া ভীত পাপিষ্ঠগণ দ্রুত ধরাধরি করিয়া বন্ধুসুন্দরকে নদীতীরে একটা জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া দিল। বিশ্বপ্রাণ প্রাণহীনের মত পড়িয়া রহিল।

পাবনা-সহরের চৌকীদার পাহারা দিয়া ফিরিতেছে। জঙ্গলের মধ্যে উজ্জ্বল আলো দেখিয়া সে আকৃষ্ট হইল। নিকটে গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আলো নয়, একটি দেহের জ্যোতি! কি আশ্চর্য্য! একটি শবদেহ! শবদেহের এত তেজ! বিস্ময়াবিষ্ট চৌকীদার ভয়ে

ভয়ে গায়ে হাত লাগাইল। দেখিল মৃত নহে, তবে অর্দ্ধমৃত বটে। বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। এ কি! এ যে লাহিড়ী-বাড়ীর সাধু-ছেলেটিই, লাহিড়ী-বাড়ীর মা-ঠাকরুণের ভাই! কী ভয়ানক ব্যাপার! চৌকীদার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়কে সংবাদ দিল।

হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। চাকর গোমস্তা ছুটিয়া আসিল। কর্ত্তারা বাহির হইয়া পড়িলেন। গিন্নীরা আলুথালু বেশে দুয়ারে দাঁড়াইলেন। ব্যথাতুর প্রাণে পথের লোক দেখিল, দশজনে ধরাধরি করিয়া যেন ভূপতিত প্রভাতমলিন পূর্ণিমার চন্দ্র বহন করিয়া লাহিড়ী-বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। সহর-বাসী হায় হায় করিল, কেহ ছিঃ ছিঃ করিল, কেহ কানে আঙ্গুল দিল, কেহ-বা চক্ষু মুছিল, কেহ বক্ষে করাঘাত করিল। দূর হইতে সংবাদ শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কেহ ছুটিয়া আসিল। গোলোকমণি বহুপূর্ব্বেই মূর্চ্ছাদশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলের মুখেই হাহাকার—এ কী হইল!

চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। দীর্ঘ সময়-পরে বন্ধুসুন্দরের স্বাভাবিক চেতনা ফিরিয়া আসিল। ফুলের অঙ্গে আঘাত-চিহ্ন দেখিয়া প্রিয়জনেরা পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'জগৎ, বল তো, কে এমন কার্য্য করিল? চিনিয়া থাক তো নাম বল। আমি সমুচিত প্রতীকার করিব।' বন্ধু-সুন্দর নীরব। কাতরমুখে মাত্র ঈষৎ মৃদু হাস্য ফুটিল। লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় বলিলেন—'জগৎ, কাহাকেও কি

চিনিতে পার নাই ?' ক্ষণকালের জন্য নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জগৎসুন্দর উত্তর করিল—'চিনিব না কেন, সকলকেই চিনি, কিন্তু নামে কি প্রয়োজন, নাম না করাই ভাল।' লাহিড়ী মহাশয় ক্ষুদ্র বালকের এই তিতিক্ষা, ক্ষমা, মহত্ত্ব এবং সর্ব্বোপরি তাহার চিত্তের দৃঢ়তা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

জগদ্বন্ধু যে সাধারণ বালক নহে, প্রসন্নকুমার সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিলেন। কিন্তু স্নেহের মেঘ তাহার নিশ্চিত-জ্ঞানকেও মাঝে মাঝে ঢাকিয়া ফেলিত। তথাপি, ছেলেটি যে রহস্যময়, তাহা তিনি অন্তরের অন্তর দিয়া অনুভব করিতেন। আজিকার আচরণে জগৎসুন্দরের অন্তরটি প্রসন্নকুমারের হৃদয়ে সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে যুবকদল আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রিয় বন্ধুর উপর অত্যাচার হইয়াছে, এ সংবাদে তাহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সকলের হৃদয়েই বিষাদ-কালিমা, এবং মহাক্ষোভ মূর্ত্ত হইয়াছে। কাহারও কাহারও রোষাগ্নি জ্বলিতেছে। কার্য্যটি ঠিক কাহার, জানিতে পারিলেই তাহারা কঠোর হস্তে প্রতিশোধ লইবে। তাহারা অত্যাচারকারীদের নাম শুনিবার জন্য বন্ধুর নিকট বহুবার বহুপ্রকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অগত্যা বন্ধুসুন্দর কাগজ-পেন্সিল চাহিল। নামটি কাহার দেখিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সকলে পড়িল। লাল পেন্সিলে বড় বড় অক্ষরে সাদা কাগজের গায়ে লেখা,—

'আমি দণ্ডদাতা নহি, উদ্ধারণ বটি।'

"রেজাণ্ট্ দে'খে নেবেন"

জগদ্বন্ধুর অঙ্গে আঘাত হইয়াছে, এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ গোলোকমণি দেবী পত্র-দ্বারা রাঁচিতে তারিণীচরণের নিকট জানাইয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়া তারিণীচরণ অধীর হইয়া পড়িলেন। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি পাবনায় চলিয়া আসিলেন। জগৎসুন্দরের সুন্দর মুখখানি দেখিতে না পাওয়া পর্য্যন্ত তারিণীচরণের ভীষণ অস্থিরতা বোধ হইতেছিল। বন্ধুসুন্দর তখনও সুস্থতা লাভ করে নাই। তারিণীচরণ জগতের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া পরম আদরমাখা ব্যাকুলকণ্ঠে 'জগৎ জগৎ' বলিয়া ডাকিলেন। জগৎ মেজ-দাদার মুখপানে তাকাইল। পরম স্নেহভরে তারিণীচরণ জগৎসুন্দরের বুকে-পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ব্রজের নিখুঁত প্রেমের মাধুর্য্যময় লীলা প্রকট হইয়া উঠিল।

ভগ্নী ও ভগ্নীপতির সহিত পরামর্শ করিয়া তৃতীয় দিনে তারিণীচরণ জগৎসুন্দরকে লইয়া পুনরায় রাঁচিতে চলিয়া গেলেন। গোলোকমণির বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পুণ্টু-হেমাঙ্গিনীরা অশ্রুসিক্ত নয়নে পথের পানে চাহিয়া রহিল। বন্ধুপ্রিয় কেলিকদম্বের শাখা বিষাদভরে নুইয়া পড়িল। পাবনার উপর যেন বিরাট দুঃখের ছায়া পড়িল। প্রিয় সঙ্গিগণের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা আঘাত করিতে লাগিল।

রাঁচিতে পৌঁছিবার কয়েকদিন মধ্যে বন্ধুসুন্দরের সুস্থতা ফিরিয়া আসিল। তারপর তারিণীচরণ তাহাকে উচ্চ-ইংরেজী-বিদ্যালয়ে ক্লাস টেন-এ ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। রাঁচি জগৎ-

সুন্দরের পূর্ব্ব-পরিচিত স্থান। কেহই তাহাকে ভুলে নাই। ভুলিবার উপায়ও নাই। একবার যে তাহাকে দর্শন করিয়াছে, তাহার কি আর জীবনে ভুলিবার উপায় আছে? স্কুলের শিক্ষকগণ, পাড়াপ্রতিবেশী, বৃদ্ধ নরনারীগণ ভুবনমোহন বন্ধুরতনকে পাইয়া সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পথের কাঙ্গাল, দীনমজুর, বনের বিহঙ্গ, বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত তাহাদের দয়িতকে সাদরে আহ্বান জানাইল।

তারিণীচরণ লক্ষ্য করিলেন, জগৎ আর সে জগৎ নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বের কলিকা আজ প্রস্ফুটিত কুসুম। দুই বৎসর পূর্ব্বে জগৎ ছিল চঞ্চল, আনমনা, আপনা-ভোলা। আজ দুই বৎসর পরে জগৎ শান্ত-সমাহিত, ভাবাবিষ্ট, আচার্য্য। জগতের বাল-চাপল্য নাই, আছে একটা সুনির্দ্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত ভাবের রাজ্যে গভীর ভাবের অভিনিবেশ।

জগতের চারিদিকে গ্রন্থ। কিন্তু তাহা পাঠ্যপুস্তক নহে। তারিণীচরণ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সে সমস্তই বৈষ্ণব-গ্রন্থ—গীতা, ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, গর্গসংহিতা, গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি বহু অভিনব গ্রন্থ। এই সকল বটতলার ছাপা গ্রন্থ তারিণীচরণ পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, পড়া তো দূরের কথা। একখানি ছোট গ্রন্থ সব সময়ই জগতের কাছে থাকে। যখন সে ঘুমায়, সে গ্রন্থখানি বুকের উপর থাকে। তারিণীচরণ প্রথম পৃষ্ঠাখানি উল্টাইয়া দেখিলেন। গ্রন্থের নাম প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, রচয়িতা নরোত্তমদাস ঠাকুর। ছাপা বটতলার ঘেসো কাগজ, ছাপার ভুল প্রচুর।

তৎকালে বটতলার মুদ্রিত ঐসব পুঁথি পড়িবার আগ্রহ কোনও ভদ্রলোকের ছিল না। জগৎ বৈরাগীদের পুঁথি লইয়া এত মাতিয়া থাকে, ইহা তারিণীচরণের বেশী ভাল লাগিল না। জগৎকে নিকটে পাইয়া তিনি বলিলেন—'জগৎ, মোটেই যে পড় না, পরীক্ষায় পাশ করিবে কি প্রকারে?' দাদার প্রশ্ন শুনিয়া জগৎসুন্দর একটিবার শ্রীমুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল, পরে গম্ভীরভাবে বলিল, 'রেজাল্ট্ (result) দে'খে নেবেন।' জগতের দৃঢ়তাব্যঞ্জক সুগম্ভীর উত্তরে তারিণীচরণ নীরব হইয়া গেলেন। তিনি পরীক্ষার অপেক্ষাই করিতে লাগিলেন। প্রবেশিকার (এণ্ট্রান্স্) নির্ব্বাচন-পরীক্ষা হইয়া গেল। বন্ধুসুন্দরের পরীক্ষার ফল আশাতিরিক্তরূপে ভাল হইল; কয়েকটি বিষয়ে প্রথম স্থান থাকিল।

বেদ যাঁহার নিঃশ্বাস, ইচ্ছামাত্র তাঁহার পরীক্ষার রেজাল্ট্ ভাল হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তারিণীচরণের মুখ উজ্জ্বল হইল। পরীক্ষার ফী দেওয়ার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। যথানির্দ্দিষ্ট দিনে উহা দাখিল করা হইয়া গেল। তারিণীচরণের অন্তরে বড় আশা, জগৎ ভালভাবে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু জগতের ইচ্ছা বুঝি অন্যরূপ। জগজ্জীবের কাছে বিদ্যার পরীক্ষা দিতে জগন্নাথের আর বুঝি সাধ নাই। সে পাট দিগ্বিজয়ী-বিজয়ে শেষ করিয়াছেন। জগৎ কলিকাতায় আসিল। তারপর কোথায় গেল, তারিণীচরণ কিনারা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষার সময় কাটিয়া গেল। জগৎ দেখা দিল না। গোপালচন্দ্র,

তারিণীচরণ সকলেই ব্যথিত ও বিরক্ত হইলেন। দিগম্বরী দেবী বিশেষভাবে চিন্তান্বিতা হইয়া পড়িলেন। জগৎ যে পরীক্ষা দেয় নাই, তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না। তাহার সংবাদ যে পাওয়া যায় না, ইহাই দিদির গুরুতর উদ্বেগের কারণ।

রুদ্রাক্ষ-মালা

"ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেন শিবরূপিনং।
বহ্বাচার্য্য বিভেদেন ভগবন্তমুপাসতে॥"

—শ্রীঅক্রুর

আপন-মনে নানাস্থানে ঘুরিয়া কিছুকাল নিরুদ্দিষ্ট থাকিবার পর বন্ধুসুন্দরকে পুনরায় পাবনায় দেখা গেল। পাবনায়-ই দেখা যাইবে, কারণ যেখানে বিরুদ্ধতা, সেইখানেই তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র। পাবনা আসিয়া দুই দিন বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান হইল। তারপর একদিন আসিয়া শ্রীশ লাহিড়ীর গৃহে উপস্থিত।

শ্রীশচন্দ্র প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের অনুজ। বড়ই ভক্তপ্রাণ। তিনি ও তাঁহার পত্নী উভয় দেবাদিদেব শঙ্করের সেবক ছিলেন। কৈলাসপতির রজতগিরিনিভ মূর্ত্তি তাঁহাদের ধ্যানের বস্তু। যাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য পর্ব্বত-কন্যা পর্ণাশন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অপর্ণা-নামে সাধনরতা হইয়াছিলেন, সেই পার্ব্বতীপতির পরম-প্রসাদে লাহিড়ী-দম্পতি পরমানন্দে কালযাপন করিতেন।

বন্ধুসুন্দরকে দর্শনাবধি উভয়ের মনে একটি নব ভাবের

উদয় হইল। উভয়ে উভয়ের কাছে মনের কথা প্রকাশ করিলেন। জগদ্বন্ধু সাক্ষাৎ শিব। ক্রমে বন্ধুসুন্দরের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা যতই বাড়িল, ততই সেই বিশ্বাসটি দৃঢ়তর হইল। বন্ধুর সেই গলিত রজত-বর্ণখানি, আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নের দৃষ্টিখানি, সেই জানুস্পর্শী নিটোল বাহু দুইখানি—সকলই যেন দেবাদিদেব উমাকান্তের অনুরূপ। লাহিড়ী-দম্পতি প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া দেখেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

বস্তুতঃ, ইহা কাল্পনিক কিছু নহে। বন্ধুসুন্দর কখন কেলি-কদম্ব-তলে পদ্মাসনে বসিয়া থাকে, তখন তাঁহাকে ধ্যান-স্তিমিত-লোচন সদাশিব বলিয়া পথচারী অনেকেই মনে করে, তাহাতে প্রকৃত শিবভক্তের ভক্তিরসাপ্লুত দর্শনের তো কথাই নাই! বাস্তবিক পক্ষে বন্ধুসুন্দর শিবই। কেবল বাহিরের রূপে নহে—অন্তরের ভাবস্বরূপেও। শিব ভক্তাবতার। আপনার নাম করিয়া আপনি বেড়াইলে কি আনন্দ, তাহা জানিতে ও জানাইতেই পরমপুরুষ শ্রীহরির শিবরূপ। তাই আপন-আনন্দ-আস্বাদনে আপনি বিভাবিত বন্ধুসুন্দর তখন সদাশিবই।

শ্রীশচন্দ্র অনেক সময় নিজ-গৃহে বন্ধুসুন্দরকে ডাকিয়া আনেন। তাহাকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়ান, কত আদর করেন, কত কি বলেন এবং এই সমস্ত করিয়া মহা তৃপ্তি লাভ করেন। সাধনের ধনকে প্রত্যক্ষ পাইয়া লাহিড়ী-ঘরণী জীবনের সার্থকতা অনুভব করেন। তাঁহাদের এই সহজ প্রাণের আদরের বন্ধনে বন্ধুসুন্দরকেও সেই গৃহে বাঁধা পড়িতে হইয়াছে।

ভক্তিমতী লাহিড়ী-গৃহিণী অনেক সময় বন্ধুসুন্দরকে নব বস্ত্র, উত্তরীয়, উপবীত ও পাতুকা প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করিয়া দর্শন করেন ও তাহাতে অপার সুখ অনুভব করেন। একসময় তাঁহার প্রাণে সাধ জাগিল, বন্ধুধনকে রুদ্রাক্ষের মালা-দ্বারা ভূষিত করিবেন। বন্ধুর তপশ্চর্য্যা ও ব্রহ্মচর্য্যমণ্ডিত শুদ্ধ রুক্ষ অথচ সুকোমল সুন্দর গৌর-দেহে একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা যেন বেশ মানায়, তাই। পাছে উহা সন্ন্যাসের চিহ্ন দেখায়, এই ভয়ে লাহিড়ী-গৃহিণী তাঁহার সংগৃহীত রুদ্রাক্ষের মালাগাছটি দিতে পারিতেছেন না। একদিন তাঁহার মনে হইল, সুবর্ণ-তারে গ্রথিত করিয়া দিলে উহার অলক্ষণ নষ্ট হইবে। তৎক্ষণাৎ সুবর্ণ তারে গ্রথিত হইয়া রুদ্রাক্ষের মালা তৈয়ারী হইয়া আসিল। কিন্তু ঐ সময়েই শ্রীঅঙ্গে আঘাত হয় এবং বন্ধুসুন্দরকে লইয়া তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাঁচিতে চলিয়া যান। সে গাঁথা-মালা আর দেওয়া হয় নাই। আজ বুঝি বন্ধুসুন্দর তাঁহাদের সেই মালা পরিতেই আসিয়াছে। এমনি করিয়াই ভক্তের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ হয়।

বন্ধুসুন্দরকে অপ্রত্যাশিত ভাবে গৃহে পাইয়া লাহিড়ী-গৃহিণী আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। নিজ-কম্পিত-করে সেই মনোহর কম্বুকণ্ঠে তাঁহার বড় সাধের রুদ্রাক্ষের মালাগাছটি তিন লহরে দোলাইয়া দিলেন। হৃদয়ের গভীর প্রীতি মাখানো সেই রুদ্রাক্ষ-মালিকা বন্ধুসুন্দরের বক্ষোপরি পরম শোভার সৃষ্টি করিল। লাহিড়ী-দম্পতি নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। শুভ্র শিবদেহে যেন কৃষ্ণ-সর্পের মালা! রজত-গিরিগাত্রে যেন

ত্রিবেণী-ধারার অপূর্ব্ব মিলন! চিরদিন পর্ব্বতের কৃষ্ণগাত্রেই শুভ্র ত্রিবেণী বহে, আজ যে রজত-গিরিগাত্রে কৃষ্ণ-ত্রিবেণী! মরি কি শোভা! কৃষ্ণ-কেশপাশ স্বর্ণ-শৈলশিরে নবমেঘের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিল! পাণি-পদতল রক্তকমলের কিঞ্জল্ককে ধিক্কার দিল! দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মত মধুর উজ্জল নখশ্রেণী শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ করিল! বালারুণের মত ললাট-ফলকের ছটায় ঘর আলোকিত হইয়া গেল! সত্যস্বরূপ বন্ধুসুন্দরের অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্যের মধ্যে লাহিড়ী-দম্পতি শিবস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিলেন। শ্রীশ লাহিড়ীর গৃহ-মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিল।

পাবনার প্রিয়জন বন্ধুসুন্দরের এই নব আভরণে পরম আনন্দ লাভ করিল। কখনও ইছামতী তীরে, কখনও রথতলায়, কখনও চাকী মহাশয়ের বাড়ীতে, কখনও বটবৃক্ষমূলে বুড়োশিবের গোফায়, কখনও-বা কেলিকদম্বতলে নব-সাজে-সজ্জিত বন্ধুচাঁদের লুকোচুরি-খেলা চলিতে লাগিল। নির্জ্জনে নদীতীরে কোনও দিন গুন্ গুন্ গুঞ্জরণ শোনা যাইত। আড়ালে দাঁড়াইয়া চতুর ভক্ত কান পাতিয়া শুনিত তাহাদের বন্ধুর কণ্ঠের সর্ব্বস্ব-ভোলানো ঝঙ্কার—

"দেখিনু নদীর তীরে অপরূপ সই।
হেরিলে মূরতি সখি আমাতে কি আমি রই॥
না জানি কি সন্ধানে, কটাক্ষ-বাণ হাণে,
জগত বলিছে নব-রসের গোরা অই॥"

রাজা ও রাজগুরু

"যোঽন্তর্বহির্স্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্।
আচার্য্য চৈত্ত্য-বপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥"

—শ্রীউদ্ধব

রাজা বনমালী স্বগৃহে পৌঁছিয়া অবধি যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন! পাবনার রাজপথে যে অনিন্দ্যসুন্দর রূপের মানুষটি দর্শন করিয়াছেন, থাকিয়া থাকিয়া উঠিতে বসিতে তাঁহারই কথা মনে পড়িতেছে! অন্তরটি আনন্দে পূর্ণ হইয়া আছে। বাহিরের বিষয়-কর্ম্ম লোকজন কিছুই ভাল লাগিতেছে না। সবই যেন অসার। যাঁহাকে দেখিয়াছেন তিনিই যে সারাৎসার, ঠিক না চিনিলেও, মন যেন সেই কথা বলিতে চাহিতেছে। অন্তরটি সর্ব্বদা তাঁহার দিকে—তাঁহাকে আবার দেখা চাই। কাছে আনিয়া নয়ন ভরিয়া দেখা, কথা কওয়া, সযত্নে ব্যজন করা, শ্রেষ্ঠ দ্রব্য খাওয়ানো এই রকম নানা ইচ্ছা হইতেছে। এমন বস্তু, এমন রত্ন পাইয়াও পাইলাম না। রাজার হৃদয়ের অঙ্কুরিত অনুরাগ ধীরে ধীরে আপন অজ্ঞাতে বর্দ্ধিত হইতেছে। মাত্র কিঞ্চিৎ জল-সিঞ্চনের অপেক্ষা। বুঝি-বা তাহা না হইলেও এই বৃদ্ধির গতি রুদ্ধ হইবে না।

রাজবংশের গুরু শ্রীধাম-নবদ্বীপের সীতানাথ-সন্তান প্রভুপাদ দীনবন্ধু গোস্বামী। গুরুপুত্র শ্রীমান্ রঘুনন্দন তখন কিশোর-বয়স্ক। রাজা বনমালীর বনওয়ারীনগরের বাড়ীতেই তিনি তখন উপস্থিত আছেন। রাজা গুরুপুত্রের সহিত পাবনার সেই

মনোহর মানুষটির কথা আলোচনা করেন। পথিমধ্যে কীর্ত্তন পরিবেষ্টিত যে মূর্ত্ত মাধুর্য্যের ছবিখানি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কথা প্রাণ ভরিয়া শত মুখে বলেন। রায় বনমালীর কথা প্রাণবন্ত; তৎশ্রবণে রঘুনন্দন মুগ্ধ হইয়া যান। রঘুনন্দনের হৃদয়েও বন্ধু-দর্শনের একটি লালসা বলবতী হইয়া উঠে। শ্রীবন্ধুর শ্রীমুখের কথাটি রায় বনমালী থাকিয়া থাকিয়া বলেন—'শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ইচ্ছা হইলে সময়ে হইবে।' কি অপ্রাকৃত মধুর ভাব ও ভাষা! রঘুনন্দন ভাষা শুনিয়া চমকিয়া উঠেন। 'শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ইচ্ছা'—সেই ইচ্ছা কবে হইবে, বনমালী ও রঘুনন্দন কেবল তাই ভাবেন।

রাজা ও গোস্বামিজীর বন্ধু-দর্শন লালসা বর্দ্ধিত হইতে হইতে সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিল। আর তো থাকা যায় না! আর তো অপেক্ষা সহ্য হয় না! পরামর্শ স্থির হইল, রঘুনন্দন পাবনায় যাইবেন। পাবনায় গিয়া, রাজা বনমালীর কাতর নিবেদন জানাইয়া, বন্ধুসুন্দরকে বনওয়ারীনগরে লইয়া আসিবেন। বন্ধুধন আনিতে রঘুনন্দন আজ অক্রুরের ন্যায় যাত্রা করিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া রঘুনন্দন ভাবিতেছেন—'বৃষভানুনন্দিনীর কি ইচ্ছা হইবে? বন্ধুসুন্দর কৃপা করিয়া আসিলে, হস্তিপৃষ্ঠেই যে আসিবেন, ইহাই রাজার সাধ। রাজোচিত সাধ বটে! রাজবাড়ীতে সাড়া পড়িয়া গেল—কে এক নব গৌরাঙ্গ, না, সাধু আসিতেছেন। রাজধানী সুসজ্জিত হইল। রাজার রাজা রাজাধিরাজ আসিবেন, তাই নানা আয়োজন চলিতে লাগিল। সত্যসত্যই আসিবেন। ভক্তের

আগ্রহ যখন ঐকান্তিক হয়, তখনই 'বৃষভানুনন্দিনীর ইচ্ছা' হইয়া যায়। সকলেরই মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস, সেই অপরূপ মানুষটি আসিবেন, তাঁহারা দেখিবেন। আকাশ-বাতাস ভরিয়া প্রতিধ্বনি উঠিল, কে যেন বনওয়ারীনগরে আসিতেছেন। এমন লোক কেহ দেখে নাই। একটা কৌতূহলে সকলের হৃদয় পূর্ণ।

শিব-দর্শন ও গৌর-দর্শন

"বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

—শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র

পাবনায় পৌঁছিয়া রঘুনন্দন জানিলেন যে, বন্ধুসুন্দর বৈদ্যনাথ চাকী মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থিত। রঘুনন্দন বন্ধুসুন্দরের সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন। আপন-পরিচয় জানাইয়া রঘুনন্দন নত হইলেন। জগৎসুন্দরের শ্রীঅঙ্গ-ছটায় রঘুনন্দনের অন্তর-বাহির ভরিয়া গেল। কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, তাহা অতি-বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন। বন্ধুসুন্দরের কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টি-খানি রঘুনন্দনের উপর পতিত হইল। তাহাতে যে নদীয়া-মাধুরী সুধা মাখান ছিল, তাহা রঘুর হৃদয় স্পর্শ করিল।

'রঘু, তুমি শিব দর্শন ক'রেছ' সর্ব্বপ্রথম এই কথাটি বন্ধু-সুন্দরের শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইল। কথাটির অর্থ রঘুনন্দন বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু সুরের মাধুর্য্যে মনপ্রাণ শীতল হইয়া গেল। রঘু ডাকটির মধ্যে যে একটি যুগযুগান্তরের আপন-ভাব

বিজড়িত আছে, তাহা অনুভব করিতে রঘুনন্দনের বিলম্ব হইল না।

বন্ধুসুন্দরের কথাটির তাৎপর্য্য যে রঘুনন্দন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ইহা বুঝিয়া বন্ধুর পার্শ্বস্থিত নৃত্যগোপাল কবিরাজ বলিলেন,—'আপনি বুড়োশিব হারাণ ক্ষ্যাপাকে দর্শন করিয়াছেন কি না, তাহাই এই জিজ্ঞাসার অভিপ্রায়।'

'আজ্ঞে না, শিব-দর্শন করি নাই।'

'তবে যাও, আগে শিব-দর্শন ক'রে এস।'

চাকী মহাশয়ের বাড়ীতে একটা সিঁড়ির নীচেই সেই সর্ব্বস্ব 'শিব' অবস্থান করিতেছে। বন্ধুসুন্দরের ইচ্ছা, রঘুনন্দন বুড়োশিবের দর্শনভাগ্য লাভ করে।

নৃত্যগোপাল পথ দেখাইয়া দিলেন। রঘুনন্দন সিঁড়ির তলে গিয়া ক্ষ্যাপাকে দর্শন করিলেন।

'তুই কেডা রে? আয় আয় আয়। আমার ঘরের নোক, তুই আমার ঘরের নোক'—বলিয়া ক্ষ্যাপা অতি-সহজভাবে গোস্বামিজীকে আদর করিল। ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপামির আড়ালে যে গুপ্ত গাম্ভীর্য্যটি বিরাজমান, তাহা অদ্বৈত-সন্তান রঘুনন্দনের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। দুইজনের দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে একটা বিরাট রহস্য রহিয়া গেল। রঘুনন্দন দুই একটি কথা বলিতে না বলিতে, ক্ষ্যাপা জিজ্ঞাসা করিল,—'তুই গৌর ছ্যাখ্ছস্?'

রঘুনন্দন মনে করিলেন, এখানে কোনও স্থানে গৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত আছেন, তাহা দর্শনের কথা ক্ষ্যাপা

জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবে। 'আজ্ঞে না। গৌর কোথায়?'— গোস্বামিজী এই কথা বলিতে না বলিতে ক্ষ্যাপা বলিয়া উঠিল—'গৌর চিনছস্ না? যারে নিবার আইছস্'।—এই কথা বলিয়া ক্ষ্যাপা 'আমার জগা রে জগা, জগা রে জগা' বলিয়া বগল বাজাইতে লাগিল।

রঘুনন্দন সেই গৌর-আনা ঠাকুরের বংশের রত্ন। হঠাৎ কেহ কোনও মানুষকে 'গৌর' বলিলেই তাহা মানিয়া লওয়ার পাত্র তিনি নহেন। তবে প্রথমে রাজমুখে শুনিয়া ও তাঁহার ঐকান্তিকতা দেখিয়া, পরে রূপচ্ছটায় ও কণ্ঠ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রঘুনন্দনের হৃদয় একটা নূতন অনুভূতির হলে কর্ষিত হইয়াছে। ক্ষ্যাপার কথায় সেই কর্ষিত ভূমিতে বীজ উপ্ত হইল। শেষ-জীবনে গোস্বামিপাদ অনেক সময় বলিতেন,—'আমি অদ্বৈতের বাচ্চা রে, অদ্বৈতের বাচ্চা। জগদ্বন্ধুকে বাজা'য়ে নিয়েছি।' আজ ক্ষ্যাপার ঐ গৌর-দর্শনের কথা হইতেই সেই 'বাজানো' আরম্ভ হইল।

বুড়োশিবের চরণে প্রণত হইয়া রঘুনন্দন বিদায় হইলেন। বিদায়কালে 'শিব' ক্ষ্যাপা-সুলভ স্বভাবে আর-একটি কথা বলিল। 'জাঃ তোর উড়িয়ারাজের কাছে জগারে লৈয়া জা।' রঘুনন্দনের ভাবনা-রাজ্যে আর একটি রেখাপাত হইল।

সুসজ্জিত সুচিত্রিত এক সুন্দর হস্তী বনওয়ারীনগরের অভিমুখে চলিয়াছে। অঙ্গ দোলাইতে দোলাইতে ধীর পদ-বিক্ষেপে যায়। কণ্ঠলগ্ন বৃহৎ ঘণ্টাটি বাজে। পৃষ্ঠদেশে

কিংখাপ-শোভিত আসন। আসনে তুইটিমাত্র আরোহী।—একটি নব কিশোর, অপরটি নব যুবক। একটি শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত নিরাভরণ তপোজ্জ্বল কান্তি আমাদের জগৎসুন্দর, অপরটি তিলকমালা-শোভিত, নাম-জপরত পরম-ভাগবত রাজগুরুপুত্র শ্রীরঘুনন্দন। তুইজনেই নীরব। মনে হয়, স্ব-স্ব-ধ্যান-রত। সুশোভিত গজরাজ যেন তাহার চির-বাঞ্ছিত আরোহী-সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতন, তাই সে আপন গৌরব-গর্ব্বে পাবনার রাজপথ কম্পিত করিয়া চলিয়াছে। সুবৃহৎ কর্ণ-তুইটি ঘন ঘন আলোড়িত হইতেছে। মনে হয়, যেন সে ব্যজন-দ্বারা পৃষ্ঠস্থিত আরোহীদ্বয়ের পথশ্রান্তি প্রশমনের প্রয়াস পাইতেছে।

পথের তুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পাবনাবাসী সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছে। একদিকে অত্যাচারকারীর অমানুষিক পীড়ন, অত্যাচার অসম্মান, অন্যদিকে যেন তাহাকেই ধিক্কার দিয়া রাজ-অতিথি হইয়া, রাজসম্মানে আদৃত ঠাকুররূপে রাজপথ উজ্জ্বল করতঃ গজরাজে সওয়ার হইয়া, বন্ধুসুন্দরের রাজালয়ে গমন। যাঁহাকে লইয়া এত, তাঁহার পক্ষে তিরস্কার-পুরস্কার তুই-ই সমান। যাহারা দর্শক তাহাদের নিকট কিন্তু এই তুইটির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। বিশেষতঃ, যাহারা পীড়নকারী তাহাদের কাছে ইহা অদ্ভুত চমকপ্রদ। তাহারা ভাবিতেছে—যাহার উপর তাহারা এই মহা-অত্যাচার করিয়াছে, তাহার গুণ কি এতই যে রাজা বনমালী রায়ের মত লোকও তাহাকে পরম-সমাদর করিয়া ঘরে লইয়া যাইতেছেন! না জানি, জগদ্বন্ধুর মধ্যে কি গুণ

আছে! আবার আশঙ্কা আসিয়া চিন্তাকুল করিতেছে। তাহাদের দুষ্কর্ম্মের কথা রাজা বনমালীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সহজে রেহাই দিবেন না। রাজা-জমিদারের প্রতাপ কত! তাঁহারা না পারেন কি? অন্যদিকে, জগদ্বন্ধু তাহাদের নাম প্রকাশ করিলেই স্থানীয় ভক্তগণ তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিত। শুনিয়াছি বহু অনুরোধেও জগদ্বন্ধু তাহাদের নাম বলে নাই। সত্যই তো সে মহৎ,—এমন কত প্রকারের চিন্তা তাহাদিগকে শঙ্কিত, অনুতপ্ত ও লজ্জিত করিতেছে।

ক্রমশঃ রাজবাড়ীর দ্বারদেশে ঘণ্টার ধ্বনি পৌঁছাইল। রঘুনন্দন-প্রেরিত লোক দ্রুতগতি রাজপ্রাসাদ-অভিমুখে ছুটিতেছে। রাজ-কর্ম্মচারিগণ ত্রস্তপদে চলিয়া আসিতেছে। পাইক পিয়াদা বরকন্দাজ পুরে প্রবেশের পথের দুইপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মাহুতের ইঙ্গিতে হস্তী ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। রঘুনন্দনের স্কন্ধে ভর করিয়া একটি বিদ্যুদ্বর্ণ পুরুষ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল। রাজাবাহাদুর নিষ্কিঞ্চনের মত নগ্নপদে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়া যুক্তকরে সম্মুখে অবনত হইয়াছেন। 'জয় রাধে শ্যাম রাধে,' 'জয় রাধাবিনোদিয়া কি জয়'—ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। গ্রামবাসী নরনারী বালকবৃদ্ধ সকলে আসিয়াছে, আসিতেছে। অপরূপ সোনার মানুষ-দর্শনে নগরবাসী আনন্দে আত্মহারা। তাহাদের সহিত বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষীও যেন সে আনন্দের স্পর্শে মুগ্ধ। পশু-পক্ষীর আনন্দ-কলরব-সহ মিলিয়া সজীব ও উৎফুল্ল নরনারীর জয়ধ্বনি হুলুধ্বনি নগরের পথকে ব্রজবীথির শোভায়

সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। নাটমন্দিরে কীর্ত্তন চলিতেছে, ভক্তগণ গাহিতেছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধেগোবিন্দ ॥"

নামের রোল উঠিতেছে। রসাল করতাল, মধুর মাদল, মধুর ঝাঁজ, বড় শিঙা সব একত্রে মহারোল তুলিয়াছে। নদীয়ার আনন্দের হাট যেন মুর্ত্তিলাভ করিয়াছে।

নীলাচলে রথাগ্রে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নীচ-সেবাদর্শনে শ্রীশ্রীগৌরহরি মনে মনে যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছিলেন, আজ তাড়াসের পথে রায়বাহাদুর বনমালীর দৈন্য-বিনয়ে বন্ধুসুন্দর সেইরূপ সুখী হইলেন। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের মন্দিরের একটি পার্শ্ব-প্রকোষ্ঠ বন্ধুসুন্দরের জন্য পরিষ্কৃত করিয়া রাখা ছিল। স্বয়ং রাজা অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া বন্ধুসুন্দরকে সেই প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। রাণী-মাতা ও অন্যান্য পুরনারীগণ অদূরে দাঁড়াইয়া বন্ধুসুন্দরের অগ্রে প্রণতা হইলেন। ক্রমবর্দ্ধিত ভিড় দেখিয়া বন্ধুসুন্দর ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বন্ধু নির্জ্জনপ্রিয় জানিয়া রাজাবাহাদুর সকলকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। নিভৃত প্রকোষ্ঠে রায় বনমালী বন্ধু-বিনোদের সঙ্গে রহস্য-আলাপনে নিযুক্ত হইলেন।

'প্রভু' ও 'রাজর্ষি'

বনমালী বন্ধুসুন্দরের অগ্রে নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। যুক্তকরে রাজা সম্ভাষণ করিলেন—'প্রভু!' মুহূর্ত্তে বনমালীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটি সুপ্ত তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ডাকটি যেমন প্রাণভরা, সাড়াটিও আসিল তেমনি হৃদয়-খোলা। কোকিল-কণ্ঠকে লজ্জা দিয়া শব্দ-সমুদ্রে বীণার তরঙ্গ তুলিয়া, বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখ হইতে প্রতিধ্বনি হইল—'রাজর্ষি!'

আইটোটার পুষ্পোদ্যানে 'ভূরিদা'-মন্ত্রের প্রতিদানে যে-মিলনমাধুরী মূর্ত্ত হইয়াছিল, বনওয়ারী-নগরের রাধাবিনোদ-কুঞ্জে তাহাই নব ভাবে প্রকটিত হইল। 'প্রভু'-সম্বোধনে বন্ধুসুন্দর যেন চমকিত হইলেন। 'রাজর্ষি'-শব্দে রায় বনমালীর যেন সেই লীলা-উদ্যানের আত্মসংবিৎ ফিরিয়া আসিল। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অদ্বৈত-বংশধর শ্রীরঘুনন্দন ভক্ত-ভগবানের মিলন-মাধুরী আস্বাদনে বিভোর হইলেন। জগজ্জীবও সেইদিন হইতে জগদ্বন্ধুসুন্দরকে 'প্রভু জগদ্বন্ধু' ও রায় বনমালীকে 'রাজর্ষি' বলিয়া চিনিল, ডাকিল। আমরাও ডাকিব। ডাকিয়া, ভক্ত-ভগবানের গুণ গাহিব, ধন্য হইব।

রাগবর্ত্ম

শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু রাজর্ষি মহোদয়কে কয়েকদিন ধরিয়া রাগ-মার্গের ভজন-রহস্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। রাজর্ষি ব্রহ্মভাব হইতে ভক্তির দিকে উন্মুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু রাগমার্গের মাধুর্য্য বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিতেন না। আজ প্রভুর করুণায় তাঁহার সম্মুখে একটা নূতন রাজ্য খুলিয়া গেল। রাজর্ষি বুঝিলেন, ভগবান কেবল যে ভয়-ভীতি বা ভক্তির পাত্র এবং তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনাই যে সব, তাহা নহে। তিনি প্রেমের ঠাকুর, ভালবাসার ধন। মর্য্যাদা ও পূজা অপেক্ষা প্রীতি ও সেবার কাঙাল। আর, ভক্তই যে কেবল ভগবানকে ডাকে ভালবাসে, তাহা নহে। স্বয়ং ভগবানও নিরন্তর ভক্তকে ডাকেন ভালবাসেন, আপন করিতে অধীর আগ্রহে ঘুরিয়া বেড়ান। সেই সব কারণেই তিনি চক্রধর ভগবান হইয়াও গোপবেশ বেণুকর। সেই জন্যই বংশীধারীর বংশী। বংশীবদন অনুক্ষণ বংশীরবে তাঁহার ভালবাসার-জনদের ডাকেন। ডাকিয়া তাহাদের লইয়া নানা ক্রীড়াবিলাস করেন এবং তদ্বারা আপন রসনির্য্যাস আপনি আস্বাদন করেন।

রাজর্ষি প্রভুর কৃপায় অনুভব করিলেন যে, প্রেমের গতি উভয়-মুখী। ভক্তের ন্যায় ভগবানও অনুরাগী ভক্তের নিকট আত্মদান করেন। নিজেকে দিয়া আনন্দময় আনন্দে ডুবিয়া যান। ব্রজের গোপকুমারীরা অনুরাগের মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ। তাঁহাদিগের নিকট ভগবান নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিয়াও তৃপ্ত হয়েন না, স্বেচ্ছায় ঋণের বোঝা বহন করেন।

অনুরাগিণী প্রণয়িণীর ভাব-ভাবিত হইয়া রাজপথে 'রাধে রাধে' বলিয়া কাঁদিয়া, ভগবান একই সময় প্রেমের আস্বাদন ও বিতরণ করেন। সেই একাধারে রসভোক্তা ও রসদাতা বদান্য-শিরোমণি গৌরাঙ্গসুন্দরের ও তাঁহার পরিকরগণের পরম-করুণাই রাগবর্ত্মে প্রবেশের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। রাজর্ষি আজ হইতে সেই পাথেয়-সংগ্রহে যত্নবান হইলেন। এই সংগৃহীত ধন জগজ্জীবকে বিতরণের আগ্রহ যখন রাজর্ষির জাগিয়াছিল, তখন প্রভুবন্ধুর অযাচিত করুণায়, শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থ-প্রচারণের গুরু দায়িত্ব তিনি আজীবন শিরে বহন করিয়াছিলেন। ধন্য কৃপা! শতধন্য রাজর্ষি বনমালী!

শ্রীরাজবিগ্রহ

রাজবিগ্রহ শ্রীরাধাবিনোদজী বহুকাল যাবত রাজবাড়ীতে সেবিত হইতেছেন। রাজর্ষি আজ সেই সেবার নিগূঢ় মর্ম্ম অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার মন্দিরস্থিত ঐ বিগ্রহ বিগ্রহমাত্র নহেন, ওখানে ভানুকুমারী ও নন্দকুমার সাক্ষাৎভাবেই বিরাজিত।

শ্রীবিনোদজী 'জামাই বিনোদ'-নামেই প্রসিদ্ধ। কোনও সময় বিনোদিয়া রাজপরিবারের একটি মধুর-ভাবাবিষ্টা কুমারীকে নিজ-কান্তারূপে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তদবধি তিনি 'জামাই ঠাকুর'-নামে জামাই-আদরে তাড়াস-ভবনে আছেন। জামাই-ঠাকুরের সেবার পরিপাটী অতুলনীয়। ভোগান্তে জামাইকে গড়গড়ায় করিয়া সুগন্ধি তামাক দেওয়ার নিয়ম আছে। রাজর্ষি

"বৈষ্ণব"—শ্রীপাদ রঘুনন্দন গোস্বামী
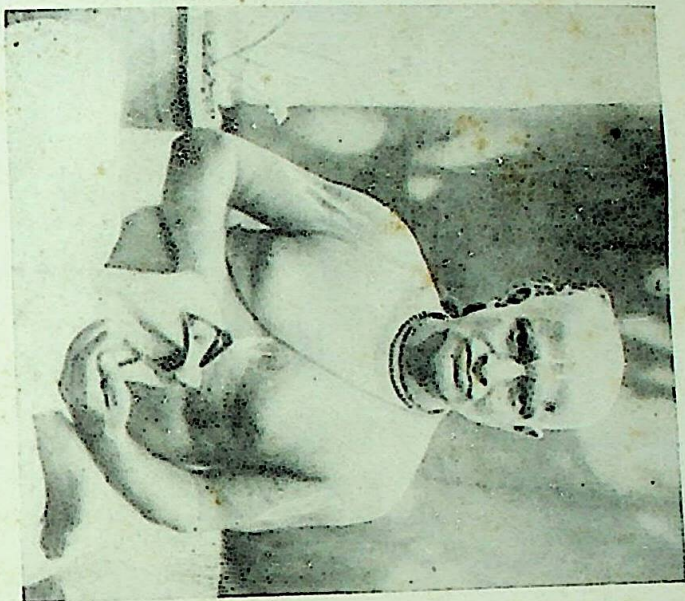
রাজর্ষি শ্রীবনমালী রায়

পূর্ব্বপুরুষের সেবার রীতিনীতিগুলি সকলই বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল নীতির মর্ম্ম সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন না। প্রথম জীবনেও ব্রাহ্মভাবে সংশয়ের চক্ষেই দেখিতেন। আজ প্রভুবন্ধুর কৃপায় দিব্যচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। তথাপি ভগবানকে আবার তামাক দেওয়া কি!—এ সম্বন্ধে সংশয়ের রেখা হৃদয়ের কোণে লুক্কায়িত রহিল।

শ্রীশ্রীবিনোদের ভোগান্তে একদিন শ্রীশ্রীপ্রভুবন্ধু রাজর্ষিকে ডাকিয়া বলিলেন—'আসুন, বিনোদিয়ার তামাকু-সেবা-কৌতুক আস্বাদন করি।' এই বলিয়া রাজর্ষিকে লইয়া শ্রীমন্দিরের জগমোহনে গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—'ঐ কান পাতিয়া শুনুন, বিনোদ তামাক খাচ্ছেন, ঐ শুনুন, গড়্‌গড়্‌-শব্দ শোনা যাচ্ছে।' বন্ধুসুন্দরের পরম কৃপায় রাজর্ষির দিব্যকর্ণ খুলিয়া গেল। তিনি সত্যসত্যই শুনিতে পাইলেন, তামাক-খাওয়ার গড়্‌গড়্‌ শব্দ হইতেছে। শুনিতে শুনিতে আনন্দে রাজর্ষির দেহ শিথিল হইয়া আসিল, নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইতে লাগিল। বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া তিনি অননুভূতপূর্ব্ব ভাবসমাধিতে তন্ময় হইয়া গেলেন।

ইহার পর হইতে রাজর্ষির শ্রীবিগ্রহ-স্বরূপে চিন্ময়বুদ্ধি এমনই সুগভীর ও সুদৃঢ় হইয়াছিল যে, কোনও কথাপ্রসঙ্গেও কোনও লোক এমন কোনও শব্দ যদি প্রয়োগ করিত, যাহাতে বিগ্রহকে মূর্ত্তিমাত্র বুঝায়, তাহা হইলে তিনি প্রাণে বেদনা অনুভব করিতেন।

রাজর্ষি বনমালী জামাইবিনোদ ও বন্ধুবিনোদকে অভিন্ন-

জ্ঞানে সেবা করিতেন। কখনও জামাইর জন্য আনীত দ্রব্যাদি বন্ধুকে, বন্ধুর জন্য আনীত সেবার সামগ্রী জামাইকে দিয়া ফেলিতেন। ইহাতে ভয়সঙ্কোচ বা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবুদ্ধি আসিত না।

বনওয়ারীনগরে আগমনের পর হইতে বন্ধুসুন্দরের নির্জ্জন-প্রিয়তা বর্দ্ধিত হইল। বৃথা বাক্যব্যয় বা সময়-ক্ষেপণ কখনই করিতেন না। কাহাকেও সম্বোধন করিতে হইলে, নাম ধরিয়া ডাকা ত্যাগ করিলেন, 'হরেকৃষ্ণ' 'হরিবোল' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধুসুন্দরের শ্রীরূপমাধুর্য্য ও তাঁহার নিষ্ঠা পবিত্রতার আদর্শ দেখিয়া রাজকর্ম্মচারী ও পুরবাসী সকলেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইলেন। মন্দিরের পূজারী, সেবক সকলেই বন্ধুসুন্দরকে পরম ভক্তি ও অকপট প্রীতির সহিত সেবা করিতেন। রাজর্ষি সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে প্রভুবন্ধুর সন্নিধানে বসিয়া উপদেশামৃত পান করিতেন। শ্রীরঘুনন্দন ভক্ত-ভগবানের নিত্যলীলা দেখিয়া তন্ময় রহিতেন।

রঘুনন্দনের আনন্দ

শ্রীঅদ্বৈত-কুলতিলক শ্রীপাদ রঘুনন্দন গোস্বামী আজ শ্রীবন্ধুসুন্দরের অযাচিত কৃপাভাজন হইলেন। শিষ্য-বাড়ী আসিয়া গুরুই আজ শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই শিষ্যত্ব-লাভে গুরুবংশও সার্থক হইল। শাস্ত্র-বাক্যানুসারে পরম-দেবতার পরম-পদ-প্রদর্শনকারী ব্যক্তিই যথার্থ গুরুপদবাচ্য। শত সাধন করিয়াও জীব যাঁহাকে পায় না, শেষে আর পাব না ভাবিয়া নৈরাশ্যের আঁধারে পতিত হয়, সেই সাধন-দুর্লভ ধনকে পাবনা হইতে সঙ্গে আনিয়া ব্যাকুলপ্রাণ রাজর্ষিকে দর্শন করাইয়া রঘুনন্দন আজ প্রকৃত গুরুপদবাচ্য হইলেন। রাজর্ষিও কোনও দিন এ সত্য অস্বীকার করেন নাই। গোস্বামিপাদের প্রতি-কথা ও আচরণে রাজর্ষির কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিত।

শ্রীশ্রীপ্রভুর মধুর সঙ্গ ও আদেশ-উপদেশ-বলে রঘুনন্দনের জীবনেও ব্রজবনের বাতাস বহিল। কিরূপে প্রভুবন্ধুর কৃপায় স্তরে স্তরে তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন ও কৃপামাধুরী-আস্বাদন ঘটিয়াছে, গোস্বামিপাদ তাহা অনেক সময়ে নিজ-মুখে বর্ণনা করিতেন। অনেক সময় বলিতেন—

পবিত্র অদ্বৈতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশোচিত বেশভূষায় সজ্জিত থাকিলেও, আমার হৃদয় সংযত না থাকায় অন্তর্দ্রষ্টা প্রভুবন্ধু আমাকে উপহাস করিয়া 'ট্যাংরা রঘু' বলিয়া ডাকিতেন

তাঁহারই অযাচিত কৃপার ধারায় যখন হিংসা ও লোভবৃত্তি হৃদয় হইতে প্রশমিত হইল এবং আহারে বিহারে বৈষ্ণবাচার-সম্পন্ন হইলাম, তখন প্রভুবন্ধু আমাকে সস্নেহে 'রঘুনাথ' বলিয়া ডাকিলেন। শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের ভজন-সম্পদ্ দিয়া বন্ধুসুন্দর যখন এই জীবাধমকে আত্মসাৎ করিলেন, তখন আদর করিয়া 'রঘুমণি' বলিয়া ডাকিতেন। যখন শ্রীশ্রীবন্ধুহরির অপার কৃপা-পারাবারে স্নাত হইয়া সেবা-নিষ্ঠা ও ভজনানন্দে জীবন সার্থক হইয়া উঠিল, তখন প্রেমের ঠাকুর বন্ধুহরি আমাকে প্রেমমধুর কণ্ঠে 'শ্রীরঘুনন্দন' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং কত কারুণ্যমাখা চিঠিপত্র শ্রীহস্তে লিখিতেন। এই সব শ্রীগোস্বামিপাদের নিজ-মুখের কথা, স্বকর্ণে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম।

গোস্বামিজীর ভজন-সিদ্ধ প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার স্বভাব-সুলভ স্নেহপূর্ণ মধুর আলাপন যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বন্ধুর কৃপার নিদর্শনটি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন। শ্রীরঘুনন্দনের স্বচ্ছ হৃদয়ে অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য একবিন্দুমাত্রও ছিল না। দীনতা নম্রতা তৃণাদপি সুনীচভাব তাঁহার জীবনের পরমোজ্জ্বল অলঙ্কার-স্বরূপ ছিল। তিনি কখনও কাহাকেও নিজ-চরণ-স্পর্শ করিতে দিতেন না। হঠাৎ কেহ অতর্কিতভাবে চরণ-ধূলি লইয়া ফেলিলে, তিনি নিজেকে নিতান্ত অপরাধী জ্ঞান করিতেন, এবং যেখানে সেই পদ-স্পর্শকারী ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকিত, সেই স্থান হইতে ধূলি লইয়া পুনঃ পুনঃ নিজ-দেহে মার্জ্জন করিতেন।

"উত্তম হইয়া আপনাকে হীন করি মানে।"—বাক্যটির প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহার জীবনের আচরণের মধ্যে মূর্ত্তিলাভ করিত। এই কারণে সকলেরই তিনি মর্য্যাদার পাত্র ছিলেন। তাঁহার অতুলনীয় শুচি-নিষ্ঠা ও সেবা-পারিপাট্যের কথা নবদ্বীপ-ধামে সর্ব্বজনবিদিত ছিল। মাদৃশ জীবের অযোগ্য লেখনীতে শ্রীরঘুনন্দনের সম্যক্ পরিচয় দিবার প্রয়াসও ধৃষ্টতামাত্র। ভক্ত-গৌরব-বর্ণনে মুখর প্রভুবন্ধুহরি 'ত্রিকাল গ্রন্থ'-নামক গ্রন্থে শ্রীহস্তে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উপর বড় প্রশংসা পত্র কি আর থাকিতে পারে? শ্রীবন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন 'বৈষ্ণব—রঘু গোঁসাই।' বৈষ্ণবের যাবৎ গুণ শাস্ত্রে উক্ত আছে, যদি কেহ তাহা একাধারে দর্শন করিতে সাধ করেন, তবে তিনি শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামিপাদকে দর্শন করুন।

অভিনব ক্ষমা

পাবনা-সহরে যে বন্ধুসুন্দরের শ্রীঅঙ্গে আঘাত হইয়াছে, একথা গোপন নাই। লোকপরম্পরায় রাজর্ষিও শুনিতে পাইয়াছেন। রঘুনন্দন গোস্বামিজীর সঙ্গেও রাজর্ষি এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। একদিন উভয়ে শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের পার্শ্বে বসিয়া মহাপ্রভুর পরম-গম্ভীরালীলার কথা শ্রবণ করিতেছেন। কথা-প্রসঙ্গে রাজর্ষি বন্ধুসুন্দরকে বলিলেন—'প্রভু, পাবনায় কাহারা আপনার শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিয়াছে, তাহাদের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হয়। শুনিয়াছি, আপনি সকলকেই চিনেন, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই নাম বলেন না।' শ্রীবন্ধুসুন্দর উত্তর করিলেন— 'আমি দণ্ড দিতে আসি নাই, উদ্ধারণ দিতে আসিয়াছি।'

রাজর্ষি মনে করিলেন, তিনি পীড়নকারীদের দণ্ড বিধান করিবেন, এইকথা মনে করিয়াই বোধ হয় ক্ষমার দেবতা তাহাদের নাম প্রকাশ করিতেছেন না। ইহা ভাবিয়া পুনরায় কহিলেন 'প্রভু, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কোনওপ্রকার প্রতিশোধ লইবার কল্পনা লইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না। শুধুই জানিতে ইচ্ছা হয় যে, সেই নির্ম্মমহৃদয় ব্যক্তিগণ কাহারা, যাহাদের এহেন গর্হিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি আসে।' কথাটি বলিতে না বলিতে রাজর্ষির নয়নকোণ হইতে অশ্রুবিন্দু গড়াইল।

বন্ধুসুন্দর সুস্মিত মুখে রাজর্ষির দিকে চাহিলেন। পদ্মপলাশ-

লোচন তুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত হইল। হাসির সঙ্গে মুকুতামালা সদৃশ দন্তপাতি হইতে শুভ্র জ্যোতিঃ বিকীরিত হইল! তৎক্ষণাৎ চম্পক-কলিকা অঙ্গুলিত্রয়ে লেখনী ধারণ করতঃ একখণ্ড কাগজে তুই পংক্তি অক্ষর সাজাইয়া কি যেন লিখিলেন। পীড়নকারীদের নাম লিখিতেছেন মনে করিয়া রাজর্ষি বিস্ময়াবিষ্টের মত পড়িতে লাগিলেন। রঘুনন্দন উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন—

"পাপরূপ হিমাচল শিরোদেশে ছিল।
লাহিড়ী পবনবেগে উড়াইয়া দিল॥"

রাজর্ষি একবার তুইবার তিনবার পড়িলেন। গোস্বামিজীর মুখের দিকে চাহিলেন, তুই জনেই মুগ্ধ। 'প্রভু প্রভু প্রভু হে' বলিতে বলিতে রূপ-মাধুর্য্য পান করিতে করিতে অশ্রু-পুলক-মণ্ডিত কম্পিত দেহ-তুইটি প্রভুবন্ধুর চরণ তলে লুটাইয়া পড়িল। সুকোমল শীতল করপদ্মের সুস্নিগ্ধ স্পর্শে তাঁহারা নব-সংবিদ লাভ করিলেন। ছয়টি চক্ষু একত্র হইল। তিনটি বিগ্রহ একখানি মনোহারী আলেখ্যের মত অবস্থান করিতে লাগিল।

তারপর একদিন গোস্বামিপাদ রাজর্ষিবরের সহিত শ্রীবন্ধু-কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রায়বাহাতুর, সেদিন শ্রীশ্রীপ্রভু শ্রীলেখনীতে যে তুই-পংক্তি লেখা লিখিলেন তাহার তাৎপর্য্য আপনার কি মনে হয়?' রাজর্ষি কহিলেন—'প্রভুপাদ, আমার মনে হয়, শ্রীশ্রীপ্রভুর ক্ষমার আদর্শ অতুলনীয়। শাসন বা ক্ষমার কোনও প্রশ্নই নাই। অন্যায় কেহ করিয়াছে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও বুঝিবার উপায় নাই। তিনি অত্যাচারকে উপকার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, তাঁহার মাথার

উপরে হিমালয়ের মত পুঞ্জিত পাপ ছিল, কোনও লাহিড়ী তাহা উড়াইয়া দিয়াছে। অত্যাচারকারীর প্রতি এইরূপ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন আমি জীবনে কখনও শুনি নাই। ইহাকে ক্ষমা বলা যায় না, ক্ষমার চাইতে কোনও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যাঁহার ভাষা অভিধানেও নাই।'

রাজর্ষি-প্রবরের কথায় পরম পুলকিত হইয়া গোস্বামিপাদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা, প্রভু নিজের মাথায় পাপের কথা বলিলেন কেন? প্রভুর আবার পাপ কি?' এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিবার সময় "জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব"—এই পরম-সাধু-চরিত্রের স্বরূপচ্ছটা গোস্বামিপাদের মুখমণ্ডলে ঝলক দিতেছিল। ধীর বিনীতভাবে রাজর্ষি কহিলেন—'প্রভুপাদ, আমার মনে হয় আমাদের সকল জীবের পাপই প্রভুর পাপ। কলি-তাপদগ্ধ আমাদের মত অভাজনদের পাপের বোঝা বহন করিতেই তাঁহার আগমন।' রাজর্ষি কথাটি শেষ করিতে না করিতে গোস্বামি-প্রবর অদ্বৈত-হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিয়া আনন্দ-বিহ্বলভাবে রাজর্ষিকে জড়াইয়া ধরিলেন। মরমী ভক্তের ইষ্ট-আলাপন প্রাণবন্ত হইল! পরবর্ত্তীকালে গোস্বামিপাদ যখন এই সকল কথা বলিতেন, তখন দুই হাতে ঘন ঘন চোখের জল মুছিতেন। সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে-ই দেখিয়াছে।

দেবেন্দ্রের দর্শন

বারশত পঁচানব্বই সাল, মাঘমাস। দারুণ শীতের জাড্যে তরুলতা মলিন। দিনমণি ম্লান আলো বিতরণ করিতে করিতে ক্ষিপ্র গতিতে অস্তাচলে চলিয়াছেন। মাঠ ভরিয়া সরিষার ফুল স্বর্ণ-শয্যা পাতিয়াছে, রাখালগণ গোচারণকালে হৃত ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে নাচিতেছে, গাহিতেছে। পত্রহীন পলাশ-শাখায় অন্তরের অনুরাগ রূপায়িত হইয়া জগৎ-সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজর্ষিরও বিষয়-মোহ-শূন্য অন্তর হইতে নবানুরাগে রঙ্গীন প্রাণে একটি গুপ্ত সাধ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে।

রাজর্ষির সাধ প্রভুবন্ধুর সুখময় সঙ্গে কিছুদিন গঙ্গাতীরে বাস করা এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে যমুনা-পুলিনে অবস্থান। প্রথমে রাজর্ষি গঙ্গাতীরের কথাটি প্রকাশ করেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভুবন্ধুও তাহাতে স্নেহ-সম্মতি দান করেন। রাজর্ষির চিত্ত আনন্দে ডগমগ করিতে লাগিল। তিনি নৈহাটিতে একটি বৃহৎ বাটী বাসের জন্য সংগ্রহ করিলেন। মহা-ধুমধামের সহিত জামাইবিনোদ ও বন্ধুবিনোদকে লইয়া রাজর্ষি সপরিবারে নৈহাটির বাসাতে আসিলেন। সানন্দে প্রভুবন্ধুর শ্রীবিগ্রহের প্রেমসুধা ও লীলারস আস্বাদন করতঃ রাজর্ষি পরমানন্দে দিনাতিপাত করেন। সেবানন্দ, ভজনানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণানন্দ—ইহা ছাড়া রাজর্ষির আর কোনও কাজ নাই। কেবল মধ্যাহ্ন-স্নানের পূর্ব্বে তৈল মাখিতে মাখিতে একান্ত প্রয়োজনীয় বৈষয়িক কথা বলেন ও শোনেন।

কোথা হইতে দয়াল নিতাইচাঁদের-নামে-পাগল একটি ব্রাহ্মণ-কুমার রাজর্ষির নৈহাটি-ভবনে আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে 'জয়নিতাই' 'জয়নিতাই' শব্দ ছাড়া আর কোনও কথাই নাই। প্রায়-সর্ব্বদাই ভাবাবেশে থাকেন। পথ হাঁটিতেছেন, আহার করিতেছেন, স্নান করিতেছেন অথচ কিছুরই মধ্যে যেন তিনি নাই। একটা অদ্ভুত তন্ময়তা, ভাবসাগরে যেন ডুবিয়াই আছেন। নাম ধরিয়া কেহ বারংবার ডাকিলেও সাড়া পাওয়া যায় না! কেবলমাত্র 'জয়নিতাই' 'জয়নিতাই' বলিয়া উচ্চধ্বনি করিলে উহা তাহার কর্ণে প্রবেশ করে।

যুবকটির নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। নিবাস নদীয়া-জেলায়, পাশ্চাত্য-শিক্ষায় উচ্চ-শিক্ষিত। এম্, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। ঘটনাচক্রে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। বিখ্যাত ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী মহোদয়ের সহাধ্যায়ী ও বাল্যবন্ধু। শিলং উচ্চ-ইংরেজী-বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর হেড্‌মাষ্টারী করিয়াছেন। তারপর নিতাইচাঁদের অযাচিত করুণায় সর্ব্বস্বত্যাগী হইয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মে ও শাস্ত্রগ্রন্থে অনন্যসাধারণ প্রবেশ। গৌড়ীয় গ্রন্থরাজির মধ্যে সুগভীর অনুসন্ধান। যেমন জ্ঞান, তেমনই ভক্তি। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে তত্ত্বানুভূতি ও ভক্তি-গদগদ-ভাবের মিলনটি পরম উপাদেয়। জয়নিতাই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গ পাইয়া রাজর্ষি পরম আনন্দিত। আনন্দিত হইবারই কথা। রাজর্ষির এখন নব অনুরাগ।

শ্রীরাধাবিনোদজীর মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া জয়নিতাই বিনোদিয়ার মোহন মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন। রূপে নয়ন

ভরিয়া যাইতেছে। এমন সময় অপর একটি অভিনব মোহন মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-পথগত হইল। সে মোহন পুরুষ একটি চামর হস্তে লইয়া বিনোদজীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। চামরধারীর রূপের ছটা ও চিত্তাকর্ষী পরম তরুণ-ভাব দেখিয়া জয়নিতাই যেন কেমন হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে চামরধারীর হস্ত হইতে চামরটি খসিয়া পড়িল। তিনি বিহ্বলভাবে শিশু-সারল্যমাখা হাসিমুখে শ্রীবিনোদজীর শ্রীমুখারবিন্দ আনন্দে দর্শন করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আপন অজ্ঞাতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেরূপ জলপূর্ণ পাত্র মুখের কাছে ধরিয়াই রাখে, প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াও ছাড়িতে চায় না, ঐ মোহন পুরুষটি শ্রীবিনোদিয়ার রূপের ডালিখানি তেমনিভাবে নিজ-পলকহীন নয়নের অগ্রে ধরিয়াই রাখিয়াছেন। নয়নের আর সরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই। সুন্দর মুখে নানাভাবের অভিব্যক্তি হইতেছে।

দেখাদেখি দর্শক দেবেন্দ্রনাথের মুখও যেন রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার বিমর্ষ নয়ন দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। ক্রমে মুক্তার মত একটি বিন্দু নয়নতারায় ফুটিয়া উঠিল; তারপর আর একটি, আর একটি। যুবকের বক্ষ-বসন সিক্ত হইতে লাগিল। ক্ষণপরে আবার মুখে হাসি ফুটিল, তখনও অশ্রুধারা সমান বহিতে লাগিল। মেঘ কাটিল, রৌদ্র ফুটিল; কিন্তু বর্ষণ চলিতেই থাকিল। অপূর্ব্ব-দর্শন! অভূত-পূর্ব্ব দৃশ্য!

জয়নিতাই বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে শ্রীমুখ-দুইখানি

দেখিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, দুই মুখের ভাবমাধুরী একই প্রকার। যেন দুইটি বিনোদ—একটি কৃষ্ণবর্ণ, অপরটি গৌর-বর্ণ—এক বিনোদ আর এক বিনোদকে দেখিতেছেন! দেখিয়া দেখিয়া উভয়েই যেন চমৎকৃত। জয়নিতাইর মনে পড়িল, বৈষ্ণব-কবির বর্ণনা—

"রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।"

ঐ দুই বিনোদের মধ্যে কে পূজ্য কে পূজক, জয়নিতাই তাহা নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তপরে একটি শ্রীমুখ অন্তরালে অন্তর্হিত হইলে, জয়নিতাইর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। প্রকৃতিস্থ হইয়াই, 'ইনি কে'—জানিবার জন্য 'জয়নিতাই' আগ্রহান্বিত হইলেন। রাজর্ষির জনৈক পারিষদকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'শ্রীবিনোদজীর মন্দিরে ঐ নবকিশোর মূর্ত্তিটি কে?'

'প্রভু জগদ্বন্ধু'।

'তিনি কে?'

'পাবনার অদ্বিতীয় মহাপুরুষ। রাজর্ষি ও রাণী-মার পরম শ্রদ্ধা ও পূজার পাত্র।'

সময়ে সুযোগমত ইঁহার সহিত আমার নিশ্চয়ই পরিচয় হইবে—এই আশা হৃদয়ে পোষণ করতঃ, দেবেন্দ্রনাথ আনন্দে 'জয়নিতাই' 'জয়নিতাই' বলিতে লাগিলেন। দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু পুনদর্শনের প্রবল তৃষ্ণা জাগিল না, ইহা অদ্ভুত বটে! আচার্য্যপাদেরা বলেন—অদ্ভুত নহে; তাঁহাকে

দর্শন করিবার তৃষ্ণা তিনি যখন যেভাবে ঠিক যতটুকু দিবেন, তাহার চাইতে বেশী পাইতে কাহারও বিন্দুমাত্র অধিকার নাই।

লুকোচুরি

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

—শ্রীবিল্বমঙ্গল

কয়েক দিবস গঙ্গাতীরে কাটাইয়া রাজর্ষি বন্ধুসুন্দরের সহিত শ্রীশ্রীব্রজধামে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বন্ধুসুন্দর এবার কিন্তু সম্মতি দিলেন না, নীরব রহিলেন। সে নীরবতায় রাজর্ষির মনের তলে একটা ক্ষীণ সন্দেহের রেখাপাত হইল। তথাপি আগ্রহের আতিশয্যে সে-ভাবটি চাপা পড়িল। মৌন-ভাবকে সম্মতি-লক্ষণ ধরিয়া লইয়াই রাজর্ষি শ্রীবৃন্দাবন যাইবার উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলেন।

নৈহাটি হইতে ট্রেন্ ছাড়িয়াছে। সগোষ্ঠী রাজর্ষি মহা-উৎসাহে পশ্চিমগামী ট্রেন্ ধরিয়াছেন। বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইয়া রাজর্ষির হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। জয়নিতাই দেবেন্দ্রনাথ রাজর্ষির নিকট তাঁহার মুখ মলিন হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বেদনাভারাক্রান্ত কণ্ঠে রাজর্ষি কহিলেন—'প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর আমাদের সহিত শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইতেছি না। তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ, কাহারও অধীন নহেন। এইজন্যই মন ব্যাকুল।' এমন রত্ন হাতে পাইয়াও অযত্নে হারা হওয়ায় জয়নিতাইর

মনপ্রাণও অত্যন্ত বেদনাক্লিষ্ট হইয়া পড়িল। এইভাবে পলায়ন করিয়া শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর এককালে দুইটি ভক্তের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলিলেন। ভক্তকে বিরহ-বেদনা দিয়া তাঁহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইয়া তাঁহাকে কাঁদাইতে তাঁহার মত দ্বিতীয়টি আর কোথায় ?

বন্ধুর বাসনা

গাড়ীতে যেস্থানে দ্বিতীয় শ্রেণীর যে-প্রকোষ্ঠে বন্ধুসুন্দর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজর্ষি সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ মাথা কুটিতে লাগিলেন। সেইস্থান এখনও বন্ধুসুন্দরের অঙ্গের গন্ধ প্রকাশ করিতেছে। একটুকরা প্রসাদী-বস্ত্র পড়িয়া আছে। রাজর্ষি তাহা কুড়াইয়া বুকে ধারণ করিলেন। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ঐস্থানে প্রভুবন্ধুর শ্রীলেখনী-প্রসূত একটি কবিতা পড়িয়া আছে। রাজর্ষি তাহা মাথায় ছোঁয়াইয়া, পাঠ করিলেন,—

"হরি হরি ব'লে, দুনয়ন-জলে,
ভাসিবে উরস মোর।
ব'লে শ্রীগৌরাঙ্গ, হব অবশাঙ্গ,
যুগল-প্রেমেতে ভোর॥
আশার ছলনা, কনক ললনা,
কবে বা ঘুচিবে হায়।
এ হেন বিপদে, রাখিবেন ও পদে
প্রাণ নিত্যানন্দ রায়॥

জয় জয় দিয়ে, প্রবেশিব গিয়ে,
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে।
অষ্ট-অঙ্গে পড়ি, দিব গড়াগড়ি,
বন্ধুর বাসনা মনে॥"

পড়িতে পড়িতে রাজর্ষি চোখের জল মুছিতেছেন। একবার দুইবার তিনবার চারিবার বহুবার পাঠ করিতেছেন। "বন্ধুর বাসনা মনে"-কথাটি রাজর্ষি শতবার উচ্চারণ করিতেছেন। মধুর লাগিতেছে।

গানটি রাজর্ষি অনেকবার পড়িলেন। নূতন কিছু শিখিলেন। অভিনব কিছু বুঝিলেন। কি কারণে প্রভুবন্ধু তাঁহার সঙ্গে ব্রজে আসিলেন না, তাহাও কিঞ্চিৎ অনুভব করিলেন। তাঁহার নিজের যে কি ভাবে, মনের কি অবস্থা লইয়া ব্রজভূমে যাওয়া কর্ত্তব্য, তাহাও কিঞ্চিৎ বোধগম্য হইল। জীবমাত্রেরই কি ভাবে ব্রজে যাওয়া উচিত, ঐ পদের মধ্যে রাজর্ষি তাহাও দেখিতে পাইলেন। রাজর্ষির নয়ন অশ্রুপূর্ণ, কণ্ঠ গদগদ, হৃদয় বৈরাগ্যপূর্ণ।

রাজর্ষির ব্রজে যাইবার যেটুকু অযোগ্যতা ছিল, দয়াল বন্ধুসুন্দর তাহা সুকৌশলে দূর করিয়া দিলেন—বিরহ-দ্বারা তাপিত করিয়া ও স্বরচিত পদের মাধুর্য্যে গলাইয়া দিয়া। রাজর্ষি ! এইবার ব্রজে চল। তুমি যে ব্রজেরই। জন্ম-জন্মান্তরের কত কথা, সব ভুলিলে কেন ? তোমাদের কথা বলিতে বলিতে আর ভাবিতে ভাবিতে অযোগ্যেরাও ব্রজে যাইবার যোগ্য হইবে।

বিরহী বকু

বন্ধুর বাল্যসঙ্গী প্রিয় বকুলাল এণ্ট্রান্স্-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার থাকার স্থান মিরজাফর ষ্ট্রীটে (কলেজ রো) একত্রিশ নম্বর মেস্-বাড়ীতে। প্রিয়বন্ধু জগৎসুন্দরের সঙ্গহারা হইয়া বকুলাল ম্রিয়মান। সে সবেমাত্র গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়াছে। সহরে নব নব প্রলোভনের উপকরণ, শত শত নয়নাকর্ষী দৃশ্য, সহস্র মনভোলা সামগ্রী। কিছুই বকুলালের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না।

একে তো দেশের ছেলে, সুদূর কলিকাতায় আসিয়াছে একাকী, তাহাও পড়িবার জন্য, এবং থাকিতে হইবে মেসে। এরূপক্ষেত্রে মনের যে-অবস্থা হয় তাহা সমাবস্থার ছাত্রমাত্রই বুঝে। বকুলালের অবস্থা তাহা অপেক্ষা বহুগুণে কঠিন। সে যাহা গ্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহা জগতে সুদুর্লভ। ক্বচিৎ কোনও কালে, ক্বচিৎ কোনও দেশে, ক্বচিৎ কোনও জীব তাহা লাভ করিবার সুযোগ পায়। তাঁহাকে হারাইয়া জ্ঞান-আহরণ করিতে যাওয়া যেন মণি ফেলিয়া কাঁচ-সংগ্রহ! সেই সারাৎসার-বস্তু সর্ব্বজীবের কেন্দ্র-স্বরূপ, প্রিয় হইতেও প্রিয়তম। সেই সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষকের আকর্ষণ যে মুহূর্ত্তমাত্র অন্তরে অনুভব করিয়াছে, জড়-জগতে কোন্ বস্তুর সামর্থ্য আছে তাহাকে ভুলায়!

বকুলালের বুকে বিরহ-ব্যথা। বিশ্বসংসারের সকলই যেন

তাহার কাছে তুচ্ছ। সমস্ত মহানগরীটা শূন্য। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার কেবল মনে পড়ে জগৎসুন্দরের রাঙা মুখখানি। সেই জ্ঞানদীয়ার বনপথের খেলা, সেই বদরপুরের ধান-ক্ষেতের লুকোচুরি, সেই অঙ্গ-গন্ধ পাইয়া লুকানো জগতকে খুঁজিয়া বাহির করা!—থাকিয়া থাকিয়া বকুলালের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, ছুটিয়া দেশে যাইবার ইচ্ছা হয়। আজ কলেজ হইতে ফিরিয়া অবধি বকুলালের মন আর প্রবোধ মানিতেছে না। ছাদের নির্জ্জন কোণে বসিয়া প্রিয় জগৎকে ভাবিতেছে। নিরুদ্ধ অশ্রু-প্রবাহ বুকে ঝরিতেছে। সঙ্কল্প হইল, কালই দেশে জগতের কাছে পালাইয়া যাইবে।

সন্ধ্যার পর, অকস্মাৎ জগদ্বন্ধুসুন্দরের উদয় হইল। হইবারই কথা। সে ছাড়া সবই শূন্য, ভক্তের হৃদয়ে এই অবস্থাটি উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তাধীনের উদয়ও অবশ্যম্ভাবী। বকুলালের শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। অপ্রত্যাশিত-ভাবে স্নেহের ধনকে পাইয়া বকুলাল আনন্দ-পয়োধি-মাঝে ভাসিতে লাগিল। এই তো লীলা! একজনকে কাঁদাইয়া আর-একজনকে আনন্দে ভাসানো। একদিকে বন্ধুহারা রাজর্ষি বুকভরা বেদনা লইয়া ব্রজের পথে চলিতেছেন, অন্যদিকে সুখের সমুদ্রে ডুবিয়া বকুলাল রজনী যাপন করিতেছে।

প্রাণবন্ত উপদেশ

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"

—শ্রীঅর্জ্জুন

বকুলালকে বন্ধুসুন্দর কতকগুলি বিষয়ে উপদেশ দিলেন। উপদেশের প্রয়োজন বকুলালের ছিল। বকুলালের যৌবনের উন্মেষ হইয়াছে। প্রলোভন-পূর্ণ কলিকাতা-নগরে সে একা মেসে থাকে। উপদেশের বর্ম্ম না হইলে সংগ্রামে তাহার বাঁচা কঠিন। বকুলালের সঙ্গে বন্ধুর সম্বন্ধটি চিরকালই স্নেহ-প্রীতির। পূর্ব্বে কখনও উপদেশ দেন নাই। আজ যে তাহার দরকার।

প্রীতির ভিত্তিতে উপদেশ বড় মধুর। একই উপদেশ দেয়ালে লেখা থাকিলে একরকম - রসবিহীন, আচার্য্য অনুগত-শিষ্যকে বলিলে আর-একরকম—সুকঠোর। সেই উপদেশই ভালবাসার জন ভালবাসার জনকে দিলে সম্পূর্ণ অন্য রকম, সরস প্রাণবন্ত। বেদ উপনিষদ গীতায় একই উপদেশ। তথাপি, বেদ নীরস, উপনিষদ কঠোর, গীতা রসাল। গীতায় প্রত্যেকটি মন্ত্রের আড়ালে "যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া"—অর্জ্জুন, তোমাকে ভালবাসি, তাই তোমার কল্যাণের জন্য বলি—এই দরদের সুরলহরী প্রবাহিত। গীতায় প্রত্যেকটি কথার অন্তস্তলে পার্থের প্রতি পার্থসারথীর প্রেম-প্রবাহ ফল্গুধারার মত বহমান।

বন্ধুসুন্দরের শ্রীমুখ হইতে বকুলাল আজ সেইরূপ প্রেম-মাখানো উপদেশ শুনিল। উপদেশ-সকল শুনিয়া বকুলাল

অর্জ্জুনেরই মত বলিল—"করিষ্যে বচনং তব,"—'জগৎ, যেরূপ বলিতেছ সেই ভাবেই চলিব।' বন্ধুসুন্দর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'বকু, তুই ফকির হবি, না হয় হাকিম হবি।' পরবর্ত্তী জীবনে বকুলাল হাকিমই হইয়াছিল। হাকিম হইয়াও সে অদ্ভুত হাকিম ছিল। ফকিরোচিত প্রাণ-ঢালা ভাব, তাহার হাকিমী অন্তরের অন্তরালে খেলা করিত।

বন্ধুর উপদেশে বকুলালের জীবনে নূতন প্রবাহ খেলিল। বন্ধুর নির্দ্দেশ-মত বকু কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা-সহকারে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পালনে নিযুক্ত হইল। অত্যল্পকাল মধ্যেই বকুলালের তপ-জপ চাল-চলন আকৃতি-প্রকৃতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বন্ধুর বড় আনন্দ। বকুর আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাই কেবল সে ভাবে না, তাহার লেখাপড়ার উন্নতি কিসে হইবে, পাঠ্যপুস্তকাদি কি ভাবে সংগ্রহ হইবে, এ সকলও তাঁহারই ভাবনার বিষয়। বকুলালও বন্ধুর উপদেশে সঞ্জীবিত হইয়া নিষ্ঠা-পবিত্রতার পথে অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট হইল।

———

শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ

বড় আনন্দে বকুলালকে সঙ্গে লইয়া বন্ধুসুন্দর সানন্দে পথে বেড়াইতেছেন। ভাব ও গতি যেন উদ্দেশ্য-হীন যদৃচ্ছ-ভ্রমণ। পথে বালকদের মত এটা সেটা দেখিতেছেন। সরলতার প্রকট ছবি বন্ধুর প্রত্যেকটি কথা বকুলালের কানে মধুধারা বর্ষণ করিতেছে। সে মাঝে মাঝে মুরুব্বির মত বলিতেছে,—'জগৎ, যদি অমন ক'রে কলিকাতার রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একদিকে তাকাইয়া থাক, তাহা হইলে শীঘ্রই গাড়ী চাপা পড়িয়া যাইবা।' বকুর মুরুব্বিয়ানায় বন্ধুর সুখ লাগে।

দুইবন্ধু বহুবাজার ষ্ট্রীট দিয়া চলিতেছেন। হঠাৎ দাঁড়াইলেন। 'বেঙ্গল ফটোগ্রাফার আর্ট ষ্টুডিও' বিজ্ঞাপনটা পড়িলেন। 'আয় চল যাই, বকু, ফটো তুলি।'—বলিয়াই চতুর-চূড়ামণি বন্ধুসুন্দর ষ্টুডিও-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বকুলাল যন্ত্র-চালিতের মত অনুসরণ করিল। বন্ধুসুন্দর ফটোগ্রাফারকে চির-পরিচিতের মত বলিলেন—'গুরুদাস, আমরা ফটো তুলিব।'

প্রভু বন্ধুসুন্দরের অনন্যসাধারণ রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া ও কর্ণরসায়ন কথা শ্রবণ করিয়া ফটোগ্রাফার গুরুদাস একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কত মানুষ দেখিয়াছেন কত মানুষের ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন, কিন্তু কোনও মানুষের দেহে এত রূপ তিনি আর কখনও দর্শন করেন নাই। এহেন রূপসমুদ্রের আলোকচিত্র তুলিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইবে, ইহা ভাবিতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল। আনন্দাতিশয্যে ক্যামেরা ঠিক করিবার সামর্থ্য রহিল না। শরীর কাঁপিতে

লাগিল। একজন সহকারীকে ক্যামেরা ঠিক করিতে আদেশ দিয়া, গুরুদাস অনিমিষ নয়নে বন্ধুর অপ্রাকৃত রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর অপরূপ ভঙ্গীতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। বামপার্শ্বে জপমালা-হস্তে, যুক্তকরে বকুলাল প্রশান্তভাবে দাঁড়াইলেন। দুইটি মূর্ত্তি—দুইটিতেই গৌরব ও দৈন্যের অপূর্ব্ব মিলন। বিশ্বের গৌরব বন্ধুহরি রাজার ন্যায় নিশ্চিন্ত বাহুবন্ধনে মহানিষ্ক্রিয়তার প্রতীকরূপে বিরাজিত; আবার, রুক্ষকেশ, আড়ম্বরহীন দীনবেশ জীবদুঃখে-ব্যথিত হৃদয়ের সুস্পষ্ট পরিচায়ক; সুগম্ভীর মুখের স্নেহমাখা মৃদু হাসিটুকু দীন জীবকুলকে নীরবে প্রেমের বুকে টানে, আবার করুণায় ছলছল নয়নের স্থির ঊর্দ্ধদৃষ্টি দুঃখময় জগতের ঊর্দ্ধে প্রেমসুখময় অপ্রাকৃত রাজ্যের সন্ধান-দানে রত। আর বকুলাল,—পরম গৌরবস্থানে স্থিত হইয়াও আপন-দৈন্যে সজাগ; তাই দেহে ও বেশে দৈন্য প্রকট; কিন্তু মুখখানি তাহার আনন্দ গৌরবে উজ্জ্বল, আঁখি-দুইটি ভাবাবেশে ঢলঢল।

ভাগ্যবান গুরুদাস ভক্ত-ভগবানের অভিনব মিলনময় চিত্র যন্ত্রবক্ষে ও নিজচিত্তে চিরতরে অঙ্কিত করিয়া লইলেন। ধন্য গুরুদাস! 'দাস' হইয়াও তুমি আজ 'গুরুর' কার্য্য করিলে। চির বুভুক্ষু জগৎ তোমার এই দানে চিরতৃপ্ত থাকিবে।

শ্রীরূপ-মাধুরী

"তৎ কৈশোরং তচ্চ বক্ত্রারবিন্দং
তৎ কারুণ্যং তে চ লীলা কটাক্ষাঃ।
তৎ সৌন্দর্য্যং সা চ মন্দস্মিত শ্রীঃ
সত্যং সত্যং দুর্ল্লভং দৈবতেঽপি॥"

—শ্রীবিল্বমঙ্গল

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের শ্রীরূপের মাধুরী লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না। "যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।" যে দেখিয়াছে সে-ই জানে। সে বস্তুর ভাষা নাই। কোনও উপমা-দ্বারা তাহা বুঝানো যায় না। সংসারের সকল সৌন্দর্য্যানুভূতির মূলে আছে একটা পূর্ণতম সৌন্দর্য্যের শাশ্বত সত্তা। সেই সত্তাটিই যখন মূর্ত্ত হয়, তখন তাঁহার তুলনা মিলিবে কোথায়? বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যই যাঁহার অসম্পূর্ণ অনুকরণ, তাঁহার দৃষ্টান্ত মিলিবে কিরূপে! জড়-জগতের সকল সৌন্দর্য্য প্রতিনিয়ত একটি জড়াতীত রাজ্যের সৌন্দর্য্যের সন্ধান লইয়া আসিতেছে। বিশ্ব-প্রপঞ্চের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ সর্ব্বদাই সংবাদ দিতেছে, একটা পরিবর্ত্তন-হীন চিদানন্দঘন শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় পরম বস্তুর। যেদিন আর সংবাদ থাকে না, এই সংবাদ সেইদিন প্রত্যক্ষীকৃত ব্যাপার হইয়া পড়ে। সেই দিনই হয় সকল ক্ষুধাতুর নয়ন-মনের চিরতৃপ্তি। শ্রীশুকের ভাষায় "দৃশিমন্মহোৎসবং"—চক্ষুষ্মান জীবনিবহের নয়নের মহামহোৎসব। সেই মহোৎসবে যাঁহাদের পরা-পরিতুষ্টি হইয়াছে, তাঁহাদের অনুভবই ঐ মাধুরী-আস্বাদনে পরম পাথেয়।

তন্মধ্যে একটি ভক্ত লিখিয়াছেন—'বন্ধুসুন্দরের তখনকার চারিহস্ত-পরিমিত কামদমন দেহ, ভুবনমোহন রূপ সর্ব্বচিত্তা-কর্ষক সর্ব্বানন্দদায়ক! পরিধানে সুদীর্ঘ শুভ্রবস্ত্র, হস্ততল পদতল রক্ত-কোকনদাভ। সুদীঘল স্বর্ণদণ্ডের মত বাহু আজানুলম্বিত।'

'আকর্ণ আঁখি করুণায় ঢল ঢল। দীর্ঘ সুশোভন কর্ণ, অনিন্দ্যসুন্দর নাশা, সুশ্রী ভ্রূ-যুগল। মধুর রক্তিমাভ অধরোষ্ঠ, মনোহর মস্তক, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ ঘন কেশরাশি। সুবিমল গণ্ড, হাস্যোজ্জ্বল চিবুক, চন্দ্রোজ্জ্বল ভালদেশ, প্রদ্দীপ্ত বালারুণ-বয়ান। সুবিশাল কক্ষ-বক্ষ স্ফীত উন্নত। বক্ষে শুভ্র উপবীত, সুবর্ণ-সূত্রে গ্রথিত সূক্ষ্ম রুদ্রাক্ষের মালা। ক্ষীণ কটি, জ্যোতির্ম্ময় পৃষ্ঠদেশ, সুকোমল নিটোল উরু। সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত, উজ্জ্বল স্বর্ণ-চম্পক-বর্ণ, সুমসৃণ নবনীত-অঙ্গ।'

'আর এক মহাজন গাহিয়াছেন,—

"ভ্রমর-কুঞ্চিত কেশ, মধুর মোহন বেশ,
লাবনী অবনী বহি' যায়।
তরুণ অরুণ-সম, কমল-অধর কম,
কারুণ্য-লোচনে সদা চায়॥"

আর এক প্রিয়জন বর্ণনা করিয়াছেন,—'কৃষ্ণ-কেশ-মণ্ডিত, যজ্ঞসূত্র-সমন্বিত, ত্রিসূত্র-সুবর্ণ-তারে প্রথিত রুদ্রাক্ষ-মালাভূষিত, নবীন তাপসের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ নয়ন-মনোরঞ্জন আলেখ্য!' "শ্রীমস্তক সুগোল, সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত। কর্ণ নাসিকা স্বভাবতঃ বড়। মাধুর্য্যময় ঢল ঢল দীর্ঘায়ত লোচন, দৃষ্টি কারুণ্যপূর্ণ সুস্নিগ্ধ ও

সরল। পাণি পদতল ওষ্ঠ এবং গণ্ডস্থল ঈষৎ রক্তাভ ও সুবিমল। বদন-মণ্ডল মাধুর্য্যপূর্ণ ও সৌন্দর্য্য-শ্রীতে উজ্জ্বল, তাহাতে সর্ব্বদাই হাসির রেখা বিদ্যমান রহিয়াছে।'

আর এক সাধক আস্বাদন করিয়াছেন,—

'কিবা সে নয়ন-আনন্দ মোহন কি দিব তুলনা তায় গো।
শ্রীমুখ-কমল হেরিয়ে সকল প্রেমে হরিনাম গায় গো॥
ব্রজেতে থাকিত গোধন চরা'ত এসেছিল ন'দে পুরে।
"বন্ধু" নাম ধ'রে এল ফরিদপুরে চিন্‌লিনে কুঞ্জ ওরে॥'

শ্রীশ্রীগৌর-রূপের বর্ণনায় শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর আপন-রূপেরই আপনি আস্বাদন করিয়াছেন—

"শ্রীবাস-অঙ্গনে নিত্যানন্দ-সনে
রাজে গোরাচাঁদ মোর।
যেরূপ নেহারে' গৃহে র'তে নারে
গোরা-রূপে হ'য়ে ভোর॥
চরণ অমল লোহিত কমল
নখে কোটি সুধাকর।
মধ্যদেশ হেরি' লুকাইল হরি
রম্ভাতরু উরুবর।
অঙ্গের বরণ কষিত কাঞ্চন
ভাল বক্ষ সুবিশাল।
গজেন্দ্র-গমন সুন্দর জঘন
বাহু জিনিয়ে মৃণাল॥

স্ফটিক-খচিত দন্ত সুললিত
খগরাজ-চঞ্চু নাশা।
জিনি বালসূর্য্য শ্রীমুখ-মাধুর্য্য
তাহে মৃদু মৃদু ভাষা॥
রক্তবর্ণ পাণি সুমধুর বাণী
ওষ্ঠ গণ্ড সুবিমল।
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গৌর গুণধর
হেরি প্রাণ সুশীতল॥
হরিণ-নয়নে ঝরিছে সঘনে
প্রেম-অশ্রু অবিরল।
ব্রজগোপী বেশে এ'ল গৌড়দেশে
বন্ধুসাধ পদতল।"

ধ্যানের ধন

হরি-পুরুষ সুন্দর বন্ধু-ধন।
বামা-নন্দন আনন্দ-রস-ঘন॥
মুখ-পঙ্কজে লজ্জিত চন্দ্র কোটি।
কাঁদে হরিণী নেহারি' অক্ষি দু'টি॥

ক্ষীরে যাবক ডারিয়া যত্নে ছানি।
(কোন্) বিধি নিরালা গঢ়ল তনুখানি॥
পক্ক দাড়িম্ব বিড়ম্ব দন্তদল।
রাগ-রঞ্জিত সুস্মিত বিম্বফল॥

তিলপুষ্প-তিরস্কৃত নাশা-সাজ।
সরু চঞ্চু বাঢ়াইত খগরাজ॥
ভুজগেন্দ্র ভুজযুগ-ভয়ে ভীত।
রুদ্র-অক্ষমালা বক্ষে বিলম্বিত॥

পদ্ম-আসনে আসীন দিব্য জ্যোতিঃ।
পদুমিনিক অঙ্কেতে নিশাপতি॥
কল-কণ্ঠেতে কোকিলা লজ্জাহত।
তনু-গন্ধে গন্ধরাজ গর্ব্বগত॥

হরি-চন্দন-শীতল স্পর্শমণি।
মন-প্রাণ-লোভা রস-তত্ত্ব-খনি॥
উনমতি-মতি মহানাম রটে।
ভবে তুলনা তাঁহক সোহি বটে॥

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী গ্রন্থে তারুণ্যামৃত-ধারা-নামক
প্রথম লহরী
সমাপ্ত

REVIEW

Brahmachari Gopibandhu Das has taken infinite pains to write a detailed biography of Sri Sri Prabhu Jagadbandhu and to explain to the general readers with illuminating annotations the teachings of the Great Prabhu. Sri Rupa Goswami once said that fire adds to the brightness of gold. Whoever may gather the logs, if there is fire, gold becomes more bright,—thus says the author in all humility.

The author is a true and devout Vaisnava who has voluntarily taken upon himself the heavy task of illumining the dark souls of the ignorant and the materialists. There is no doubt about it that he has been highly successful in the task he has undertaken. Just as a connoisseur of art requires the proper angle of vision to appreciate the work of a master, the readers only should have the proper psychological outlook and approach to understand the life and teachings of Prabhu Jagadbandhu.

Every page of the provocative biography offers us a glimpse into the spiritual yearnings of a Great Soul and those who gathered about Him. Some of the passages in the multi-volumed work appear to be inspired outpourings of an inspired soul.

The immaculate purity and devotional ardour of Sri Sri Bandhu Sundar will touch the inmost chords in the depth of your soul. The wide range of Prabhu's mystical experiences, His splendid achievements in the spiritual domain and His assurance to those who feel themselves in the dark region where there is no quivering of light, will fill the reader with admiration and deep reverence of the Great Spiritual Genius of the modern age. To those who are bewildered in the welter of cultural ideals, this volume offers, singular and soothing solace.

The erudite Brahmachari Dr. Mahanamabrata writes a foreword to this multi-volumed work. His introduction helps the readers immensely to understand the contents of the great contribution of Gopibandhu Das Brahmachari.

The language of the author is simple and graceful and he wields his pen in the way a great artist wields his brush. His devotion and ardour is infective. The noble work of a noble soul will have many admirers all over Bengal. If you want to understand the spiritual heritage of Bengal, we ask you to go through the book.

—THE AMRITA BAZAR PATRIKA.
Sept. 7. '52